



# বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯



পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

# বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৫ জুন উপলক্ষে প্রকাশিত

Published on the occasion of World Environment Day 5 June 2019



## উপদেষ্টা

ড. এ, কে, এম, রফিক আহাম্মদ

## প্রধান সম্পাদক

ফরিদ আহমেদ

## সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য

ড. মুঃ সোহরাব আলি

মির্জা শওকত আলী

ড. মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম

একেএম রফিকুল ইসলাম

সোনিয়া সুলতানা

মোঃ হাসান হাছিবুর রহমান

ফারহানা মুস্তারী

দিলরুবা আক্তার

সাবরিন সুলতানা

## আলোকচিত্র

সমরকৃষ্ণ দাস

## কম্পিউটার কম্পোজ

মোঃ রুবেল ইসলাম

## মুদ্রণ

সম্রাট প্রিন্টার্স, ২১৮ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

Published by the Director General, Department of Environment



## পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ভবন, ই/১৬ আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

ফোন: ৮১৮১৮০০, ফ্যাক্স: ৮১৮১৭৭২, ইমেইল: dg@doe.gov.bd, ওয়েবসাইট: www.doe.gov.bd, facebook.com/doebd



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ  
বঙ্গভবন, ঢাকা

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬

০৫ জুন ২০১৯

## বাণী

পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্বব্যাপী বায়ুদূষণ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, “Air Pollution” যা অত্যন্ত যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মানুষের জীবনের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সারাবিশ্বে বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ, দ্রুত নগরায়ন, মাটি, পানি ও বায়ুদূষণের কারণে ভারসাম্য হারাচ্ছে পরিবেশ। বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈশ্বিক উষ্ণতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে যা জলবায়ু পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে। অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ, ইটভাটা, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়ার ফলে বাংলাদেশেও বায়ুদূষণের হার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বায়ুদূষণের কারণে প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। সমৃদ্ধ সুস্থ জাতি গঠনে তাই পরিবেশের ভারসাম্য নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইটভাটা বায়ুদূষণের অন্যতম উৎস হওয়ায় সরকার ‘ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৯’ জারি এবং কার্যকর করেছে। ইতোমধ্যে দেশে বিদ্যমান প্রায় ৭২ শতাংশ ইটভাটাকে পরিবেশসম্মত এবং জ্বালানী সাশ্রয়ী উন্নত প্রযুক্তির হাইব্রিড হফম্যান, টানেল বা আধুনিক জিগজ্যাগ প্রযুক্তির ইটভাটায় রূপান্তর করা হয়েছে। একই সাথে শিল্প প্রতিষ্ঠানে বায়ুদূষণ রোধে এয়ার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সবুজ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার ক্ষেত্রে সরকার শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে কৃষি, শিল্পসহ সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। তবে উন্নয়নকে টেকসই করতে সকল পর্যায়ে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



প্রধানমন্ত্রী  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬  
০৫ জুন ২০১৯

## বাণী

পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে এ বছরের প্রতিপাদ্য “Air Pollution” অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়েছে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃতি ও পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের কারণে প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের উন্নয়নশীল অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও বায়ুদূষণজনিত সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। সনাতন পদ্ধতিতে ইট পোড়ানো, যানবাহনের ধোঁয়া, অপরিষ্কৃত নির্মাণ কাজ এবং দূষণরোধে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় বায়ু দূষিত হচ্ছে। বায়ুদূষণের ফলে অনেকেই শ্বাসকষ্টসহ বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতায় ভুগছেন এবং মৃত্যুবরণ করছেন। জাতিসংঘের তথ্যমতে বায়ুদূষণের ফলে বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে; এর মধ্যে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। বায়ুদূষণজনিত রোগ প্রতিকারে প্রতি বছর স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিশ্ব অর্থনীতির প্রায় ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হচ্ছে। বায়ুদূষণ সঙ্কট মোকাবিলায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধিসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

আমাদের সরকার বায়ুদূষণের মাত্রা সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, সাভার, নরসিংদী, ময়মনসিংহ, রংপুর ও কুমিল্লা শহরে মোট ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এছাড়াও দেশের বড়শহরগুলোতে আরো ১৫টি স্থানান্তরযোগ্য বায়ুমান পরিবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। ক্লিন এয়ার অ্যাক্টের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে, যা অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। যানবাহনের দূষণ হ্রাসে ডিজলে সালফারের মাত্রা কমিয়ে আনা হয়েছে। ঢাকা শহরে যানবাহনের চাপ ও দূষণ কমানোর লক্ষ্যে মেট্রোরেল ও বাস র্যাপিড ট্রানজিট চালু হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন রুটে চক্রাকার বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে। গৃহের অভ্যন্তরে বায়ুদূষণরোধে প্রায় ৩০ লক্ষ উন্নত চুলা বিতরণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে প্রায় ৫৫ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

আমাদের সরকার প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়নে আমরা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। নতুন নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে যাতে প্রতিবেশ ও পরিবেশসম্মত বিধিব্যবস্থা প্রতিপালিত হয় সে দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। বর্জ্য শোধনাগার স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

আমি আশা করি, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণে বিশ্বসম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাই।

আমি ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



মন্ত্রী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬

৫ জুন ২০১৯

## বাণী

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণ রোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের মত বাংলাদেশও ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করছে। এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, ‘Air Pollution’।

পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণের সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য নির্মল বায়ুর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বিশ্বব্যাপী কিছু কিছু অবিবেচনা প্রসূত কর্মকাণ্ড নির্মল বায়ু প্রাপ্তিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। UN Environment-এর তথ্যানুযায়ী বায়ুদূষণের ফলে বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী উন্মুক্ত স্থানের (outdoor) বায়ুদূষণের ফলে বিশ্বব্যাপী ৪২ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে, পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ (indoor) বায়ুদূষণের ফলে বিশেষ করে রান্না এবং জ্বালানীর ধোঁয়া থেকে প্রায় ৩৮ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে বিশ্বের ৯১ শতাংশ শহরের বায়ুদূষণের মানমাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত মানমাত্রার চেয়ে বেশি। আমাদের শহরগুলো এর অন্যতম।

আমাদের দেশে ইটভাটা, উন্মুক্তভাবে ট্রাকে নির্মাণ সামগ্রী পরিবহন, নির্মাণ কার্যক্রম, কলকারখানার এবং যানবাহনের ধোঁয়া ইত্যাদিকে বায়ুদূষণের মূল উৎস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বায়ুদূষণ রোধকল্পে সরকার বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইটভাটা বায়ুদূষণের অন্যতম উৎস হওয়ায় সরকার ইট প্রস্তুত কার্যক্রমকে পরিবেশসম্মতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করেছে। ইতোমধ্যে ইটের বিকল্প হিসাবে ব্লক তৈরি এবং ব্যবহার উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর যানবাহনের কালো ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার পাশাপাশি ঢাকাসহ বড় শহরগুলোর ইটভাটা, অবকাঠামো নির্মাণ, যানবাহন ও অন্যান্য উৎস হতে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বায়ুদূষণ রোধে সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

আসুন, বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বায়ুদূষণ রোধে নতুন করে অঙ্গীকারাবদ্ধ হই।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশব্যাপী গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ শাহাব উদ্দিন, এম.পি.





**Secretary-General**  
United Nations



## Message

The theme for this year's World Environment Day is air pollution. All around the world — from megacities to small villages — people are breathing dirty air. An estimated 9 out of 10 people worldwide are exposed to air pollutants that exceed World Health Organization (WHO) air quality guidelines. This is lowering life expectancy and damaging economies across the planet.

To improve air quality, we must know our enemy. Deaths and illnesses from air pollution are caused by tiny particles that penetrate our defences every time we fill our lungs. These particles come from many sources: the burning of fossil fuels for power and transport; the chemicals and mining industries; the open burning of waste; the burning of forests and fields; and the use of dirty indoor cooking and heating fuels, which are major problems in the developing world.

This polluted air kills some 7 million people each year, causes long-term health problems, such as asthma, and reduces children's cognitive development. According to the World Bank, air pollution costs societies more than \$5 trillion every year.

Many air pollutants also cause global warming. Black carbon is one such example. Produced by diesel engines, burning trash and dirty cookstoves, it is extremely harmful when inhaled. Reducing emissions of such pollutants will not only improve public health, it could alleviate global warming by up to 0.5°C over the next few decades.

Tackling air pollution therefore presents a double opportunity, as there are many successful initiatives that both clear the air and reduce greenhouse gas emissions, such as phasing out coal-fired power plants and promoting less polluting industry, transport and domestic fuels. With investments in renewable energy sources outstripping those in fossil fuels every year, the rise of clean energy is helping globally. Cleaner transport is also growing around the world.

It is in such initiatives, designed to improve air quality and fight climate change, that hope lies. I urge everyone attending the Climate Action Summit that I am convening in September to draw motivation from such examples. There is no reason why the international community cannot act. Precedent exists in the Montreal Protocol. Scientists identified a grave threat to public and planetary health, and Governments and businesses acted to successfully protect the ozone layer.

Today, we face an equally urgent crisis. It is time to act decisively. My message to Governments is clear: tax pollution; end fossil fuel subsidies; and stop building new coal plants. We need a green economy, not a grey economy.

On World Environment Day, I ask each of us to act so we can breathe more easily. From pressuring politicians and businesses to changing our own habits, we can reduce pollution and beat climate change.

**Antonio Guterres**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



উপমন্ত্রী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬

৫ জুন ২০১৯

## বাণী

প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারা বিশ্বের সাথে একযোগে বাংলাদেশেও আমরা ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯’ উদ্‌যাপন করছি।

জাতিসংঘ পরিবেশ নির্ধারিত এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য ‘Air Pollution’ যা খুবই প্রাসঙ্গিক এবং সম্যোপযোগী। বায়ুদূষণের স্বাস্থ্যগত ক্ষতিকর প্রভাব মারাত্মক। শ্বাসকষ্টজনিত এবং হৃদরোগজনিত মৃত্যুর এক তৃতীয়াংশের জন্য বায়ুদূষণ দায়ী। এ বছরের প্রতিপাদ্যে পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের দ্রুত আর্থসামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে নগরায়ন, শিল্পায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার, অদক্ষ প্রযুক্তিতে জ্বালানির দহন কিংবা পরিবেশ সংক্রান্ত নিয়ম না মেনে অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশে বায়ুদূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য ক্রমান্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকার শহরের বায়ুর গুণগতমান উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকার অভ্যন্তরীণ গৃহস্থিত বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ইটভাটা হতে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ইট প্রস্তুত সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা হয়েছে। শিল্প কারখানা হতে সৃষ্ট গ্যাসীয় নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার ও জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সোলার হোম সিস্টেম, সৌর সেচ, বায়োগ্যাস ও বায়োফার্টাইলাইজার এবং পরিবেশবান্ধব চুলা প্রকল্পসহ আরও অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যা দেশের অভ্যন্তরীণ গৃহস্থিত বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে বায়ুদূষণ একটি মারাত্মক পরিবেশগত সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের জন্য সারা বিশ্বের সকল সরকার, শিল্প উদ্যোক্তা, সম্প্রদায় ও জনগণকে একযোগে কাজ করার মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানির নতুন নতুন উৎস এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনের আহ্বান জানাই। এগুলোর ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে সারা বিশ্বের শহর এবং গ্রামের বায়ুর গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

আমি ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশব্যাপী গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

হাবিবুন নাহার

হাবিবুন নাহার, এম.পি.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



### সভাপতি

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়  
সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি  
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬  
৫ জুন ২০১৯

## বাণী

পরিবেশ ও প্রতিবেশগত অবক্ষয়ের হাত হতে ধরিত্রীকে বাঁচানোর লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসে প্রতিবছর জাতিসংঘ পরিবেশ (UN Environment) কর্তৃক বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়ে থাকে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

UN Environment এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে- “বায়ুদূষণ” এবং স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে- “আসুন বায়ুদূষণ রোধ করি”। উন্নয়নশীল বিশ্বের পরিবেশ দূষণগত সমস্যার মধ্যে বায়ুদূষণ অন্যতম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে বিশ্বে প্রতি বছর পরিবেষ্টক বায়ুদূষণের (Ambient Air Pollution) কারণে প্রতি বছর প্রায় ৭.০ মিলিয়ন মানুষ মারা যাচ্ছে যার মধ্যে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রায় ৪.২ মিলিয়ন মানুষ। এছাড়া পৃথিবীতে প্রায় ৯১ ভাগ মানুষ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত বায়ুর মানমাত্রা অতিক্রম করেছে এমন পরিবেশে বসবাস করছে। বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, রাজশাহীসহ অন্যান্য শহরে বায়ুদূষণের মাত্রা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য বাংলাদেশ সরকার ‘নির্মল বায়ু আইন’ প্রণয়ন করতে চলেছে যা চলতি বছরের অক্টোবরের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হবে।

ব্যাপক শিল্পায়ন, নগরায়ন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণজনিত কর্মকাণ্ডের কারণে শুষ্ক মৌসুমে বায়ুদূষণের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইটভাটা বায়ুদূষণের অন্যতম প্রধান উৎস হওয়ায় সরকার ইট নির্মাণ শিল্পকে পরিবেশসম্মতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে “ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৯” জারি এবং কার্যকর করেছে। এই আইনের আলোকে সনাতন প্রযুক্তির বায়ুদূষণকারী ইটভাটার কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বন্ধ করে উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি ছিদ্রযুক্ত ইট ও মাটির বিকল্প উপাদানে তৈরি বিভিন্ন ব্লক উৎপাদন ও ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটার কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার জন্য বর্ণিত আইনের আলোকে প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হলে ইট উৎপাদনে কৃষিজমির মাটির ব্যবহার বহুলাংশে কমে আসবে এবং বায়ুদূষণও অনেক হ্রাস পাবে। একই সাথে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বায়ুদূষণ রোধে Air Treatment Plant স্থাপন এবং সবুজ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ার ক্ষেত্রে শিল্প উদ্যোক্তাগণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে বায়ুদূষণ একটি মারাত্মক পরিবেশগত সমস্যা। সরকারের একার পক্ষে বায়ুদূষণের মতো এত জটিল সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসহ জনগণের সমন্বিত আন্তরিক সহযোগিতা ও প্রচেষ্টা।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে দেশব্যাপী গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

১২২৩  
সাবের হোসেন চৌধুরী, এম. পি.



দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে  
একাদশ জাতীয় সংসদের  
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত  
সংসদীয় স্থায়ী কমিটির  
মাননীয় সংসদ সদস্যগণের  
সদয় দিকনির্দেশনা এবং পরামর্শের জন্য

আমরা কৃতজ্ঞ



সািবের হোসেন চৌধুরী  
সভাপতি



মোঃ শাহাব উদ্দিন  
সদস্য



বেগম হাবিবুন নাহার  
সদস্য



আনোয়ার হোসেন  
সদস্য



মোঃ মোজাম্মেল হোসেন  
সদস্য



দীপংকর তালুকদার  
সদস্য



নাজিম উদ্দিন আহমেদ  
সদস্য



জাফর আলম  
সদস্য



মোঃ রেজাউল করিম বাবলু  
সদস্য



বেগম খোদেজা নাসরিন আক্তার হোসেন  
সদস্য



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



সচিব

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬

৫ জুন ২০১৯

## বাণী

বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার উর্ধ্বগতি পরিবেশের ওপর চাপ তৈরি করেছে। অপরিকল্পিত উন্নয়ন ও নগরায়নের ফলে কোথাও কোথাও বিপর্যস্ত হচ্ছে পরিবেশ। শিল্পায়ন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে বেড়ে যাচ্ছে বায়ুদূষণের মাত্রা। এই প্রেক্ষাপটে UN Environment এ বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে ‘Air Pollution’ যা অত্যন্ত সমরোপযোগী ও প্রাসঙ্গিক।

বাংলাদেশে শিল্পায়ন, নগরায়ন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কারণে সাম্প্রতিককালে বায়ুদূষণের মাত্রা বেড়েছে। কিন্তু এই মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। সারা দেশে বায়ুমান পরিবীক্ষণের পাশাপাশি বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা হালনাগাদ করা হয়েছে। ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৯ জারি করা হয়েছে। বায়ুদূষণের অন্যান্য উৎস কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বিত ও সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন ও পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব হবে না। পরিবেশসম্মত উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সরকারের আন্তরিক ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



মহাপরিচালক  
পরিবেশ অধিদপ্তর

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬  
৫ জুন ২০১৯

## শুভেচ্ছা

পরিবেশ ও প্রতিবেশগত অবক্ষয়ের হাত হতে ধরিত্রীকে বাঁচানোর লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসে প্রতিবছর জাতিসংঘ (UN Environment) কর্তৃক ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়ে থাকে। পরিবেশ অধিদপ্তর তথা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে এ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছে।

জাতিসংঘ (UN Environment) কর্তৃক এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য-‘Air Pollution’ যার ভাবানুবাদ “বায়ুদূষণ” এবং স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে- ‘Beat Air Pollution’ ভাবানুবাদ “আসুন বায়ুদূষণ রোধ করি”। বর্তমান বিশ্বে বায়ুদূষণ বহুল আলোচিত একটি সমস্যা। দ্রুত বর্ধনশীল নগরায়ন ও ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের প্রেক্ষাপটে অধিক মাত্রায় জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, কলকারখানার উন্মুক্ত নিঃসরণ, অপরিষ্কৃত অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম, জনসচেতনতার অভাব, ইত্যাদি কারণে বায়ুদূষণ বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে চরম আকার ধারণ করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে বায়ুদূষণের কারণে প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে যার মধ্যে ৪০ লক্ষ মানুষই হচ্ছে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের। বিশ্বব্যাপী ৯২ শতাংশ মানুষ নির্মল বায়ু গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বায়ুদূষণ প্রশমনে প্রতি বছর বিশ্ব অর্থনীতির ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হচ্ছে। সার্বিক দিক বিবেচনায় জাতিসংঘ (UN Environment) কর্তৃক এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য ‘Air Pollution’ নির্ধারণ তাই যথাযথ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উপর বায়ুদূষণের বিরূপ প্রভাবসহ অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব নিরসনের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর দেশে উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটার প্রচলন এবং যানবাহন, অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম ও কলকারখানা সৃষ্ট ক্ষতিকর ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনাসহ নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত “নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ” প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য বিভাগীয় ও শিল্পঘন শহরগুলোতে সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন (Continuous Air Monitoring Station-CAMS)-এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বায়ুদূষণ মাত্রা পরিমাপ করার নিমিত্ত ঢাকায় ৩টি, চট্টগ্রামে ২টি, রাজশাহী, খুলনা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নরসিংদী, ময়মনসিংহ ও সাভারে ১টি করে সারাদেশে মোট ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ১৫টি কমপ্যাক্ট এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশন (Compact-CAMS) আগামী জুলাই মাসের মধ্যে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় চালু করা সম্ভব হবে।

ইটভাটা সৃষ্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও ইট নির্মাণ কার্যক্রমকে পরিবেশসম্মতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে “ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) জারি ও কার্যকর করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৫৬৯৫টি ইটভাটাকে পরিবেশসম্মত এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী উন্নত প্রযুক্তির হাইব্রিড হফম্যান কিল্ন (Hybrid Hoffman Kiln), টানেল কিল্ন (Tunnel Kiln) বা অন্যান্য স্বীকৃত আধুনিক প্রযুক্তিতে রূপান্তর করা হয়েছে যা বিদ্যমান ইটভাটার প্রায় ৭২%। জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ দূষকারী যানবাহন, কলকারখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণের কাজ উন্মুক্তভাবে করার ফলেও শহরের বাতাসে ধূলাবালির পরিমাণ বাড়ছে। ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদেরকে নিয়ে নিয়মিত সভা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বয়ে ধূলিকণা ও ধূলিদূষণ নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।

যানবাহনের ক্ষতিকর ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ডিজেল রোডম্যাপ প্রণয়নসহ ঢাকা এবং অন্যান্য বড় বড় শহরে অধিক ধোঁয়া নিঃসরণকারী গাড়ির বিরুদ্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কেস প্রকল্পের মাধ্যমে ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বায়ুদূষণ আরও কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ড. এ. কে. এম. রফিক আহাম্মদ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



পরিচালক  
পরিবেশ অধিদপ্তর

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬  
৫ জুন ২০১৯

## সম্পাদকীয়

পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে গণসচেতনতা ও দায়িত্বশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এ বছরও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৫ জুন ২০১৯ উদযাপন হচ্ছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে জলবায়ু পরিবর্তনের অনিবার্য প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের উপর বাড়তি চাপ এবং অপরিবর্তিত নগরায়ন ও দেশজুড়ে অপরিবর্তিত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং অসচেতন শিল্পায়নের ফলে দেশে প্রতিনিয়ত পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিপন্ন হচ্ছে। আবাসস্থল বিপন্নতা এবং প্রতিবেশ ও পরিবেশগত অন্যান্য প্রতিকূলতার জন্য আমাদের দেশের নিসর্গ এবং অনন্য সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য আজ হুমকির সম্মুখীন।

এ বছর জাতিসংঘ পরিবেশ বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে বায়ুদূষণ, এবং শ্লোগান: আসুন বায়ুদূষণ রোধ করি (Beat Air Pollution)। এ বছরের হোস্ট কান্ট্রি হলো চীন। বিগত দশকে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে দেশটি ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বায়ুদূষণ দেশের সীমানা অতিক্রম করে অন্য দেশকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। আর এই কারণেই বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ দূষণ ছাড়াও উন্নত বিশ্ব ও শিল্পায়িত দেশগুলোর অধিক কার্বন নিঃসরণজনিত কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের কুফলে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী। নাজুক ভৌগোলিক অবস্থান ও নিম্নাঞ্চল হওয়াতে সমুদ্রপৃষ্ঠ স্ফীতির ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল চরম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে; লবণাক্ততা ছড়িয়ে পড়তে পারে দেশের মধ্য ভূভাগ পর্যন্ত। তার ওপর বাড়-বাগুণ, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ও খরা-বন্যার প্রকোপ তো রয়েছেই।

প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমে সৃষ্টিশীল গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে এবং বিজ্ঞজনের প্রজ্ঞা ও চেতনাকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে উপস্থাপন করবার জন্য বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষে অন্যান্য বছরের মত এ বছরও একটি সঞ্চলন প্রণীত হচ্ছে। বায়ুদূষণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে অনেক লেখা পাওয়ায় আমরা আনন্দিত এবং অনুপ্রাণিত হয়েছি। শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত লেখকদের মধ্যে দেশের সনামধন্য পণ্ডিতবর্গ থেকে সাধারণ নাগরিক রয়েছেন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে মূল্যবান বাণী প্রদান করেছেন। তাঁদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি, সম্মানিত সচিব এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ও মূল্যবান বাণী প্রদান করেছেন। এ ছাড়া জাতিসংঘের মহাসচিব Antonio Guterres বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে বাণী প্রদান করেছেন। এ জন্য তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। লেখা দিয়ে যারা সঞ্চলনকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সম্পাদনায় অংশগ্রহণকারী সহকর্মীদের অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সঞ্চলনে যাদের তোলা ছবি ব্যবহার করা হয়েছে তাদের প্রতিও রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা।

এই স্মরণিকায় প্রকাশিত লেখায় সম্মানিত লেখকদের মতামত, পরামর্শ ও সুপারিশ একান্তই তাদের নিজস্ব।

  
ফরিদ আহমেদ

## সূচি

|                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| চিত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম                                                | ১৭-৩৪                                   |
| বাংলা প্রবন্ধ                                                                     | ৩৭-৯৫                                   |
| বায়ুদূষণ রোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ                           | ড. এ, কে, এম, রফিক আহাম্মদ ৩৭           |
| বায়ুমান ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া: প্রেক্ষাপট ঢাকা                                  | ড. এসএম মনজুরুল হান্নান খান ৪১          |
|                                                                                   | মোঃ আবুল কালাম আজাদ                     |
|                                                                                   | মোঃ মাসুদ রানা                          |
| পরিবেশ রক্ষায় পাটের ভূমিকা ও দেশবাসীর করণীয় কী                                  | প্রফেসর ডঃ এম শমশের আলী ৪৫              |
| বায়ুদূষণের সাতকাহন: সমাধান কোথায়                                                | কাজী সারওয়ার ইমতিয়াজ হাশমী ৪৮         |
| দূষণের শোষণে প্রাণ-প্রকৃতি                                                        | মুকিত মজুমদার বাবু ৫২                   |
| টেকসই কৃষির জন্য চাই সুরক্ষিত পরিবেশ                                              | শাইখ সিরাজ ৫৪                           |
| বাংলাদেশের বিরল বন্যপ্রাণী: বাঘের নাম মেঘছাপা                                     | শরীফ খান ৫৬                             |
| ওজোনস্তর রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় মন্ট্রিল প্রটোকল ও এর কিগালি সংশোধনী | মোঃ জিয়াউল হক ৫৮                       |
| পরিবেশ অধিদপ্তরের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রম                               | মির্জা শওকত আলী ৬০                      |
|                                                                                   | শাহনাজ রহমান                            |
|                                                                                   | দিলরুবা আক্তার                          |
| বরেন্দ্র অঞ্চলে খরা প্রশমনে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা                                | জালালউদ্দিন মোঃ শোয়েব ৬৫               |
| ইটভাটায় কৃষিজমির মাটি ও পরিবেশের অবক্ষয় এবং প্রতিকার                            | ড. মো. আলতাফ হোসেন ৬৯                   |
| আশাবাদী ভাবনার আলোকে আমার বাংলাদেশ                                                | রওশন ইসলাম ৭১                           |
| অণুজীবের মাধ্যমে বজর্যজল শোধন                                                     | ড. এস এম রফিকুজ্জামান ৭৩                |
|                                                                                   | কৌশিক চক্রবর্তী                         |
| বায়ুদূষণ, বজ্রপাত এবং আমাদের মাতৃভূমি                                            | আনজুম তাসনুভা ৭৫                        |
|                                                                                   | এস, এম, তারিকুল ইসলাম                   |
| বায়ুদূষণ: যে কারণে ঢাকার বায়ুমানের অবনতি ঘটছে                                   | অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার ৭৭ |
| পরিবেশ উন্নয়নে শেখ হাসিনার অবদান অপারিসীম-নিবেদন নিরন্তর                         | জেড. এম. কামরুল আনাম ৭৯                 |
| আশ্চর্যজনক ঘাস বিন্ধাঘাস                                                          | মো. গোলাম মওলা ৮০                       |
|                                                                                   | মোহা. আব্দুল কুদ্দুস মিয়া              |
| আমরা কোন অবস্থানে দাঁড়িয়ে?                                                      | রাসনা শারমিন মিথি ৮৩                    |
| পরিবেশ রক্ষায় আমাদের প্রধানমন্ত্রী: প্রত্যয় ও পদক্ষেপ                           | মোমিন মেহেদী ৮৪                         |
| বায়ুদূষণ: মানবসৃষ্ট এক কালব্যাপি                                                 | হাসান জাহিদ ৮৬                          |
| আমরা এখন কী করব, আমাদেরই ঠিক করতে হবে                                             | নারায়ণ সরকার ৮৯                        |
| জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রভাব: বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত                           | মোঃ ইউসুফ মেহেদী ৯১                     |
| চট্টগ্রামের উদ্ভিদ যাদুঘর                                                         | ছেয়দুল আলম ৯৪                          |



**English Articles**

**99-132**

|                                                                                                    |                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| Linking Climate Change to Air Pollution                                                            | Dr. Saleemul Huq<br>Rukhsar Sultana        | 99  |
| Green Climate Fund: The Only Dedicated Climate Fund<br>How it works                                | Dr. Fazle Rabbi Sadeque Ahmed              | 102 |
| Beat Air Pollution and Enjoy Better Life                                                           | Mohammad Asadul Hoque<br>Syed Ahmmad Kabir | 109 |
| Implementation of Climate Change Adaptation Funds by sectoral<br>agencies in Bangladesh            | Dr. Md. Saifur Rahman                      | 117 |
| Bringing Worth to Waste                                                                            | Khadem Mahmud Yusuf                        | 122 |
| Environmental Impact Study of Two Tannery Estates<br>on the Buriganga and the Dhaleshwari Rivers   | Farhana Mustari                            | 125 |
| Local Practices for Making Resilient Households in Flood and<br>Riverbank Erosion Prone Char Lands | Jarin Tasneem Oyshi                        | 127 |
| Environmental Compliance and Climate Risk Management<br>in Aquaculture                             | MHM Mostafa Rahman                         | 129 |
| The Effects of Air Pollution on Plants and Ecosystem                                               | Noor Hassan Sajib                          | 131 |

**ছড়া ও কবিতা**

**১৩৫-১৩৮**

|                  |                    |     |
|------------------|--------------------|-----|
| শুদ্ধ সতেজ বায়ু | পাশা মোস্তফা কামাল | ১৩৫ |
| মুক্ত বাতাস      | শায়লা রহমান তিথি  | ১৩৬ |
| অনুরোধ           | বিধান চন্দ্র পাল   | ১৩৭ |
| নির্মল সুবাতাস   | রিফাত আরা শাহানা   | ১৩৮ |

**পরিবেশ বিষয়ক নির্বাচিত শ্লোগান ২০১৯**

**১৩৯**

## চিত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম



বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৮ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৮ প্রদান করছেন



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৮ প্রদান করছেন



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৮ প্রদান করছেন





বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৮ উপলক্ষে পরিবেশ মেলা উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ মেলা ২০১৮ পরিদর্শন করছেন



পরিবেশ অধিদপ্তরের ই-গবেষণাগার সফটওয়্যারের শুভ উদ্বোধন করছেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এম.পি ও মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব হাবিবুন নাহার, এম.পি



আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত শব্দ সচেতনতা সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মন্ত্রী





আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত শব্দ সচেতনতা সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় উপমন্ত্রী



আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস ২০১৯ এর শুভ উদ্বোধন করছেন মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় উপমন্ত্রী ও সম্মানিত সচিব



নবনিযুক্ত মাননীয় মন্ত্রী ও মাননীয় উপমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন সম্মানিত সচিব জনাব আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী



মাননীয় মন্ত্রী ও মাননীয় উপমন্ত্রীর পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সাথে মতবিনিময় সভা





আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস ২০১৯ এর শব্দ সচেতনতা সমাবেশ



জেসিএম-এর আওতায় বেসরকারি উদ্যোগের সক্ষমতা সৃষ্টি বিষয়ক কর্মশালা





ইটভাটার জিআইএস ডাটাবেইজ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সম্মানিত সচিব



ইটভাটার নিঃসরণ ও শক্তির ব্যবহার পরিমাপ শীর্ষক কর্মশালায় সানিত সচিব



গণমাধ্যমে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম শীর্ষক কর্মশালায় সম্মানিত মহাপরিচালক ড. এ. কে. এম. রফিক আহম্মদ



সিটিসিএন-এর কারিগরি সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা





পরিবেশ ভবনে ছাদবাগানের উদ্বোধন



খসড়া ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট বিষয়ে অংশীজনের মতবিনিময় সভা



পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মচারীদের জন্য শৃঙ্খলা ও আচরণবিধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা



দক্ষিণ এশিয়ার বায়ুদূষণ বিষয়ে অংশীজনের পরামর্শ কর্মশালা





পরিবেশ অধিদপ্তর আয়োজিত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ২০৩০ বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মশালা



পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের অবসর ও বদলীজনিত বিদায় সংবর্ধনা



নাগরিক সেবার উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা



ইলেকট্রনিক নথি (ই-ফাইল) ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা





অবৈধ ইটভাটা উচ্ছেদ



শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার রোধে সচেতনতামূলক অভিযান



১ম আন্তঃকলেজ পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৯ এর বিটিভিতে ধারণকৃত চূড়ান্ত পর্ব



৮ম আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৯ এর বিটিভিতে ধারণকৃত চূড়ান্ত পর্ব





পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতার চূড়ান্তপর্বে অংশগ্রহণকারী ও বিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী



বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯ উপলক্ষে শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯ উপলক্ষে ঢাকায় শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শ্রেষ্ঠ শিশুদের চিত্র

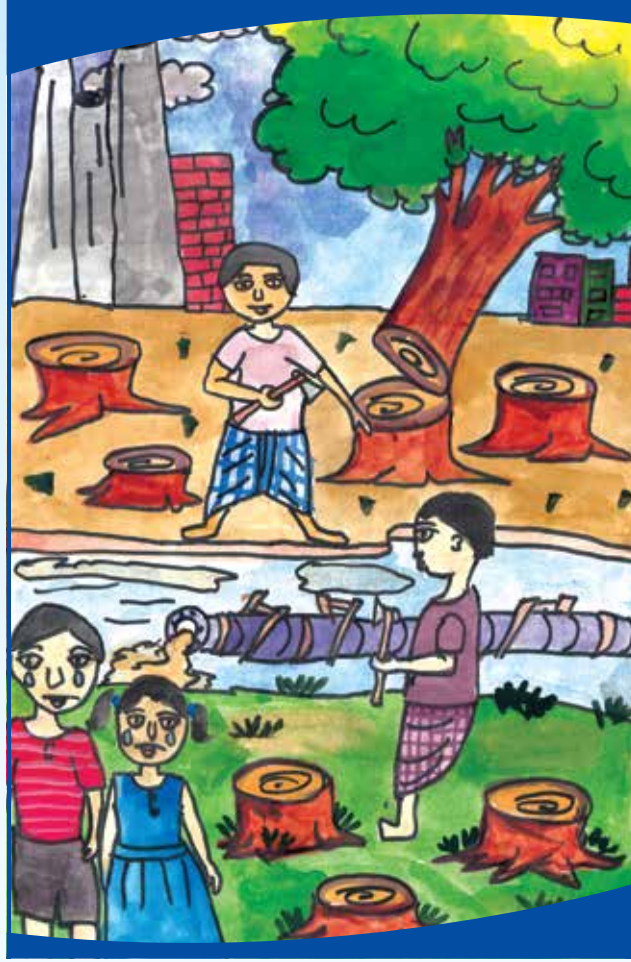


নাজীফা মালিয়াত (বয়স: ১৩+), বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন গ্রুপে শ্রেষ্ঠ

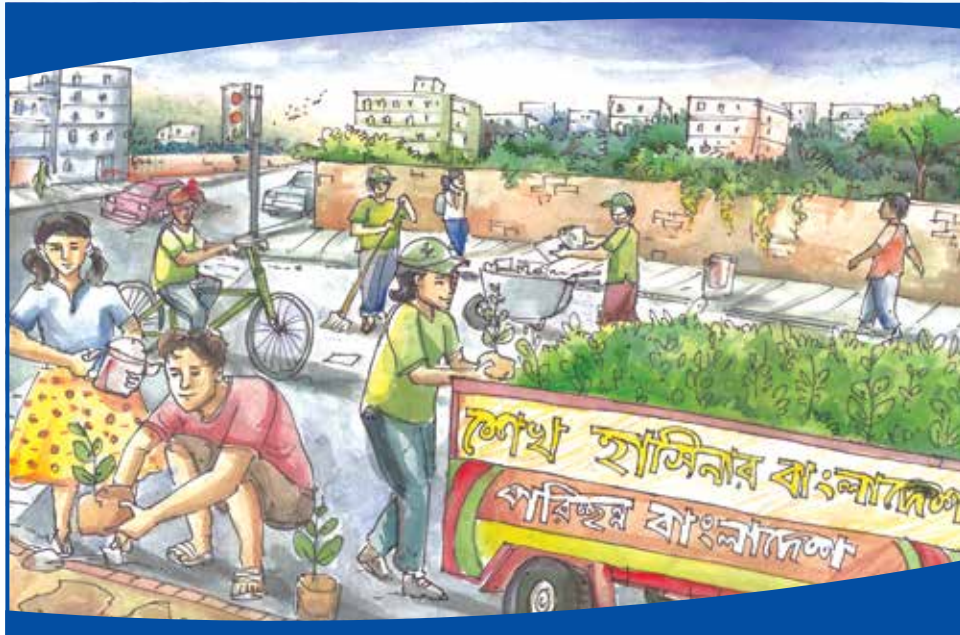


মানহা রহমান (বয়স: ৬ বছর ১১ মাস), ক গ্রুপে শ্রেষ্ঠ





নার্জিফা তাসনিম রেজা (বয়স: ১০), খ গ্রুপে শ্রেষ্ঠ



নুরুল আফতাব (বয়স: ১২), গ গ্রুপে শ্রেষ্ঠ

## বাংলা প্রবন্ধ



## বায়ুদূষণ রোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

ড. এ. কে. এম. রফিক আহম্মদ\*

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে নগরায়ন ও শিল্পায়নের হার বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অনুষ্ণ হিসেবে পরিবেশ দূষণ বিশেষ করে বায়ুদূষণের মাত্রাও বেড়েছে অনেক। ফলে পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর বেঁচে থাকার অপরিহার্য উপাদান নির্মল বায়ু নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতিসংঘ (UN Environment)-এর তথ্যমতে বিশ্বব্যাপী বায়ুদূষণের কারণে প্রায় ৭০ লক্ষের অধিক মানুষ অপরিশোধিত বয়সে মারা যাচ্ছে, যার মধ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মানুষ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৯১ ভাগ মানুষ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত মানমাত্রার নির্মল বায়ু সেবন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া, প্রতিবছর বায়ুদূষণের জন্য বিশ্ব অর্থনীতির প্রায় ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় হচ্ছে। এ বাস্তবতায় জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য Air Pollution (বায়ুদূষণ) এবং শ্লোগান Beat Air Pollution (আসুন বায়ুদূষণ রোধ করি) অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশগত মান উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী সরকারি, বেসরকারি ও তৃণমূল পর্যায়ে সার্বিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং এতদবিষয়ে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP)-এর উদ্যোগে ১৯৭২ সাল থেকে প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়ে আসছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগোপযোগী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে বর্তমান সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত কার্যকরভাবে মোকাবেলায় আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার ২০১১ সালে ‘পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন’কে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে বাংলাদেশের সংবিধানে ১৮ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছে: “১৮ক। রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।”

বর্তমান সরকার পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন নীতির ওপর ভিত্তি করে প্রণীত রূপকল্প ২০২১ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে সচেষ্ট রয়েছে। পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ সার্বিক টেকসই উন্নয়নে সহায়তার লক্ষ্যে পরিবেশ নীতি ১৯৯২ সংশোধন ও সময়োপযোগী করে নতুনভাবে জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ প্রণয়নসহ অন্যান্য নীতিমালা, কৌশল, কর্মপরিকল্পনা, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ও জারি করেছে এবং সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে অধিকতর কার্যকর ও শক্তিশালীকরণে কাজ করছে। জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনের জন্য সরকার সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পরিবেশসংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তর/সংস্থা স্ব স্ব বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

বাংলাদেশের মতো বিশ্বের সর্বোচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ দেশে জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা যেমন খাদ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, যোগাযোগসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ তথা উন্নয়নের গতিধারার প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত ভূমি, পানিসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়ছে এবং পরিবেশ দূষিত হচ্ছে বিশেষ করে ব্যাপক শিল্পায়ন, নগরায়ন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণজনিত কর্মকাণ্ডের কারণে শুল্ক মৌসুমে বায়ুদূষণের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। সারাদেশে সনাতন পদ্ধতির ইটভাটা পরিচালনা, অপরিষ্কৃত নির্মাণ কার্যক্রম, শিল্পকারখানার উন্মুক্ত নিঃসরণ ও যানবাহনের কালো ধোঁয়া, কঠিনবর্জ্য ও বায়োমাস পোড়ানো, ইত্যাদি বায়ুদূষণের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত।

ইটনির্মাণ শিল্পকে পরিবেশসম্মতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে “ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯)” জারি ও কার্যকর হওয়ার পর থেকে পরিবেশ অধিদপ্তর দেশে বিদ্যমান ইটভাটাসমূহকে জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশে ৫৬৯৫টি ইটভাটা যা দেশের মোট ইটভাটার প্রায় ৭২% তুলনামূলকভাবে পরিবেশসম্মত এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বায়ুদূষণ হ্রাস এবং মাটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কমানোর লক্ষ্যে “ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯)”-এর আলোকে সনাতন প্রযুক্তির বায়ুদূষণকারী ইটভাটার কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বন্ধ করে উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি ছিদ্রযুক্ত ইট ও মাটির বিকল্প উপাদানে তৈরি বিভিন্ন ধরনের ব্লক উৎপাদন ও ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সার্বিক বায়ুদূষণকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন ক্রিন এয়ার অ্যাক্ট বা নির্মল বায়ু আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটার কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার জন্য বর্ণিত আইনের আলোকে প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হলে সনাতন পদ্ধতির ইটভাটায় কৃষিজমির মাটি পুড়িয়ে ইট উৎপাদন ও ব্যবহার অনেকাংশে কমে আসবে এবং বায়ুদূষণও অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

\*মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

দেশের ইটভাটাসমূহ কার্যকরভাবে পরিবীক্ষণ ও তদারকির লক্ষ্যে দেশের সকল ইটভাটার উপর বিস্তারিত GIS ম্যাপিংসহ পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। ফলে অনলাইনের মাধ্যমে দেশের সকল ইটভাটার অবস্থান, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদিসহ অন্যান্য ইটভাটা সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যাবে।

শিল্পকারখানাগুলোতে Air Treatment Plant (ATP) স্থাপন বাধ্যতামূলক করে বায়ুদূষণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এবং বড় বড় অবকাঠামো প্রকল্পসমূহকে নির্দেশনা সংবলিত একাধিক নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্মাণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট দূষণের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ও মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে, মেট্রোরেলসহ অন্যান্য প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে এবং বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে এ সকল প্রকল্পসমূহকে নিয়মিত পানি ছিটানোসহ দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, রাজউক, এলজিইডি, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বিআরটিএ, রিহ্যাবসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে নিয়মিত সভা ও সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বায়ুদূষণ রোধে ডিসেম্বর ২০১৮ থেকে এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত সারাদেশে ৩৫৮টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১০,০৮,৭৭,৫০০ (দশ কোটি আট লক্ষ সাতাত্তর হাজার পাঁচশত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং ১৭৫টি ইটভাটার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। চলমান ইটভাটার মৌসুমে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে ১২০টি অবৈধ ইটভাটা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

যানবাহন সৃষ্ট ক্ষতিকর কালো ধোঁয়া নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যে ২০ (বিশ) বছরের পুরাতন যানবাহন ঢাকাসহ বড় বড় শহরের রাস্তা থেকে প্রত্যাহার এবং যানবাহনের ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানকালে যানবাহন নিঃসৃত কালো ধোঁয়া পরীক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদানসহ সারা দেশের শহরগুলোতে যানবাহনের ক্ষতিকর ধোঁয়ার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। যানবাহনে ব্যবহৃত ডিজলে বিদ্যমান সালফারের পরিমাণ যথেষ্ট কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গৃহাভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ রোধে প্রায় ৩০ লক্ষের অধিক উন্নত চুলা গ্রামীণ জনপদে বিতরণ করা হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে প্রায় ৫৫ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে, ফলে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ কেরোসিন বাতি জ্বালানো বন্ধ হয়েছে।

বায়ুদূষণরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে বায়ুদূষণের উৎস ও এর প্রভাব সম্পর্কে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ বিভিন্ন প্রকার প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনের অংশগ্রহণে ঢাকা ও বিভাগীয় পর্যায়ে সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে।

বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত “নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ” প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য বিভাগীয় ও শিল্পঘন শহরগুলোতে সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন (Continuous Air Monitoring Station-CAMS)-এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বায়ুদূষণ মাত্রা পরিমাপ করার নিমিত্ত ঢাকায় ৩টি, চট্টগ্রামে ২টি, রাজশাহী, খুলনা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নরসিংদী, ময়মনসিংহ ও সাভারে ১টি করে সারাদেশে মোট ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এই সকল স্টেশনের মাধ্যমে উক্ত শহরগুলোতে বায়ুদূষণের উপাদানসমূহের (বস্তুরূপে, ওজোন, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ইত্যাদি) পরিমাণ সার্বক্ষণিকভাবে পরিমাপ করা হচ্ছে। এছাড়া ১৫টি কমপ্যাক্ট এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশন (Compact-CAMS) আগামী জুলাই মাসের মধ্যে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় চালু করা সম্ভব হবে। বায়ুদূষণের উপাদানসমূহ পরিমাপ করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বায়ুমানের অবস্থা নিরূপণ করা হচ্ছে। বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে সারাদেশের ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বায়ুমান সূচক Air Quality Index (AQI) পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত কেস প্রকল্পের ওয়েবসাইট case\_moef.gov.bd-এ প্রকাশ করা হচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর Polluters Pay Principle কৌশলের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সর্বশেষ সংশোধিত ২০১০)-এর ৭ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জুলাই ২০১০ হতে জলাশয় ভরাট, পাহাড়/টিলা ধ্বংস, কৃষিজমির ক্ষতি, নদীর পানিদূষণ, ইটভাটা থেকে দূষণসহ পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষয়ক্ষতির জন্য দূষকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ ধার্যপূর্বক



তা আদায় কার্যক্রম শুরু করে। এ কার্যক্রমের আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত ৪৯৬৬টি শিল্পকারখানা/উন্নয়ন প্রকল্প/স্থাপনা/ব্যক্তির বিরুদ্ধে ২৮৬.৫০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয় যার ১৭৫.৫০ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ হল শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পের যথাযথ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি তদারকি করা। শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ক্ষেত্রবিশেষে তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (Effluent Treatment Plant-ETP) ও বায়বীয় বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (Air Treatment Plant-ATP) স্থাপন এবং কঠিন ও অন্যান্য ক্ষতিকর বর্জ্যের পরিবেশসম্মত অপসারণ নিশ্চিত হয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন করা হয়ে থাকে। তরল বর্জ্যের ক্ষেত্রে শূন্য নির্গমন (Zero Discharge) প্রযুক্তি প্রচলনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মে ২০১৯ পর্যন্ত ১৭৭৩টি প্রতিষ্ঠানে ইটিপি/এটিপি স্থাপিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ইপিজেডে কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ করা হয়েছে। ইটিপি ও এসটিপি হতে সৃষ্ট স্লাজসমূহের নিরাপদ ব্যবস্থাপনার জন্য Bangladesh Standards and Guidelines for Sludge Management প্রণয়ন করা হয়েছে।

ঢাকা মহানগরের পানির ভবিষ্যৎ চাহিদাপূরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য উৎসসমূহ দূষণমুক্ত রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে পানি সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত মেঘনা নদীর সম্ভাব্য স্থানের আশেপাশের এলাকার দূষণের উৎসমুখ ও সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের জিআইএস ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং দূষণবন্ধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক Access to Information (a2i) প্রকল্পের সহযোগিতায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন প্রক্রিয়া এবং গবেষণাগারের ফলাফল প্রদান প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ অটোমেশন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান শিল্পকারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিংয়ের জন্য সার্বক্ষণিক অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

যত্রতত্র শিল্পকারখানা গড়ে ওঠা বন্ধ করতে সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারিভাবে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, যেখানে কেন্দ্রীয় শিল্পবর্জ্য পরিশোধনাগার, কেন্দ্রীয় পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার, কেন্দ্রীয় পানি পরিশোধনাগার, পর্যাপ্ত জলাশয় ও গাছের আচ্ছাদন থাকবে। এতে পরিবেশ দূষণ অনেকাংশে কমে আসবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ হবে।

পরিবেশ অধিদপ্তর ১৯৭৩ সাল থেকে ভূপরিষ্ক ও ভূগর্ভস্থ পানির মান পরিবীক্ষণ করে আসছে। ২৭টি নদীর ৬৩টি স্থানে পানির গুণগত মান নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর ২০১০ সাল হতে প্রতিবছর পানির গুণগতমানের উপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। এছাড়া উপকূল ও সমুদ্র এলাকার সামুদ্রিক পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর মোহনা, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত থেকে ১ কিলোমিটার সোজা সমুদ্র অভিমুখী স্থান, পতেঙ্গা চরপাড়া ও সিইপিজেড থেকে ১ কিলোমিটার সোজা সমুদ্র অভিমুখী স্থানে নিয়মিত সমুদ্রের পানির মানমাত্রা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। ভূপ্রাকৃতিক অনুকূল অবস্থার জন্য বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ। কিন্তু বিপুল জনসংখ্যার এই দেশে দীর্ঘ দিন ধরে চলমান অপরিবর্তিত উন্নয়ন ও অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের ফলে দেশের প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য নানান ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এই অবস্থায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সর্বশেষ সংশোধিত ২০১০) অনুসারে বিভিন্ন সময়ে ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area-ECA) ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন এবং উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার জনগণের অংশগ্রহণে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭ এবং প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৬ জারি ও কার্যকর করা হয়েছে। এছাড়া জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২১ এবং মরুময়তা, খরা ও ভূমির অবক্ষয় মোকাবেলার জন্য জাতীয় কর্মকৌশল ২০১৫-২০২৪ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের শহরগুলোর (সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা) কঠিন বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কম্পোস্ট সার তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও রংপুর শহরে কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও অনুসমর্থিত পরিবেশ বিষয়ক জাতিসংঘের বিভিন্ন কনভেনশন/প্রটোকল/চুক্তির বাধ্যবাধকতা



প্রতিপালনের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন এবং উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশন ও প্যারিস এগ্রিমেন্ট, জাতিসংঘের জীববৈচিত্র্য কনভেনশন ও সংশ্লিষ্ট প্রটোকল, জাতিসংঘের মরুময়তা, খরা ও ভূমির অবক্ষয় সংক্রান্ত কনভেনশন এবং রামসার কনভেনশনের উপর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

এছাড়া ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত মন্ট্রিল প্রটোকলের শর্তানুযায়ী বাংলাদেশে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী সিএফসিযুক্ত বিভিন্ন রিফ্রিজারেন্টের ব্যবহার পর্যায়ক্রমে কমিয়ে ২০১০ সালের ১ জানুয়ারির মধ্যে শূন্যে নামিয়ে আনা হয়েছে এবং বর্তমানে ব্যবহৃত অন্যান্য বিকল্প দ্রব্যসমূহের আমদানি ও ব্যবহার মন্ট্রিল প্রটোকলের টার্গেট অনুযায়ী পর্যায়ক্রমিক হ্রাসের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বিগত বছরের ন্যায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক Pollution Remediation of Dhaka Hazaribagh Tannery Area ও A Study on Preparing River Health Cards of Some Rivers of Bangladesh বিষয়ে দুটি গবেষণা প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউট (IWFM)-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এ অর্থবছরে A Study on Identification of Causes and Effects of Degradation, Deforestation and Erosion of Jhau Plantations and Its impact on Coastal Morphology Development along Cox's Bazar বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে পরিবেশ সংরক্ষণ ও দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও তার আওতাধীন সংস্থা, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রাইভেট সেক্টর, পরিবেশবাদী সংগঠন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ও বাসযোগ্য দেশ গড়ার সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

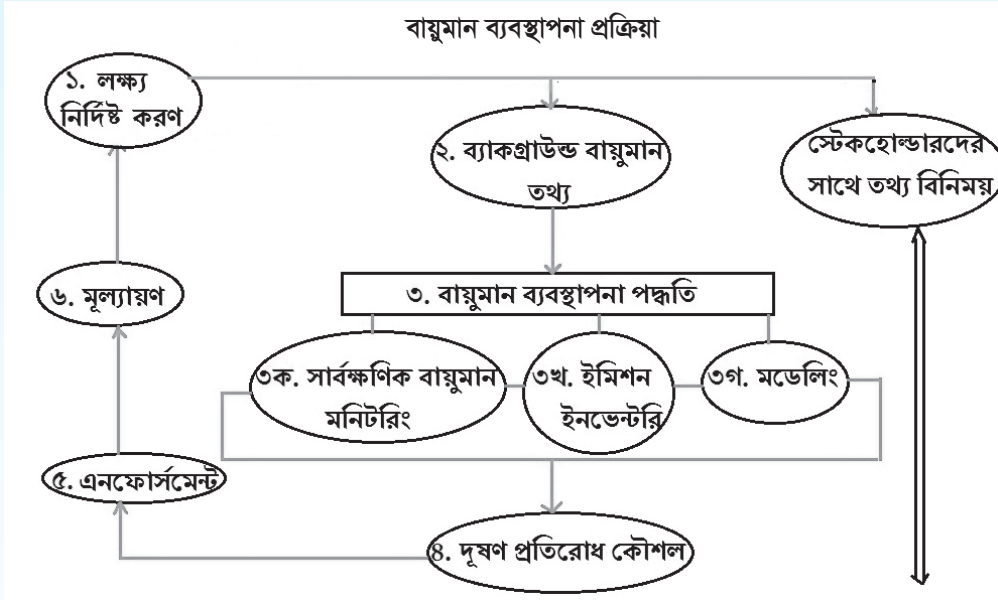
## বায়ুমান ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া: প্রেক্ষাপট ঢাকা

ড. এসএম মনজুরুল হান্নান খান\*

মোঃ আবুল কালাম আজাদ\*\*

মোঃ মাসুদ রানা\*\*\*

বায়ুমান ব্যবস্থাপনা কিছু জটিল কাজের সম্মিলনে পশ্চতকৃত একটি চক্রাকার ও চলমান প্রক্রিয়া যা কোন এলাকার/দেশের বায়ুর মানকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকতে সাহায্য করে। অর্থাৎ, যদি কোনো এলাকার বায়ুর মান উক্ত সীমার উপরে অবস্থান করে তবে উক্ত প্রক্রিয়া বায়ুর মানকে নির্ধারিত সীমার মধ্যে আনতে কার্যকর হয়, আর যদি বায়ুর মান নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই থাকে তবে উক্ত ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া বায়ুর মানকে সীমার নিচেই থাকতে সাহায্য করে। এটি একটি চক্রাকার পদ্ধতি কারণ এর উপাদানসমূহকে চিত্র-১ এর মত চক্রাকারে সজ্জিত করা যায় যেখানে একটি উপাদান তার পূর্ববর্তী উপাদানের উপর নির্ভরশীল থাকে। উপরন্তু, কোনো এলাকার বায়ুদূষণের উৎসসমূহ, আবহাওয়া, জনসংখ্যা, বায়ুমানের নির্দিষ্ট সীমা, ইত্যাদি সময়ের সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল বিধায় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা-ও একটি চলমান প্রক্রিয়া। বায়ুমান ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া এমন হওয়া প্রয়োজন যা বাস্তবায়নে দেশের অর্থনৈতিক গতি বাধাগ্রস্ত হবেনা এবং সামাজিক প্রক্রিয়ায় মন্দ প্রভাব পড়বেনা।



চিত্র-১: বায়ুমান ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার চার্ট

একটি আদর্শ বায়ুমান ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সফলভাবে কার্যকর হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে এই প্রক্রিয়ার অধীন কার্যকর সকল উপাদানের আওতায় মানসম্মত ডাটা উৎপাদন ও সেগুলি সঠিকভাবে সংরক্ষণ। আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মত উন্নত দেশসমূহ তাদের বায়ুমান ভাল রাখার স্বার্থে সমন্বিত বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করে কার্যকর করেছে। সেসব দেশে বায়ুদূষণের জন্য দায়ী উৎস সমূহ ও সেগুলি থেকে নিঃসরণ, বায়ুমান ও আবহাওয়া মনিটরিং ইত্যাদি ডাটা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার বহুলাংশে হ্রাসকরণ, শিল্প কারখানায় কার্যকর নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকরণ ও যানবাহনের মানোন্নয়নের মাধ্যমে সেসব দেশে বায়ুর মান উন্নত করা সম্ভব হয়েছে, বিশেষকরে বায়ুতে সালফার ডাই অক্সাইড ও অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণার (পিএম ২.৫) পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। তবে, বিপুল পরিমাণ যানবাহনের উপস্থিতির কারণে ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক শহর এখনো মাত্রাতিরিক্ত নাইট্রোজেন অক্সাইড, ওজোন ও ফটোকেমিক্যাল স্মগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সেসব শহরে ইলেকট্রিক ইঞ্জিন বিশিষ্ট গাড়ীর ব্যবহার উৎসাহিত করা হচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে লন্ডনের একটি এলাকাকে জিরো নিঃসরণ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে; উক্ত এলাকার মধ্য দিয়ে নিঃসরণ

\* অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ

\*\* উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা

\*\*\* বায়ুমান গবেষক

সৃষ্টিকারী কোনো গাড়ী চলাচল করতে পারবেনা। তীব্র বায়ুদূষণে জর্জরিত চীনও বায়ুমান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করে গত ছয়-সাত বছরে সামগ্রিকভাবে বায়ুদূষণ কমাতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৩ থেকে ২০১৭ সময়কালে চীনের ৬২টি শহরে পিএম২.৫ এর মাত্রা প্রায় ৩০% কমানো হয়েছে। বায়ুমান ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া পরিচালিত করে এক সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত রাজধানী বেজিং এর সালফার ডাই অক্সাইড ও পিএম২.৫ এর মাত্রা যথাক্রমে ৭০ ও ৩৬ % কমানো সম্ভব হয়েছে। যানবাহন, শিল্প কারখানা ও আবাসন উত্তাপ কাজে প্রয়োজন অনুযায়ী নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস, ও জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে পরিচ্ছন্ন জ্বালানী ব্যবহারের মাধ্যমে চীনের শহরগুলোতে দূষণ কমানো সম্ভব হয়েছে। প্রথম ধাপের সফলতায় উৎসাহিত হয়ে দ্বিতীয় ধাপে (২০১৮-২০২০) চীন সেদেশের ৩৩৮টি শহরকে অন্তর্ভুক্ত করে বায়ুমানের অধিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইন্ডিয়া ২০২৪ সালের মধ্যে ১০২টি শহরের বাতাসে পিএম (পার্টিকুলেট ম্যাটার) এর মাত্রা ২০-৩০ % কমানোর লক্ষ্যে সম্প্রতি “ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রোগ্রাম” হাতে নিয়েছে। এছাড়া, নেপাল সরকার সেদেশের বায়ুমানের উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি সে দেশে উন্মুক্ত স্থানে জীবাশ্ম জ্বালানির দহন নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বায়ুমান উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন, জ্বালানীতে লেড এর উপস্থিতি শূণ্য মাত্রায় নামিয়ে আনা, ঢাকা থেকে ২-স্ট্রোক ইঞ্জিন অপসারণ, যানবাহনে পরিচ্ছন্ন জ্বালানী কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস সরবরাহ, ইট-ভাটা থেকে নিঃসরণ কমানোর উদ্যোগে আইন প্রণয়ন, ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তবে, ঢাকা শহরে কোন একটি উৎসকে নিয়ন্ত্রণ করা হলেও পরবর্তিতে অন্য উৎসের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি ও পরিচালনার কারণে বায়ুদূষণ মাত্রা পুনরায় বৃদ্ধি পায়। যেমন, যানবাহনে সিএনজির ব্যবহার বৃদ্ধি ও ২০০৩ সালে ঢাকা শহর থেকে ২-স্ট্রোক ইঞ্জিনবিশিষ্ট বেবিট্যাঙ্কি অপসারণ করার কারণে এই সেক্টর থেকে সার্বিক দূষণ কমে যায়। বাংলাদেশ এটোমিক এনার্জি কমিশন পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, শুধুমাত্র ২-স্ট্রোক ইঞ্জিনবিশিষ্ট বেবিট্যাঙ্কি অপসারণের ফলে ঢাকার বাতাসে সুক্ষ বস্তুকণার উপস্থিতি প্রায় ৪০% কমেছিল। কিন্তু, পরবর্তিতে ইট-ভাটার মত অধিক দূষণ সৃষ্টিকারী উৎসের সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাওয়ায় শহরের বায়ুদূষণ আবারো খারাপ অবস্থানে চলে যায়। “ইট প্রস্তুতকরণ ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন - ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৮)” প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়নের ফলে গত কয়েকবছরে অধিক দূষণ সৃষ্টিকারী ফিল্টার চিমনি জাতীয় ইট-ভাটার প্রায় ৭০% তুলনামূলক পরিবেশ-বান্ধব জিগজ্যাগ ভাটা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নির্মল বায়ু এবং টেকসই পরিবেশ প্রকল্পের আওতায় উৎপাদিত বায়ুমান ভাটা বিশ্লেষণপূর্বক ২০১৩-২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬-২০১৭ সালে ঢাকা শহরের বায়ুতে পিএম২.৫ এর মাত্রার প্রায় ১২% উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু, সম্প্রতি নির্মাণ কাজ ও রাস্তার ধুলিদূষণ মারাত্মক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১৮ সালে ঢাকার বায়ুদূষণ পুনরায় তীব্র আকার ধারণ করেছে। এহেন পরিস্থিতিতে ঢাকা শহরের বায়ুমানের স্থায়ী উন্নতির লক্ষ্যে একটি সমন্বিত বায়ুমান ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া প্রণয়ন করে কার্যকর করা প্রয়োজন। এ ধরনের একটি বায়ুমান ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সর্ধক্ষিপ্ত ধারণা চিত্র-১ এর আলোকে নিম্নে আলোচনা করা হল -

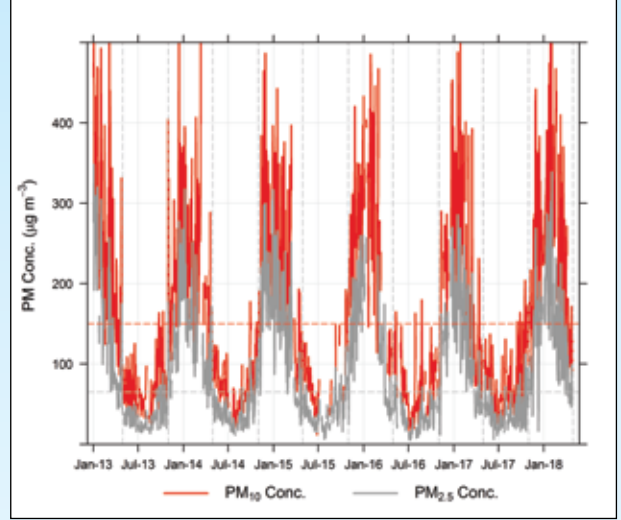
১। দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ঢাকা শহরের বায়ুমান উন্নয়নের একটি লক্ষ্য (চিত্র-১) নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেমন, আগামী ৫ বছরে ঢাকা শহরের বাতাসে পিএম এর মাত্রা ৩০% কমানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। এই লক্ষ্য পূরণ হলে পরবর্তিতে আরো একটি লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা যাবে।

২। ঢাকা শহরের চারপাশে ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী জেলা জুড়ে অবস্থিত ৬০.০ কি.মি. চ ৪৫.০ কি.মি. এলাকাকে ৫.০ কি.মি. চ ৫.০ কি.মি. ভৌগলিক গ্রিডে (চিত্র-২) বিভক্ত করে প্রতিটা গ্রিডে বিদ্যমান উৎস সমূহের ডাটাবেজ প্রস্তুত করতে হবে (চিত্র-১ এর ৩খ. ইমিশন ইনভেন্টরি)। এই ডাটাবেজের মূল তথ্যসমূহ হবে, উৎসের প্রকার, অবস্থান, শক্তির ব্যবহার (ধরন, পরিমাণ, ইত্যাদি), শক্তির সময় ভিত্তিক ব্যবহার, নিঃসরণ প্রকার ও পরিমাণ, ইত্যাদি। পরবর্তিতে সারা দেশব্যাপী এ ধরনের ইনভেন্টরি করতে হবে। উল্লেখ্য, পিএম২.৫ বাতাসে দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকতে পারে বিধায় এক অঞ্চলের উৎস থেকে নিঃসৃত পিএম২.৫ দূর-দূরান্তে গিয়ে অন্য অঞ্চলকে দূষিত করতে পারে।



চিত্র-২: ইমিশন ইনভেন্টরি ও ডিসপারশন মডেলিং এর জন্য ঢাকা ও এর আশেপাশের অঞ্চলকে ৬০.০ কি.মি. X ৪৫.০ কি.মি. ভৌগলিক গ্রিডে বিভাজন।

৩। পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতায় বর্তমানে ঢাকা শহরে ০৩টি সহ সারাদেশে ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং স্টেশন (ক্যামস) কার্যকর আছে। তাছাড়া, ১৫টি কম্প্যাক্ট মনিটরিং স্টেশন দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপনের কাজ চলছে। ঢাকা ও এর আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে আরো ক্যামস স্থাপন করা ও সকল স্টেশন হতে মানসম্মত বায়ুমান ও আবহাওয়ার ডাটা উৎপাদন নিশ্চিত করা প্রয়োজন (চিত্র-১ এর ৩ক. বায়ুমান মনিটরিং)। মানসম্মত বায়ুমান ও আবহাওয়া ডাটা বিশ্লেষণ করে একটি অঞ্চলের বায়ুমানের সার্বিক চরিত্র ও প্রাথমিকভাবে উৎস সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যায় যা বায়ুমান ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উল্লেখ্য, বায়ুমান ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার যে কোনো অংশে উৎপাদিত ভুল ডাটা ভুল নীতি গ্রহণ ও বিপুল অর্থ অপচয়ের কারণ হতে পারে। চিত্র-৩ এ পরিবেশ অধিদপ্তরের কেস প্রকল্পের আওতায় ঢাকার দারুস সালাম এলাকায় অবস্থিত ক্যামস-এ ২০১৩ সাল হতে ২০১৮ সাল সময়কালে উৎপাদিত পিএম<sub>১০</sub> ও পিএম<sub>২.৫</sub> এর মানমাত্রার প্রবণতা দেখানো হল:



চিত্র-৩: ঢাকার দারুস সালাম, মিরপুরের বাতাসে ২০১৩ - ২০১৮ সময়কালে বিদ্যমান পিএম<sub>১০</sub> ও পিএম<sub>২.৫</sub> এর মানমাত্রার প্রবণতা। আনুভূমিক লাল ও ধূসর লাইনদ্বয় যথাক্রমে পিএম<sub>১০</sub> ও পিএম<sub>২.৫</sub> এর বাংলাদেশ আদর্শ বা অনুমোদিত মানমাত্রা।

৪। সার্বক্ষণিক বায়ুমান ও আবহাওয়ার ডাটা বিশ্লেষণ থেকে যেমন জানা যায় যে কোন একটি স্টেশনে/এলাকায় বায়ুদূষণের উপাদানসমূহ (যেমন পিএম<sub>২.৫</sub>) কোন সময়ে কেমন মাত্রা ধারণ করে ও কোন দিক থেকে আসে তেমনি রিসেপ্টর মডেল ব্যবহার করে জানা যায় একটি স্থানে পিএম<sub>২.৫</sub> এর দূষণের জন্য কোন কোন উৎস কতখানি দায়ী। এ দুটি পদ্ধতি একইসাথে ব্যবহার করে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার (বানিজ্যিক, আবাসিক, ইত্যাদি) বাতাসে উপস্থিত পিএম<sub>২.৫</sub> এর জন্য দায়ী উৎসসমূহকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

বায়ুমান ব্যবস্থাপনায় ডিসপারশন মডেলিং একটি কার্যকরী পদ্ধতি। সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং যন্ত্রপাতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় একটি শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে এ ধরনের যন্ত্রপাতি স্থাপন অনেকক্ষেত্রে সম্ভব হয়না। বিকল্পভাবে, ঢাকা শহরের প্রতিটি ভৌগোলিক গ্রীডে (চিত্র-২) প্রস্তুতকৃত ইমিশন ইনভেন্টরি ডাটাবেজ, আবহাওয়ার ডাটাবেজ, ভূমি প্রকৃতির ডাটা ইত্যাদি দিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অত্যাধুনিক একটি ডিসপারশন মডেল চালিয়ে ঢাকা শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে বায়ুমানের তথ্য নির্ণয় করা যেতে পারে। ডিসপারশন মডেল কোন এলাকার অতীত বায়ুমান তথ্য-ই শুধু উৎপাদন করেনা, এই মডেল চালিয়ে কোন এলাকার বায়ুমানের আগাম তথ্য-ও নির্ণয় করা যায়; ফলে, ভবিষ্যতের কোন সময়ে কোন এলাকায় তীব্র বায়ুদূষণের সম্ভাবনা থাকলে উৎসসমূহকে নিয়ন্ত্রণ ও জনগণকে আগেই সচেতন করার মাধ্যমে উক্ত এলাকায় তীব্র দূষণের আক্রমণকে লাঘব করা যেতে পারে।

ডিসপারশন মডেল দিয়ে ঢাকা শহরের গ্রীডভিত্তিক নিঃসরণের সেনসিটিভিটি টেস্ট করে প্রতিটি গ্রীডে কি পরিমাণ নিঃসরণ অনুমোদিত হলে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা যাবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব। অর্থাৎ, ঢাকা শহরে বায়ুদূষণ হ্রাসের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করার জন্য আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে বিবেচনায় রেখে কোন গ্রীডে কোন উৎসের নিঃসরণ কতখানি কমানো যেতে পারে তা মডেল সিমুলেশনের মাধ্যমে নির্ণয় করে কার্যকর করা যেতে পারে। এ ধরনের সিমুলেশন করার সময় বায়ুমান ডাটা বিশ্লেষণ হতে নির্ণীত ঢাকা শহরের বায়ুমান চরিত্র ধর্তব্যে রাখা যেতে পারে। যেমন, শুষ্ক মৌসুমে শীত (ডিসেম্বর-জানুয়ারী) ও গ্রীষ্ম (ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল) কালে বাতাসে সূক্ষ্ম (পিএম<sub>২.৫</sub>) ও মোটা (পিএম<sub>২.৫-১০</sub>) বস্তুকণার বিপরীতধর্মী আধিপত্য দেখা যায় অর্থাৎ এই দুই কালে উৎস সমূহের আধিপত্য-ও ভিন্ন। দিন ও রাতের বায়ুদূষণের চরিত্র-ও ভিন্ন। এসব বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে কোন সময়ে শহরের কোন পাশের উৎসকে কতখানি অপারেশন করতে দেয়া যায় তার একটি সিডিউল মডেল সিমুলেশনের মাধ্যমে হিসাব করে নির্ধারণ করে দেয়া যেতে পারে।

৫। ঢাকা শহরের ভিতরে ও আশেপাশে বিদ্যমান উৎসসমূহে এনার্জি ব্যবহারের পদ্ধতি (টেকনোলজি, প্রাকটিস, ইত্যাদি) তে সংস্কার এনে প্রাথমিকভাবে নিঃসরণ কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্মল বায়ু এবং টেকসই পরিবেশ (কেস) প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত একটি সমীক্ষায় বিদ্যমান ইট-ভাটার ডিজাইন, ও কয়লা পোড়ানোর



রীতিনীতিতে পরিবর্তন এনে ইট পোড়ানোতে কয়লার ব্যবহার প্রায় ৪০% ও পিএম নিঃসরণ প্রায় ৭০% কমানো সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঢাকা শহরের চারপাশের ইট-ভাটা ও পর্যায়ক্রমে দেশের সকল ইট-ভাটায় এ ধরনের উন্নত ডিজাইনের নকশা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

শুষ্ক মৌসুমে ঢাকা শহরে বায়ুদূষণের অন্যতম উপাদান হচ্ছে ধূলিকণা যার প্রধান উৎস হচ্ছে নির্মাণ কাজ, অনাবৃত স্থান ও রাস্তার ধূলা। ঢাকা শহরে বিদ্যমান সকল মাঠ, রাস্তার পাশের অনাবৃত স্থান স্বল্প সময়ের মধ্যে আবৃত করে দেয়া প্রয়োজন। মাটি ও বালি পরিবহনে অধিক সতর্কতা ও কড়াকড়ি আরোপ করতে হবে যাতে পরিবহনকালে রাস্তায় নূন্যতম-ও মাটি বা বালি না পড়ে। শহরে প্রবেশের প্রাঞ্চলে মাটি/বালি বহনকারী যানবাহনের ঢাকা অবশ্যই পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এছাড়া, ইমারত ভাঙ্গা ও নির্মাণকালে ধূলা নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ভবন ভাঙ্গার সময় অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন “সাকশন যন্ত্র” ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখা যেতে পারে। উল্লেখ্য, কাপড়, পাটের চট, ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে নির্মাণাধীন বা ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে এমন ভবন থেকে সূক্ষ্ম বস্তুকণা ছড়িয়ে যাওয়া আটকানো যায়না। তবে, এসব কাপড়/পাটের চট নিয়মিত ভিজিয়ে রাখলে বস্তুকণার নিঃসরণ কিছুটা আটকানো সম্ভব হতে পারে। রাস্তা নির্মাণ/সংস্কার ও বিভিন্ন কাজে খোঁড়াখুঁড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ ধূলা সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক সমন্বয়, খোঁড়াখুঁড়ি থেকে উত্তোলিত মাটির (উক্ত স্থান ও সময়েই) সঠিক ব্যবস্থাপনা, ও একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা কর্তৃক এরূপ খোঁড়াখুঁড়ি অনুমোদন ও তদারকি রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি থেকে ধূলি দূষণ কমিয়ে আনতে সহায়ক হতে পারে। রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির প্রকার, ব্যাপকতা, আবাসিক/গুরুত্বপূর্ণ স্থান হতে দূরত্ব ও দিক (বায়ুপ্রবাহের সাপেক্ষে) ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে উক্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা খোঁড়াখুঁড়ির অনুমোদন প্রদান করতে পারে এবং দিনের কোন্ সময়ে কাজ করতে হবে ও খোঁড়াখুঁড়িকালে কি ধরনের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে তার একটি গাইডলাইন তৈরি করে দিতে পারে।

৬। যানবাহনে সিএনজি ব্যবহারের কারণে এই সেক্টর থেকে পিএম নিঃসরণ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। তবে, গাড়ীর সংখ্যা মারাত্মক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় ঢাকা শহরের বর্তমান বায়ুদূষণে এই সেক্টরের অবদান নেহায়েত কম নয়। তাছাড়া, শহরে এখনো ডিজেল চালিত পুরাতন কিছু মিনিবাস, লেগুনো ইত্যাদি যানবাহন চলাচল করে যেগুলো থেকে মাত্রাতিরিক্ত নিঃসরণ নির্গত হয়। ইদানিংকালে ঢাকা শহরে মোটর সাইকেলের পরিমাণ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কেস প্রকল্পের যানবাহন নিঃসরণ পরিবীক্ষণ সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, দেশের রাস্তায় চলমান সব ধরনের মোটর সাইকেল থেকে অনেক বেশি মাত্রায় কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোকার্বন নির্গত হয়। যানবাহন সেক্টর থেকে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ঢাকা শহরব্যাপী যানবাহন নিঃসরণ পরিমাপের ও গাড়ি মেরামতের অবকাঠামো তৈরি করতে হবে যাতে করে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর সকল গাড়ি তার নিঃসরণ মাত্রার সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে পারে, এবং অধিক নিঃসরণ সৃষ্টিকারী যানবাহন মেরামতের মাধ্যমে তার নিঃসরণ মাত্রা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নিয়ে আসতে পারে। এছাড়া, অলস অবস্থায় ইঞ্জিন চালু থাকলে যানবাহন থেকে অধিক মাত্রায় নিঃসরণ সৃষ্টি হয় বিধায় রাজধানীর রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম কমিয়ে যানবাহনের নিয়মিত গতি নিশ্চিত করতে হবে।

৭। আমাদের দেশে উন্মুক্ত চুলায় রান্না থেকে বিপুল পরিমাণ কালো কার্বন নির্গত হয়ে বায়ুকে দূষিত করে। কালো কার্বন পিএম২.৫ এর উপাদান এবং এটি উৎস হতে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে সক্ষম। মানব স্বাস্থ্যের উপর এই কালো কার্বনের ক্ষতিকর প্রভাবও মারাত্মক। বিশ্বখ্যাত জার্নাল “ন্যাচার” এ প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে দেখানো হয়েছে যে ২০১০ সালে বাংলাদেশে বায়ুদূষণ জনিত মোট মৃত্যুর শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ বাসস্থানে উন্মুক্ত জ্বালানী ব্যবহারের কারণে হয়েছে। এমাতাবস্থায়, বাসস্থানে উন্মুক্ত চুলায় রান্না থেকে নিঃসরণ কমানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। ইদানিং দেশের গ্রামগুলোতে “বন্ধু চুলা” নামে স্বাস্থ্যবান্ধব এক প্রকার চুলা প্রসার লাভ করেছে। এ ধরনের চুলায় যিনি রান্না করেন তিনি সরাসরি দূষণ থেকে রেহায় পেলেও মোট নিঃসরণের পরিমাণ কমে না। বন্ধু চুলার চিমনির সাথে কিছু নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যুক্ত করা যায় কি-না তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

৮। বনায়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে বায়ুদূষণ কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। বায়ুদূষণ একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর পরিবেশগত অবস্থা। মানবদেহে এর প্রভাব ভয়াবহ, বিশেষ করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বায়ুদূষণের কারণে চরমভাবে ব্যাহত হয়। শুষ্ক মৌসুমে ঢাকাসহ সারাদেশ তীব্র বায়ুদূষণে আক্রান্ত হয় যা থেকে উত্তরণ সময়ের চাহিদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার, জনগণ, শিল্প উদ্যোক্তা ও গবেষকগণের সম্মিলিত প্রয়াস এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে একটি অর্থ-সাশ্রয়ী, বিজ্ঞান-সম্মত ও টেকসই পন্থা প্রণয়নে গবেষকগণকে-ই প্রাথমিক ভূমিকা পালন করতে হবে। এই প্রবন্ধে বর্ণিত বিষয়াবলী উক্ত পন্থা প্রণয়নে সহায়ক হতে পারে বলে আশা করা যায়।

## পরিবেশ রক্ষায় পাটের ভূমিকা ও দেশবাসীর করণীয় কী

প্রফেসর ডঃ এম শমশের আলী\*

পাট নিয়ে কথা বার্তা অনেক দিন ধরে চলছে। পাট আমাদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামে যে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে একথা কারও অজানা নয়। ১৯৭৩ সালে যখন সারা পৃথিবী ব্যাপী তেল সংকট দেখা দিয়েছিল তখন পাটকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগটি আমরা নিতে পারিনি মূলত আমলাতান্ত্রিক কারণেই। এরপরেও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে পাটের গুরুত্ব মোটেও কমেনি। আমরা পাটের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করেছি [সরকার একটি বিশিষ্ট ঘনত্বের নিচে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। এই সিদ্ধান্তকে সারা দুনিয়া বাহবা দিয়েছে] সরকার পাটের গুরুত্বের কথা বলেছে এবং পাট চাষীদেরকে উৎসাহ দিচ্ছে। বেশ কিছুদিন আগে আমাকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এটা দেখবার জন্য যে, পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাটকে জীবনের সব ঘাটে কি করে ব্যবহার করা যায়। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন এন জি ও কে ডাকা হলো। যেখানে কর্মরত মহিলাদেরকে পাট দিয়ে লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, মেরুন রঙের মনকাড়ানো ফাঁক ফোকরযুক্ত (নেটের) পাটের ব্যাগ তৈরি করতে বলা হলো তাদের তৈরি ব্যাগের চেহারাটা ছিল নিম্নরূপ:

এই ব্যাগগুলোর ধারণ ক্ষমতা বিভিন্ন রকম ছিল; ১ কেজি থেকে শুরু করে ১০ কেজি পর্যন্ত। ব্যাগগুলো মেয়েরা তাদের ভ্যানিটি ব্যাগে এবং পুরুষরা তাদের প্যান্টের পকেটে অনায়াসই ভাজ করে রাখতে পারে। আইডিয়াটা এরকম ছিল যে, মাসের বাজার তো একবারই করা হয় তখন পাটের বস্তা ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্য সময়ে টুকটাকি বাজার করার সময়ে সাধারণত ১০ কেজির বেশি কেনাকাটা করা হয় না। এই ব্যাগগুলোর দাম ছিল ৩ টাকার মত। এগুলো বিদেশে রপ্তানি করার জন্য উপযোগী ছিল। কারণ একটিই, সমগ্র বিশ্বের পরিবেশ রক্ষার খাতিরে ‘বায়োডিগ্রেডেবল’ জিনিস ব্যবহারের দিকে লোকদেরকে আগ্রহী করা। তাছাড়া বিদেশে যখন কোন জিনিস বিশেষ করে কাঁচামাল বিক্রি করা হয় তখন স্কেল/দাঁড়িপালায় মাপার পর একটা কাগজের মোড়কে সেগুলোকে পুড়ে একটা ব্যাগের মধ্যে দেওয়া হয়। যে পাটের ব্যাগগুলোর কথা বললাম সেগুলোতে ছিদ্রের সাইজ ঐ মোড়কের চাইতে অনেক কম। তাই জিনিসপত্র যে ব্যাগের ছিদ্রগুলো দিয়ে পড়ে যাবে তা নয়। আটা ময়দা চাল পুড়ে যেতে পারে কিন্তু সেগুলো বিদেশে তো বটেই আমাদের দেশেও কাগজের প্যাকেটে দেয়া হয়। তাই এই ব্যাগগুলো বাজারঘাট করার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। আরেকটি সুবিধা হলো এই এগুলো শুধু ‘ওয়ান টাইম’ ব্যবহারের জন্য নয়, এগুলোকে বেশ অনেকবার ব্যবহার করা যায়। আর দামও অত্যন্ত কম। এই ব্যাগ গুলোর উপরে ওয়াক্সের প্রলেপ দেয়া যায় যাতে সামান্য বৃষ্টিতে ব্যবহার করা যায়। বিদেশে সুপারমার্কেট গুলোতে এই ব্যাগগুলো ব্যবহারের ভাল সুযোগ এখনও আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বিদেশে সুপার মার্কেট গুলোতে আমরা যখন বাজার করি তখন সেলস গার্ল জিজ্ঞেস করেন ‘Do you need a bag?’ তখন আমাদের মধ্যে যিনি ‘yes’ উত্তর দেন তিনিও খেয়াল করেন না যে শপিং বিলের সাথে একটি পলিথিন ব্যাগের মূল্য জুড়ে দেয়া হয়। একটা ব্যাগের মূল্য যদি এক ডলারের ২০ সেন্ট হয় তবে সেটা কারও গায়ে লাগে না। এই পলিথিন ব্যাগ বার বার ব্যবহার করা যায় না এবং এটা পরিবেশ নষ্ট করে। তাই আমাদের পাটের নেট ব্যাগগুলো যদি বিদেশীরা ৫/৭ টাকাতোও কিনে নেয় তবু ব্যাগ গুলোতে কিছুটা লাভ থাকতে পারে। এ ব্যাপারে আমি আমাদের দেশের দু একজন শিল্পপতির সঙ্গে কথা বলেছিলাম, সহজেই এই ব্যাগগুলো যাতে তারা দেশে বিদেশে ছড়িয়ে দিতে পারেন ও পরিবেশ রক্ষায় একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারেন। কিন্তু পরবর্তীতে বিষয়টি বেশীদূর এগোয়নি।



এখন বিদেশের কথা বাদ দিয়ে দেশের কথাতে আসি। ১৬/১৭ কোটি লোকের একটা দেশের একটি বড় আভ্যন্তরীণ বাজার আছে। এখানে ‘ফিজিবিলিটি স্টাডি’ এর কোন অবকাশ নেই। ধনী দরিদ্র সবাই জিনিস কিনে, সবারই ব্যাগ দরকার। এখানে একটি জিনিসই গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এই যে, এই নেট ব্যাগ বানাবার জন্য পাটের ‘Yarn’(ইয়ার্ন) দরকার। সুতরাং কয়েকটি মিলকে শুধু এই ইয়ার্ন তৈরি করার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে। আনন্দের কথা এই যে, কয়েকটি পাটকল পাওয়াও গিয়েছিল এই উদ্দেশ্যে। কিন্তু সমস্যাটা

\*প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

যেখানে দাঁড়ালো সেটা হলো এই যে, ব্যাগ গুলো ব্যবহার করতে হলে পলিথিনের ব্যাগ (যার ব্যবহার সরকারিভাবে নিষিদ্ধ) বানানো বন্ধ করতে হবে। এখানেই একটা প্রথম ধাক্কা আসলো। আমি ধানমন্ডির কয়েকটি রাস্তায় ফেরিওয়ালাদেরকে বোঝাতে শুরু করলাম এবং আইনের কথা বলে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করলাম এবং কয়েকবার নৈতিকতার দোহাই দিয়ে তাদের ব্যাগগুলো নিয়ে নেয়া হলো। কিন্তু এরা যে যুক্তিটা দেখালো তা সত্যিই অকাট্য। এদের কথা হলো “আমাদের কাছ থেকে ব্যাগ গুলো না হয় নিয়ে নেয়া হল, কিন্তু যেসব মেশিন দিয়ে এই ব্যাগ গুলো তৈরি করা হচ্ছে সেগুলো জন্ম করা হচ্ছে না কেন”। এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিনি। কিন্তু সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে একথাটা তুলে ধরেছি যে সরকার পাটকে যখন এতই গুরুত্ব দিচ্ছে তখন পলিথিন ব্যাগ বানানোর মেশিন গুলো কি করে টিকে থাকে। তবে আশা করি সরকার দেরীতে হলেও এই ব্যাপারে কড়া ভূমিকা পালন করবে। ইতোমধ্যে প্রমোশন অব জুট-এই নামে কিছু যে করা হয়নি তা না। মেয়েদের জন্য হ্যান্ডব্যাগ, বোতল রাখার জন্য ব্যাগ, লাঞ্চ নেয়ার জন্য পাটের ব্যাগ ইত্যাদি চালু হয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পাটের ‘কোটি’ ও অন্যান্য জামা কাপড় ও শাড়ীও বানানো হচ্ছে। মজার কথা হল পাট এখন BMW গাড়ীর ড্যাশ বোর্ডেও ব্যবহৃত হচ্ছে। পাটের নানাবিধ ব্যবহার চালু হলেও শপিং ব্যাগ হিসেবে পাটের ব্যবহার (যা বঙ্গ সন্তান ৩০ বছর আগেও হাতে নিয়ে বাজারে যেতেন) যার কথা উপরে উল্লেখ করা হলো তার কোন বিকল্প নেই। ইতিমধ্যে ডঃ মোবারক আহমেদ খান যিনি বর্তমানে বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশনের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন তিনি নিজেও একটি বায়োডিগ্রাডেবল ব্যাগের উদ্ভাবন করেছেন। এগুলো বড় স্কেলে চালু করতে হলে যে যন্ত্রায়ন ও মার্কেটিং এর দরকার তা এখনও ঠিকমতো করা হয়নি। এই কাজটাও অবিলম্বে করা দরকার। তবে আমি যে নেট ব্যাগের কথা আগে বললাম সেগুলোর সুবিধা হলো এই যে মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজের ভিত্তিতে ঘরে বসেই মেয়েরা কাজটা করতে পারবে। এতে উইমেন’স এম্পাওয়ারমেন্ট কাজটার অগ্রগতি হবে, দেশের লোকের জন্য পরিবেশ বান্ধব অবস্থার সৃষ্টি হবে। এইসব কাজগুলো করতে হবে বিভিন্ন গ্রুপকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে এবং করতে হবে এখনই। এই দায়িত্ব গুলো হতে পারে নিম্নরূপ:

১. পরিবেশের ক্ষেত্রে সরকারের এক নম্বর কাজ হবে কিছু পাট মিলকে শুধু পাটের Yarn তৈরি করার জন্য নির্দিষ্ট করা। সরকারের আরেকটি বড় দায়িত্ব হবে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্ত আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা। মনে রাখতে হবে এখানে কাউকে বিন্দু মাত্র ছাড় দিলে দেশের ক্ষতি হবে অনেক বেশি। যেসব অবিবেচক ও বিবেকহীন ব্যবসায়ী পলিথিন ব্যাগ তৈরি করছেন ও বাজারে ছাড়ছেন তাদেরকে সনাক্ত করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। যেকোনো বাজারে গিয়ে তরিতরকারি বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে সে কোথা থেকে ওগুলো কিনেছে, তাকে সাথে নিয়ে যার কাছ থেকে কিনেছে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। এইভাবে এগিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাগের উৎপাদনকারি মেশিনটার খোঁজ পাওয়া যাবে এবং তার মালিকের সন্ধান মিলবে। তখন মালিককে আইনের আওতায় এনে বিচার করলে এই পলিথিন ব্যাগের ছড়াছড়ি বন্ধ হবে। যারা উৎপাদন করছে মূলতঃ তারাই দায়ী, পেটের দায়ে যারা জিনিস বিক্রি করতে পলিথিন ব্যবহার করে তাদেরকেও পুলিশ ধরতে পারে এবং কিছুটা অর্থনৈতিক দন্ড দিতে পারে। তবে পলিথিনের ‘নাটের গুরু’ যারা তাদেরকে শাস্তি না দিতে পারলে এবং তাদের মেশিন জন্ম না করতে পারলে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা বন্ধ হবেনা। এই মেশিনটি ইমপোর্ট লিস্ট থেকে বাদ দিতে হবে। আশা করি সরকার জরুরী ভিত্তিতে দায়িত্বটি পালন করবে। তখনই পাটের ‘প্রমোশন’ অর্থবহ হবে।

২. পরিবেশ ঠিক রাখতে হলে মিনিউসিপালিটি কর্তৃপক্ষকে ঢাকা শহরের ডেইন গুলো পরিষ্কার করতে হবে এবং এর উপরে শক্ত ‘কভার’ দিতে হবে। বেশ কিছুদিন আগে যখন ধানমন্ডির রাস্তায় ডেইন ঠিক করা হল এবং লেকের সাথে সংযোগ করা হল তখন কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছিল ডেইনের উপর স্লাব দিয়ে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করতে যাতে পাতা ও অন্যান্য ময়লা ডেনে পড়ে ডেইন গুলো বন্ধ না হয়ে যায়। তখন তারা বলেছিলেন যে ডেইনের উপর কভার দেয়া হবে। সেই কভার দেয়িতে দেয়া হল কংক্রিটের স্লাব হিসেবে এবং ডেইন গুলো না পরিষ্কার করে। কিছুদিন পর দেখা গেলো স্লাব গুলোর অংশ বিশেষ ভেঙ্গে গেছে। ডেইন গুলো ময়লায় ভর্তি হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে ঢাকায় বৃষ্টি হলেই রাস্তা ঘাট যে ডুবে যায় তার একটি কারণ হল ডেইন গুলো দিয়ে পানি সরতে পারে না, ডেইন গুলো পাতা ও পলিথিন ব্যাগ দিয়ে ভর্তি। এ ব্যাপারে মিনিউসিপালিটি গুলো যত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ততই দেশ ও দেশের জন্য মঙ্গল।



৩. পরিবেশ রক্ষায় স্কুল কলেজ ও বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। তারা মিনিউসিপালিটি কর্তৃপক্ষের সহায়তায় মাসে একবার ছুটির দিনে আশেপাশের লেকগুলো (ধানমন্ডি, বনানী, গুলশান লেক ইত্যাদি) পরিষ্কারের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাদের এই পরিবেশ বাঁচানোর কাজ দেখে জনসাধারণের মধ্যেও পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি হতে পারে। ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে গেলে দেখা যায় যে, নালাডোবাগুলো পলিথিন ব্যাগে ভর্তি হয়ে গেছে; অথচ সেগুলোর পাশ দিয়ে ছেলেমেয়েরা ‘ব্যাকপ্যাক’ নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি ছাত্রদেরকে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ছাত্রদেরকে উৎসাহ দেন এবং শিক্ষক ছাত্র মিলে পলিথিনে ভরা ডোবা নালা গুলো পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করেন, তবে একদিকে যেমন পরিবেশ ঠিক থাকবে অন্যদিকে জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বাড়বে।

৪. টেক্সটবুক কর্তৃপক্ষকেও একটা দায়িত্ব পালন করতে হবে। স্কুল গুলোর পরিবেশ সংক্রান্ত পাঠ্যসূচীতে পাটের উপযোগিতা সম্পর্কে তথ্য ও গল্প থাকতে হবে। এগুলো শেখার পর একটি মেয়ে বাড়িতে তার বাবা বাজারে যাওয়ার সময়ে যদি বলে ‘আবু তুমি পাটের ব্যাগ ছাড়া অন্য কোন ব্যাগ নিয়ে বাজারে যাবে না’ তখন বাবা দুবার ভাববেন। স্ত্রীর সং পরামর্শ সব সময় না শুনলেও সব বাবারাই মেয়েদের পরামর্শ গভীর আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে। যদি সব পরিবারেরে সদস্যরা পাটের ব্যবহার সম্পর্কে উৎসাহী হন তখন পলিথিন ব্যাগ প্রস্তুতকারীরাও বেকাদায় পড়বেন।

পরিশেষে বলতে চাই যে, নানা ক্ষেত্রে অর্জনকারী দেশ হিসেবে আমরা বাংলাদেশীরা গৌরব বোধ করি কিন্তু যখন পরিবেশ বিপন্নকারী দেশগুলোর মধ্যে আমাদের বাংলাদেশকে দেখি তখন লজ্জায় আমাদের মাথা হেট হয়ে যায়। আমরা কি পারি না পরিবেশবান্ধব দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে। নিশ্চয়ই পারি। তবে যেটা করতে হবে আমাদের, তা হলো সব কাজের জন্য সরকারকে দায়ী করলে চলবে না। সরকার তো গঠিত হয় আমাদের মধ্যকার লোক কে নিয়েই। যদি আমাদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং সব ‘পেয়ারস’ (সরকার, পরিবার, বিচারক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, মিডিয়া) পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে তবেই আমরা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভালভাবে বাঁচার মত একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে পারব। এতে আমরা গভীর ভাবে আশাবাদী।



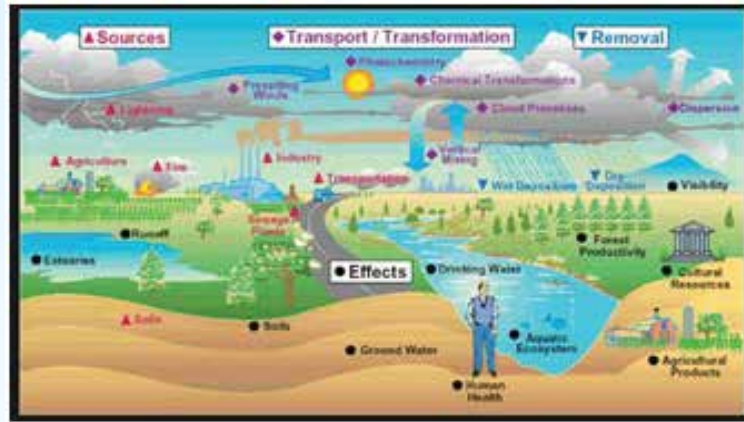
## বায়ুদূষণের সাতকাহন: সমাধান কোথায়

কাজী সারওয়ার ইমতিয়াজ হাশমী\*

‘বায়ুদূষণ’ বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। সঙ্গত কারণেই এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হওয়ায় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে আজ অবধি জনস্বার্থে মামলা বা Public Litigation হয়েছে বহু দেশে। কাঠগড়ায় দাড়াতে হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। জবাবদিহি করতে হয়েছে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জন্য।

প্রবাদ আছে মানুষ খাদ্য ছাড়া এক মাস, পানি ছাড়া সাত দিন কিন্তু বাতাস (অক্সিজেন) ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচতে পারে না। মানুষের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য এই প্রাকৃতিক উপাদান-কে আমরা প্রতিনিয়ত নিজের অজান্তে দূষিত করে তুলছি। নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করে তুলছি।

বায়ু মন্ডলে যখন অতিমাত্রায় ক্ষতিকর গ্যাসের অনুপ্রবেশ ঘটে তখন বায়ুদূষণ হয়েছে বলে ধরা হয়। দূষিত বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে গ্রহণ বা দূষিত বায়ুর সংস্পর্শে (Exposure) মানুষ দীর্ঘসময় ধরে থাকলে শ্বাসতন্ত্রের নানা ধরনের রোগ দেখা দেয়। অসুস্থতার কারণে মানুষের অনেক কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়। এমনকি মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হয়। পৃথিবীব্যাপী বিষয়টি এখন চরম উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। বায়ুদূষণ শুধু যে মানুষের ক্ষতি করছে তা কিন্তু নয়। জীবজন্তু, ফসল এমনকি অবকাঠামো বা স্থাপনার ক্ষতিসাধন করছে। সার্বিকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। উপরন্তু মানুষের নানাবিধ কর্মকাণ্ড এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতেও বায়ুদূষণ হচ্ছে।



বায়ু দূষণের উৎস, সঞ্চালন ও প্রভাব

বিশ্বব্যাপী Toxicity বা বিষাক্ততা নিয়ে গবেষণাকারী যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা Blacksmith Institute (বর্তমানে Pure Earth) ২০০৮ তাদের প্রকাশিত ‘World Worst Pollution Problems Reports’-এ ঘরের ভেতরের বায়ুদূষণ (Indoor Air Pollution) এবং শহরাঞ্চলের নিম্নমানের বায়ুকে (Poor Air Quality) এই দুটি বিষয়কে পৃথিবীর Top Ten World’s Worst Pollution Problem হিসেবে তালিকা গ্রহণ করা হয়। এরপর বিশ্বব্যাপী সমস্যাটিতে আরও গভীরভাবে দেখা ও সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ।

২০১৪ সালে বিশ্ব ব্যাংকের প্রকাশিত প্রতিবেদনে বায়ুদূষণের কারণে ২০১২ সালে পৃথিবীতে প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে বলে উল্লেখ করে। নতুন কিছু প্রামাণ্যাদির ভিত্তিতে The Global Commission on Pollution Health and UN Environment এর # Beat Pollution কেম্পেইন এর যৌথ প্রচেষ্টায় প্রণীত প্রতিবেদনে বায়ু, পানি ও মাটি দূষণ পৃথিবীব্যাপী মানুষের মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করে। পৃথিবীতে বায়ুদূষণের কারণে প্রতি বছর ৯০ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে বলে উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। আমাদের জন্য উদ্বেগের কারণ হচ্ছে, এর মধ্যে সিংহভাগ মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের ঘটনা ঘটে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের মানুষের ভাগ্যে, যা শতকরা ৭০ ভাগ।

## দেশে বায়ু দূষণের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণাঃ

মানবস্বাস্থ্য খাদ্যশস্য ও অবকাঠামো বা স্থাপনার ওপর বায়ুদূষণের প্রভাব সম্পর্কে জানার চেষ্টা হয়েছে পৃথিবীব্যাপী। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ মানব স্বাস্থ্যের ওপর কী প্রভাব ফেলছে তা দেখার চেষ্টা করা হয় ২০০৬ ও ২০০৭ সালে। বায়ুদূষণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক কার্যক্রম মালে ঘোষণাপত্রের আওতায় জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP), স্টকহোম এনভায়রনমেন্ট

\*অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পিআরএল), পরিবেশ অধিদপ্তর

ইনস্টিটিউট (SEI), পরিবেশ অধিদপ্তর এবং নিপসমের পরিবেশ ও পেশাগত স্বাস্থ্য বিভাগ যৌথভাবে গবেষণাটি পরিচালনা করে। ঢাকা শহরের ফার্মগেট, ধানমন্ডি ও তেজগাঁও এলাকায় ১টি করে মোট ৩টি স্কুলের ৫ম থেকে ৯ম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ওপর আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গবেষণা প্রোটোকল অনুসরণ করে গবেষণাটি পরিচালিত হয়। এতে দেখা যায়, শীতকালে বা শুষ্ক মৌসুমে বাতাসে ভাসমান সূক্ষ্ম বস্তুকণা (PM<sub>2.5</sub>) মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতির কারণে এ্যাজমা প্রদাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এখানেই শেষ নয়। ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ থেকে Secondary Pollutant হিসেবে Ground Level এ ওজোন (O<sub>3</sub>) গ্যাস সৃষ্টি হয় (হাইড্রোকার্বন, সূর্যালোক ও নাইট্রোজেন অক্সাইডে বিক্রিয়ায়)। সৃষ্ট ওজোন গ্যাস বায়ুমন্ডলের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বহুদূর পরিবহন করে। এক পর্যায়ে ভূমিতে অবস্থান নেয়। Secondary Pollution হিসেবে সৃষ্ট ওজোন গ্যাসের প্রভাবে ফসলে কী ধরনের ক্ষতি সাধন হয় তা দেখার চেষ্টা করা হয়। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গবেষণা প্রোটোকল অনুসরণ করে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP)-এর তত্ত্বাবধানে স্টকহোম এনভায়রনমেন্ট ইনস্টিটিউট (SEI), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ ও পরিবেশ অধিদপ্তর যৌথভাবে মালে ঘোষণাপত্রের আওতায় Air Pollution Impact on Crop স্ট্যাডিস্টি পরিচালনা করে। ২০০৭-০৯ ও ২০১০-১১ সময়কালে উক্ত Crop Impact Study-টি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে পরিচালিত হয়। ২০০৭-০৯ সময়কালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর গ্রীনহাউজ ও গবেষণা প্লটে Bio-Indicator হিসেবে ইংল্যান্ড থেকে আনা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ সাদা ক্লোভার (২৫টি Ozone Sensitive ও ২৫টি Ozone Non-sensitive) এর উপর Secondary Pollutant হিসেবে সৃষ্ট ওজোন গ্যাস কি প্রভাব ফেলতে পারে তা দেখা হয়। এতে Ozone Sensitive ক্লোভারে ওজোন গ্যাসের উপস্থিতির হিসেবে ক্ষত চিহ্ন দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা ওজোন গ্যাসের উপস্থিতি হিসেবে এরপর আলু, মুগডাল, গম ও পালাং শাকের ওপর ওজোন গ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব নিরূপণ করেন। এতে ফসলহানীর বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। পরে Ethanol Dry Uria (EDU) কেমিক্যাল ব্যবহার করে ক্ষতিহ্রাসের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।

দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির কারণে সাম্প্রতিক সময়ে সিসায়ুক্ত ব্যাটারীর (Lead Acid Battery) ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন ধরনের যানবাহন, সোলার হোম সিস্টেম, তাত্ত্বিক বিদ্যুৎ সরবরাহ (আইপিএস) ইত্যাদির ব্যবহারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সিসায়ুক্ত ব্যাটারীর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কারণেই নষ্ট বা পরিত্যক্ত ব্যাটারীর বর্জ্যের সংখ্যা পরিত্যক্ত সিসায়ুক্ত ব্যাটারী যার তার কাছে অবৈধভাবে ভাঙ্গার ফলে মাটিতে মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি পাওয়া গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ ও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক বিষাক্ততা গবেষণাকারী সংস্থা Pure Earth এর সমীক্ষায়। ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের মে মাস পর্যন্ত ২৬০টি সিসাদূষণের শিকার এমন সাইট চিহ্নিত করেছে এবং সেখানে উচ্চ মাত্রায় সীসার উপস্থিতি পাওয়া গেছে, যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ব্যায় বহুল হওয়ায় ১টি সিসা দূষণের শিকার সাইটে দূষণ অপসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। গবেষণাকালে দূষণের সংস্পর্শে আসা শিশুদের রক্তে উচ্চমাত্রায় সীসার উপস্থিতি ধরা পড়েছে বলে ICDDR,B শিশুদের রক্তের নমুনা বিশ্লেষণের পর জানায়। সিসা শিশুদের বুদ্ধি বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। শিশু হাবাগোবা হয়।

ঢাকার সড়ক ও ঘরের ভিতরে বায়ুদূষণ বিষয়ে সম্প্রতি পরিচালিত দুটি গবেষণায় শিশুরা মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কেন্দ্র ও যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে পরিচালিত গবেষণা দুটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ সংশ্লিষ্ট ছিল। গবেষণায় ঢাকার রাস্তার ধূলায় উচ্চ মাত্রায় সিসা, ক্যাডমিয়াম, দস্তা, ক্রোমিয়াম, নিকেল, আর্সেনিক, ম্যাঙ্গানিজ ও কপারের উপস্থিতি শনাক্ত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যানবাহন চলাচল, যানজট ও বেশ কিছু সংখ্যক ধাতু গলানোর কারখানার দূষককে (Pollutant) দায়ী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

উক্ত দুটি গবেষণা প্রতিবেদনের ফলাফল দেশের একটি শীর্ষ স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর বিষয়টি মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নজরে আনা হয়। জনগুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বায়ুদূষণ রোধে ব্যর্থতার কারণ দর্শানো এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় নির্দেশানা প্রদান করেন।

### এখন আমরা কি করতে পারি?

এতোকিছু জানার পর আমরা নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে রাখতে পারবো না। এজন্য চাই দূষণমুক্ত ও নির্মল বায়ু। নির্দিধায় বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার নিশ্চয়তা। আমাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার স্বার্থে, শিশুদের সুস্থভাবে গড়ে ওঠার স্বার্থে চাই দূষণমুক্ত বায়ু। বায়ুর গুণগতমানের দিক দিয়ে রাজধানী ঢাকার অবস্থান পৃথিবীর অন্যান্য দূষিত শহরগুলোর মধ্যে প্রথম দিকে। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে। এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে তা দেশের জন্য শুভ নয়। পৃথিবীর অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় বায়ুদূষণে আক্রান্ত শহরগুলোর মধ্যে চীনের রাজধানী বেজিং ও ভারতের রাজধানী দিল্লী অন্যতম। বছর দুই আগে বেজিং শহরের মানুষ জীবন বাঁচাতে পানির বোতলের মতো বোতলে অক্সিজেন কিনতে হয়। কিন্তু বর্তমানে এ অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বায়ুদূষণের উৎসগুলোকে নিয়ন্ত্রণ, দূষণকারী শিল্প কারখানা অন্যত্র সরিয়ে নেয়া এবং দূষণমুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণের মতো দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করায় এর সুফল পেতে শুরু করেছে বেজিংবাসী। ভারতের রাজধানী দিল্লীতেও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে উচ্চমাত্রার বায়ুদূষণের দিনগুলোতে ম্যাগা প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধসহ স্কুলের ক্লাস বন্ধের মতো

পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকার ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়া মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা পালন করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

#### সমাধান কোথায়ঃ

একঃ বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সবাইকে একজোট হতে হবে। দূষণকারী শিল্প কারখানা, ইটভাটা, যানবাহন, সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ, ভূক্তভুগিসহ নগরবাসীকে ‘দূষণমুক্ত ঢাকা’ বা ‘বায়ুদূষণমুক্ত ঢাকা’ নামে একটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে হবে। ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন-কে এই প্ল্যাটফর্মটি পরিচালনার মূল দায়িত্ব পালন করতে হবে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর নেতৃত্ব প্রদান করতে পারেন। পরিচ্ছন্ন ঢাকা’র মতো একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী কর্মসূচির মতো সকল পক্ষকে বা অংশিজনদের উপস্থিতিতে ঢাকা দক্ষিণের মেয়র মহোদয়ের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা আহ্বান করা যেতে পারে। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধে সাফল্য পেতে হলে সকলকে ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করে একজোট হতে হবে। কার কি ভূমিকা হবে, তা নির্ধারণ করতে হবে। বাস্তবায়নযোগ্য, সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে সেক্টরভিত্তিক কমিটি বা ফোকাস গ্রুপ গঠন করতে হবে।

দুইঃ দেশের অধিকাংশ মানুষ জানে না বায়ুদূষণ কি, কিভাবে সৃষ্টি হয়; বায়ু দূষক (Air Pollutant) কি কি ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য এরা কি ক্ষতি করে, তা মানুষকে জানানো জরুরি। মানুষ সচেতন হলে নিজেই নিজের ও অন্যদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এগিয়ে আসবে। তাই এই বিষয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করতে জনসচেতনতামূলক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করতে হবে।

তিনঃ যে সব শিল্প কারখানা, প্রকল্প ইত্যাদির সংশ্লিষ্ট সকল প্রশাসনিক ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে না তাদের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে দূষণকারী শিল্প কারখানার কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে। সরকার ঘোষিত শিল্প এলাকায় ঢাকার দূষণকারী শিল্প কারখানা স্থানান্তর করা যেতে পারে। ঝউএ’র লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বিষয়টি করা যেতে পারে।

চারঃ দূষণকারীকে স্ব স্ব দূষণের দায় বহন করতে হবে। এই মূলমন্ত্রের ভিত্তিতে অন্যান্য দেশের ন্যায় সকল সেক্টরকে অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুত ঈষবদ্ধ অর্থাৎ চূড়ান্ত করতে হবে। এছাড়া, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখবে এমন আইন, বিধিমালা ও এসআরও গুলোর খসড়া দ্রুততম সময়ে সকল সরকারি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে অনুমোদন করা আবশ্যিক। এর পাশাপাশি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ইলেকট্রনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, লেড এসিড ব্যাটারীর পুনপ্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম পরিবেশবান্ধবকরণ সংক্রান্ত সংশোধিত এসআরওটি দ্রুত সময়ের মধ্যে সকল সরকারি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে গণবিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করার দাবী রাখে।

পাঁচঃ বাংলাদেশে কোন কোন উৎস থেকে বায়ুদূষণ হচ্ছে এবং কার অবদান কতখানি তা দেখার চেষ্টা করা হয় ২০১৩ সালে। ক্লিন এয়ার এন্ড সাসটেইনেবল এনভাইরনমেন্ট (CASE) প্রকল্পের আওতায় Norwegian Institute for Air Research (NILU) এর মাধ্যমে উক্ত সমীক্ষাটি করা হয়। এতে দেখা যায় যে, ইটভাটার অবদান সবচেয়ে বেশী ৫৮%। এরপর যান্ত্রিক যানবাহন ১০.৪০%, প্রাণি ও উদ্ভিদ থেকে জ্বালানী (Decompose) রাস্তার ধুলা ৭.৭০%, সীসার অবদান ৭.৩৭%, জিংকসহ সামুদ্রিক লবনের অবদান বাকী ৮.৯%। এই মূল্যায়নের পক্ষে/বিপক্ষে অনেক যুক্তি তর্ক থাকতে পারে, তবে মূল্যায়নে প্রধান দূষক (Pollutant) এবং তার অবদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। বর্তমানে অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির ফলে কোন কোন দূষকের অবদান বৃদ্ধি পেতে পারে এবং নতুন দূষকের আবির্ভাব ঘটতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পরমাণু শক্তি কেন্দ্র এবং যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথভাবে পরিচালিত সাম্প্রতিক গবেষণায় এমন তথ্যই উঠে এসেছে।

এসব চিহ্নিত দূষণের বিরুদ্ধে এখন কাজ করতে হবে একজোট হয়ে। দূষণকারী সেক্টর/কারখানাসমূহকে নিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব এদের সঙ্গে পরিবেশ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আলোচনা প্রয়োজন। সর্বসম্মত অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে একটি পথনক্স Roadmap তৈরি করে কোমর বেঁধে কাজে নামতে হবে।

ছয়ঃ ঢাকার চারপাশের ইটভাটা ঢাকার বায়ুদূষণের জন্য প্রধানত দায়ী। জনসাধারণ, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর একজোট হয়ে কাজ করতে হবে। ইটভাটা থেকে সরকার নির্ধারিত ফি বা ভ্যাট ছাড়া অন্য কোনো অর্থ গ্রহণের স্বার্থের দ্বন্দ্ব হতে বিরত থাকতে হবে, যাতে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে দ্বিধাদন্দ না থাকে। এক জায়গায় অনেক ইটভাটা গড়ে উঠেছে। এখানে ইটভাটার সংখ্যা হ্রাস করতে হবে। আমাদের যে করেই হোক ইটভাটা থেকে বায়ুদূষণ বন্ধ করতে হবে। মাটি জড়িয়ে সনাতন পদ্ধতিতে ইট তৈরী ও ব্যবহারের দিন যত দ্রুত শেষ করা যায় দেশের জন্য তত মঙ্গল। কেননা, একদিকে চাষের জমির পরিমাণ যেমন কমে আসছে। অন্যদিকে, উর্বর অংশের মাটি ইট তৈরীতে ব্যবহৃত হওয়ায় প্রতিবার বিপুল পরিমাণ জমি উর্বরতা হারাচ্ছে। এর থেকে বেরিয়ে আসতে বিকল্প ইটের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। খননকৃত মাটি দিয়ে পরিবেশবান্ধব কেমিক্যাল জাপানে ইকো ৫০০০ ব্যবহার ইট তৈরির বিষয়টি বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং, রিসার্চ ইনস্টিটিউট পরীক্ষাধীন চলছে। এটি বাংলাদেশের জন্য উপযুক্ত প্রমাণিত হলে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করতে দেশীয় ইটভাটা থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণ দ্রুত হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়।



**সাতঃ** ইঞ্জিন চালিত যানবাহন বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ। সরকার ইতোপূর্বে পেট্রোল ও অকটেনে সিসার ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। ডিজলে ও পর্যায়ক্রমে সালফারের মাত্রা ২৫০০ পিপিএম (পার্টস পার মিলিয়ন) থেকে ৫০ পিপিএম-এর হ্রাসের জন্য সরকার পথনঞ্চ বা রোডম্যাপ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। বিএসটিআই ২৫০০ পিপিএম এর জায়গায় ৫০০ পিপিএম সালফারযুক্ত ডিজেলের মানমাত্রা নির্ধারণ করেছে ও সে অনুসারে আমদানি ও বাজারজাত করা হচ্ছে। উক্ত পথনঞ্চ অনুসারে দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জ্বালানী তেল শোধনাগার ইষ্টার্ন রিফাইনারিকে ৫০ পিপিএম বা আরও কম মাত্রার সালফারযুক্ত ডিজেল পরিশোধনের লক্ষ্যে ২য় ইউনিট স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটি চালু হলে অত্যন্ত কম সালফারযুক্ত ডিজেলের প্রাপ্ততা নিশ্চিত হবে। ফলে ডিজেলচালিত যানবাহন ও ইঞ্জিন থেকে সৃষ্ট সালফারের দূষণ অনেকাংশে হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়।

পরিচ্ছন্ন জ্বালানীর পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন যানবাহন থেকে বায়ু দূষণ দ্রুত কমিয়ে আনতে পারে। এ জন্য গাড়ির নিঃসরণ মানমাত্রা বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭-তে বাংলাদেশ-২ মানমাত্রায় রয়েছে, যা প্রতিবেশ দেশ ভারতে Euro-V বা ভারত-৫ এ উন্নীত করা হয়েছে। কম নিঃসরণ মাত্রার যানবাহনের ব্যবহার করার লক্ষ্যে যত শীঘ্র সম্ভব গাড়ির নিঃসরণ মানমাত্রা বাংলাদেশ -৫ বা ৬ (Euro-V/ VII)-এ উন্নীত করা এখন ময়ের দাবি। এছাড়া Clean Vehicle-এর জন্য একটি আলাদা পথনঞ্চ প্রণয়ন করাও জরুরি।

**আটঃ** যানজট বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ। সমর্থ্য থাকুক বা না থাকুক, সবাই, ব্যক্তিগত ছোটগাড়ি ব্যবহার করতে চাই। এতে ব্যক্তিগত ছোট গাড়ির সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। রাজধানী ঢাকার ৬-৭% রাস্তা দখল করে নিয়েছে ব্যক্তিগত গাড়ি। পাশাপাশি ধীরগতির গাড়ি রয়েছে। ঢাকায় কয়েকটি ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হলেও নানাবিধ ত্রুটির কারণে কোনো কোনো স্থানে যানজট সৃষ্টি হয়েছে। এখন ঢাকায় নির্মিত হচ্ছে মেট্রোরেল Mass Rapid Transit (MRT) ইত্যাদি। এগুলো নির্মাণ সম্পন্ন হলে ঢাকার যানজট অনেকটাই কমে আসবে। যানজট নিরসনের ক্ষেত্রে বোগোডার এক প্রেসিডেন্টের উদাহরণ দেওয়া হয়। তিনি বোগোডায় গাড়ি বন্ধ করে নদীপথে যাতায়ত বাধ্যতামূলক করেছিলেন। ঢাকার ক্ষেত্রেও এটি হয়তো পুরোপুরি করা যাবে না। তবে ঢাকার অভ্যন্তরে খালগুলো ও চালপাশের নদীগুলোকে দখল ও দূষণমুক্ত করে নৌযান চলাচলের ব্যবস্থা করা গেলে রাস্তায় গাড়ির চাপ অনেকটাই কমবে। গণপরিবহনকে সংগঠিত করতে হবে। স্কুলের জন্য আলাদা পরিবহন বায়ুদূষণ পুনঃপ্রবর্তন, সাইকেলের মতো অযান্ত্রিক যানবাহনের জন্য আলাদা লেনের ব্যবহার করা যেতে পারে। এলাকাভিত্তিক অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা কর্মস্থলে উপস্থিত ও প্রস্থানের সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে। সভায় যোগদানের ফলে যানজটের সৃষ্টির বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে অফিসে বসেই সভাগুলো অনায়াসেই সম্পন্ন করা যেতে পারে, যা উন্নত বিশেষ করা হচ্ছে।

**নয়ঃ** দেশে বায়ুদূষণ মনিটরিং ব্যবস্থা পুনঃ বিন্যাস করা প্রয়োজন। যে সব স্থানে বায়ুদূষণ হচ্ছে বা যার আশংকা রয়েছে যেখানে সেসরভিত্তিক মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। বিভিন্ন শিল্প এলাকা, অর্থনৈতিক জোন এমনকি শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা আবশ্যিক। এতে উৎসে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

**দশঃ** সাধারণত ধারণা করা হয়, অটো রাইস মিল থেকে বায়ুদূষণ হবার করা নয়। কিন্তু বাস্তবে এসব রাইস মিল বায়ুদূষণ ঘটায়। রাইস মিলগুলোর অপারেটরদের হাতে কলমে জ্বালানীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও বায়ুদূষণ রোধের প্রশিক্ষণ প্রদান করে শেরপুর জেলায় অটোরাইস মিলের একটি গুচ্ছে সুফল লাভ করা সম্ভব হয়েছে। এতে মিল মালিক ও এলাকায় পরিবেশ বায়ুদূষণমুক্ত হয়ে লাভবান হচ্ছে। তাই অটো রাইস মিল এমন জেলাগুলোতে এ ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হলে এসব এলাকায় ব্যাপক সফলতা বয়ে আনবে। চাতাল এর ক্ষেত্রে Improve Perboiling System চালু করা গেলে বাকী রাইস মিলগুলো থেকে বায়ুদূষণ রোধ করা সম্ভব।

**এগারোঃ** এবার ঘরের ভেতরের বায়ুদূষণ বা Indoor Air Pollution কে Toxicity'i বিচারে, বিশ্বব্যাপী গবেষণাকারী সংস্থা Black Smith Institute (বর্তমানে Pure Earth) ২০০৮ সালে পৃথিবীর Top Ten Worst Pollution Problem এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। এর মাধ্যমে ঘরের ভেতরের বায়ুদূষণের বিষাক্ততার বিচারে এর অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশ Indoor Air Pollution নিয়ন্ত্রণে সরকার কাজ করেছে। সরকার গ্রামাঞ্চলে সনাতনী চুলা থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া দূর করার জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের ৩ কোটি পরিবারকে উন্নত চুলা প্রদানের কৌশল প্রণয়ন করেছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ উন্নত চুলা বিতরণ করা হয়েছে। তবে চিন্তার বিষয় এই যে, দেশের Indoor Air Quality gvgvÍv (Standard) না থাকায় Indoor Air Pollution রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। Environment or Occupational Health সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সচেতনতা সৃষ্টি ও Indoor Air Quality Standard প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

পরিশেষে, পৃথিবীতে আজ অবধি যে সব দেশ উন্নতি লাভ করেছে তাদের ইতিহাস বলে তারা দূষণের পথ অতিক্রম করে উন্নত পর্যায়ে উন্নত হয়েছে। পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে। কিন্তু আমাদের মতো একটি সীমিত সম্পদের দেশে উন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষা করে উন্নয়ন তথা টেকসই নিশ্চিত করতে হবে। অর্থনীতিবিদ Simon Kuznet ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকে আমাদের মতো দেশের জন্য প্রথমে Kuznet hypothesis ও পরে The Environmental Kuznets curve এর ধারণা দেন। এখানে তিনি Environmental Equally এর ওপর জোর দেন।



## দূষণের শোষণে প্রাণ-প্রকৃতি

মুকিত মজুমদার বাবু\*

সবুজে ঢেউ খেলানো বাংলার প্রকৃতি। চারদিকে তাকালেই ফুলের দ্বাণে আবেশ করে মন। গাছের ডালে ডালে পাখ-পাখালির কুজন। ফুলে ফুলে মৌমাছির গুঞ্জন। বহুতা নদীর কলতান। সোনালি স্বপ্ন আঁকা অব্যবহিত ফসলি মাঠ। নদীর বুকে পাল তুলে মাঝির হেঁইয়ো... হেঁইয়ো... গান। লতাগুলোর প্রণয়ে উচ্ছ্বসিত প্রকৃতিতে প্রাণের স্পন্দন। প্রকৃতির নিষ্কলিত মানুষকে নির্মল করে, মুগ্ধ করে, এগিয়ে চলার স্বপ্ন দেখায়। আমাদের স্বপ্ন আজ অনেকটা বিমর্ষ, বিবর্ণ। সোনার বাংলা, রূপসী বাংলা এখন দূষণের শোষণে। নদীর জলে বিষ। শহরগুলোতে কান ঝালাপালা উৎকট শব্দে। একই সঙ্গে বায়ুদূষণও বিপর্যস্ত করে তুলছে জনজীবন। শহরের চারপাশের ইটভাটার কালো ধোঁয়া পেন্সিলরঙা মেঘ সৃষ্টি করেছে আকাশে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে মাত্রাতিরিক্ত ধূলিকণা, যার প্রকট রূপ দেখা যায় রাজধানীতে। নাকচেপে, মাস্ক পরে, গাড়ির জানালা বন্ধ করে ধুলার অত্যাচার থেকে বাঁচার বৃথা চেষ্টায় ব্যস্ত এখন শহরবাসী। ‘দূষিত বায়ুর নগরী’র তকমা জুটেছে রাজধানী ঢাকার কপালে।

১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে ‘দ্য গ্রেট স্মগ’ নামের এক বিরাট বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল লন্ডন। ‘ভয়ঙ্কর ধোঁয়াশা’ খ্যাত ওই বাতাসে ছিল বিভিন্ন রকম দূষিত কণা। ছিল সালফার ডাই অক্সাইড গ্যাস, আলকাতরার মতো কালো ধোঁয়া এবং খুব উচ্চ ঘনত্বের সালফিউরিক এসিডের মারাত্মক মিশ্রণ। কয়লার অত্যধিক ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ভয়ঙ্কর ওই বায়ু দূষণের শিকার হয়ে মারা গিয়েছিল সহস্রাধিক মানুষ! ধোঁয়া আর কুয়াশার সংমিশ্রণে তৈরি সেই ধোঁয়াশার মেঘ কাটতে সময় লেগেছিল ৬৫ বছর। ধুলোয় ধূসর ঢাকাও আজ দূষিত শহরের তালিকায়। দেশেরও নাম উঠে এসেছে দূষিত বায়ুর দেশ হিসেবে। লন্ডনের ওই পরিবেশ বিপর্যয়কেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি। প্রশ্ন জাগছে, বাংলাদেশও কী ওই ধরনের কোনো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে?

বিশ্বজুড়ে দূষণের কারণে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বাড়ছে। আবহাওয়ায় ঘটছে বড় ধরনের পরিবর্তন, যার প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে বাংলাদেশেও। অনিয়মিত ঋতু পরিবর্তন, অসময়ে শিলা বৃষ্টিতে গ্রাম ছেয়ে যাওয়ার মত সাম্প্রতিক ঘটনা জনমনকে করে তুলেছে আতঙ্কিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা থেকে জানা যায়, ধূমপান, সড়ক দুর্ঘটনা এবং ডায়াবেটিস—এই তিনটি রোগে প্রতিবছর যত মানুষ মারা যাচ্ছে, বায়ুদূষণের কারণে মারা যাচ্ছে তার চেয়ে বেশি মানুষ! বায়ু দূষণের কারণে বিশ্ব প্রতি বছর ৫৫ লাখের বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে। আর বাংলাদেশে প্রতি বছর মারা যাচ্ছে ৮০ হাজার মানুষ।

দেশের মানুষকে প্রতিদিন নানান ধরনের দূষণের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বায়ুদূষণ। বিষাক্ত বাতাস ফুসফুসে ঢুকে প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মানুষ। আসলে ‘নীরব ঘাতক’ হয়ে বায়ুদূষণ আমাদের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। ঘাতকরূপী বায়ু দূষণের উৎস এক নয়; একাধিক। প্রধান উৎস— মহানগরীর আশপাশের ইটভাটা। দূষণের ষাট ভাগই হচ্ছে এসব ভাটার ধোঁয়া থেকে। বাকি দূষণ হচ্ছে রাস্তাঘাটের ধূলা, মোটর গাড়ি ও কারখানা থেকে।

বায়ুদূষণ বৃদ্ধিতে নির্মাণ শিল্পের আধিক্যও কোনো অংশে কম নয়। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে এর প্রভাব রীতিমত ভয়াবহ। বর্তমানে রাজধানীতেই সিসা-দূষণের শিকার ছয় লাখ মানুষ। ঢাকার পরই নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সবচেয়ে বেশি দূষণের শিকার। শীতকালে এ অবস্থা আরো তীব্র আকার ধারণ করে। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি-মার্চ শুকনো মৌসুম। এ সময় বৃষ্টি কম হয়। একনাগাড়ে চলে নানা ধরনের নির্মাণ কাজ। ভাটায় চলে ইট পোড়ানো। সড়ক ও ভবন নির্মাণও চলে পাল্লা দিয়ে। এসবক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় দেখা যায় আইন লঙ্ঘন করার হিড়িক। শুকনো মৌসুমে যে নির্মাণকাজ হয় তাতে সকাল-বিকেল দু’বেলা নির্মাণসামগ্রী জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখার নিয়ম। বিশেষ করে বালু ও ইট। কিন্তু রাজধানীর বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান তাদের নির্মাণসামগ্রী যত্রতত্র ফেলে রাখে। যে কারণে সৃষ্টি হয় ধুলার। মৌসুমী বাতাসে উড়তে থাকা সূক্ষ্ম ধূলা নিঃশ্বাসের সঙ্গে সরাসরি চলে যায় ফুসফুসে। আবার অনেক সিমেন্ট কোম্পানির তৈরি সস্তা সিমেন্টে থাকে ফ্লাইং অ্যাশ, যা অত্যন্ত হালকা এবং সহজে বাতাসে মিশে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রবেশ করে শরীরে।

বর্জ্য, ধোঁয়া, অ্যারোসল ও ফোম জাতীয় পদার্থ, বডি স্প্রে, কালার স্প্রে, জৈব জ্বালানির অত্যধিক ব্যবহারও বায়ুদূষণের অন্যতম নিয়ামক। এছাড়া ঢাকার বাতাস দূষিত করতে দায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ গাড়ি এবং এর ত্রুটিপূর্ণ ইঞ্জিন। সমস্যাগ্রস্ত ইঞ্জিন সম্পূর্ণভাবে গ্যাস পোড়াতে পারে না। ফলে তৈরি হয় বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড। এর সঙ্গে সালফার ও সিসায়ুক্ত পেট্রোল ব্যবহার এবং ভেজাল জ্বালানি তেলের ব্যবহার দূষণের মাত্রায় যোগ করে আরো এক ধাপ। সৃষ্টি করে কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফারডাই অক্সাইড ও সিসার মতো বিভিন্ন বিষাক্ত বস্তুকণা। এসব কণা সাধারণত ভারী হয় এবং বাতাস দূষিত করে।

\*চেয়ারম্যান, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন

বায়ু দূষণের কারণে মানুষের স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, ক্যান্সারসহ বিভিন্ন জটিল ও কঠিন রোগ দেখা দেয়। তবে বেশি ক্ষতির শিকার হয় শিশুরা। এনভায়রনমেন্টাল চ্যারিটি গ্লোবাল অ্যাকশন প্ল্যানের গবেষণা বলছে, ব্যস্ত রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় বড়দের তুলনায় ৩০ ভাগ বেশি বিষাক্ত বায়ু গ্রহণ করে শিশুরা। তাদের দাবি, বাতাসের সবচেয়ে নিচের স্তরে মাটির কাছাকাছি থাকে বিষাক্ত ধোঁয়াশা। আর উচ্চতায় কম হওয়ায় শিশুরাই এ বিষাক্ত ধোঁয়াশা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেশি গ্রহণ করে। তাই, বায়ুদূষণের কারণে স্নায়বিক ক্ষতিসহ সবচেয়ে বেশি স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকে শিশুরা। ঝুঁকিতে থাকে গর্ভবতী মা ও তার গর্ভস্থ শিশু।

প্রকৃতির সঙ্গে জীবন ও তথ্রোতভাবে জড়িত। তাই প্রকৃতি দূষণের শিকার হলে জীবনও যে বিপন্ন হবে এটাই স্বাভাবিক। এখন প্রশ্ন হলো, কিভাবে বায়ুদূষণ রোধ করা যায়? বায়ুদূষণ রোধে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাষ্ট্রের। সুশাসন, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, কর্ম পরিকল্পনা, উদ্যোগ এবং আইন প্রয়োগের মত বড় বড় দায়িত্ব কিন্তু সরকারের। এর মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা হিসেবে সরকার রাজধানীর বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস কিংবা মূল শিল্প-কারখানা রাজধানীকেন্দ্রিক না হয়ে দেশজুড়ে হতে পারে। এতে ঢাকার ওপর চাপ অনেকাংশে কমে যাবে। বায়ুর পরিশুদ্ধতার পাশাপাশি দেশজুড়ে আর্থসামাজিক অবস্থারও উন্নয়ন ঘটবে। এছাড়াও সরকার সড়ক ও ভবন নির্মাণের সময় নির্মাতা ও ঠিকাদারদের ওপর কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করতে পারে, যাতে তারা আইন-কানুন মেনে চলে। স্টিল, রি-রোলিং মিলস ও সিমেন্ট কারখানাগুলোকে আদেশ দিতে পারে বস্তুকণা নিয়ন্ত্রণমূলক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে। ইটভাটায় পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি ব্যবহার ও সঠিক উচ্চতা মেনে চিমনি তৈরিতেও উদ্যোগী করতে পারে কারখানাগুলোকে। শুধু তাই নয়, রাস্তা পরিষ্কারে উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়াতে পারে দুই সিটি কর্পোরেশন। তাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং রাস্তায় সনাতন পদ্ধতিতে ধূলা পরিষ্কারের পদ্ধতি অনেকাংশে দূষণ বাড়ায়। তাই প্রয়োজনে বিদেশ থেকে উন্নত যন্ত্রপাতি আমদানি করা যেতে পারে। রাস্তার পাশে আইল্যান্ডে বাড়ানো যেতে পারে দূষণ শোষণ করে এমন প্রজাতির গাছের সংখ্যা। তবে সরকার জরুরি পদক্ষেপ নিতে পারে গণপরিবহনের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে। সাস্রয়ী ও উন্নত গণপরিবহন রাস্তায় নামালে লোকজন চড়তে বেশি উৎসাহিত হবে। এতে ব্যক্তিগত গাড়ি কমে গণপরিবহনের সংখ্যা বাড়বে। মাথাপিছু গাড়ির সংখ্যা কমলে কার্বন নির্গমনও অনেকাংশে কমে আসবে। এছাড়া ট্রাফিক আইন মেনে চললে যানজট কমবে এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সরকারের বৃহত্তর এবং সমাজের সমষ্টিগত পদক্ষেপের সঙ্গে তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা জরুরি। যেখানে সেখানে গৃহস্থালী বর্জ্য না ফেলা, গাড়ির ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ করা, কয়লার ব্যবহার কমিয়ে আনা, গ্রামে জৈব জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে পরিবেশবান্ধব চুলা ব্যবহারে উদ্যোগী হওয়া ইত্যাদি ছোট ছোট কাজ করে ব্যক্তিগতভাবে পরিবেশ রক্ষায় বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। বসতিভিটার আশপাশে কিংবা ছাদে প্রত্যেকে দুটি করে গাছ লাগানোর অভ্যাসও বায়ুদূষণ কমাতে পারে। পলিথিনকে না এবং পাটশিল্পকে হ্যাঁ বলতে হবে। কেননা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সময় পলিথিন পোড়ালে অনেক ক্ষতিকর রাসায়নিক বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এটির ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক শীতলতার সমাধানেও আসা যেতে পারে। এ তো গেল ব্যক্তিগত পদক্ষেপ। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমেও বায়ু দূষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। বায়ুদূষণ বৃদ্ধি করছে এমনসব উৎসকে সম্মিলিত উদ্যোগে বন্ধ করতে হবে। কোথাও কোনো অনিয়ম চোখে পড়লে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। ঠিকাদাররা আইন না মেনে যত্রতত্র নির্মাণ সামগ্রী ফেলে রাখলে কিংবা চলতি পথে স্থাপনা নির্মাণে অনিয়ম দেখলে তা কর্তৃপক্ষকে অবগত করতে হবে। দূষণরোধে পরিবেশবান্ধব গাছ রোপণ করতে হবে। নির্বিচারে গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে এবং বৃক্ষরোপণকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। অবশ্য এতদিন ধরে চলে আসা দূষণ হঠাৎ করে বন্ধ করা যাবে না। এর জন্য সময়ের প্রয়োজন। তবে মনে রাখতে হবে ইচ্ছে থাকলে অবশ্যই উপায় হয়। তাই পরিবেশ ও জীবন সুন্দর রাখতে, আগামী প্রজন্মকে বাসযোগ্য পৃথিবী দিতে অবশ্যই আমাদের দূষণ রোধে সোচ্চার হতে হবে।

## টেকসই কৃষির জন্য চাই সুরক্ষিত পরিবেশ

শাইখ সিরাজ\*

সারা বিশ্বকেই এখন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। বিশেষ করে সমুদ্রনিকটবর্তী দেশসমূহ এর প্রভাব টের পাচ্ছে বেশ ভালো ভাবেই। কাজের প্রয়োজনেই আমাকে ছুটে যেতে হয় দেশের নানা প্রান্তের কৃষকের কাছে। আমি মনে করি কৃষকই সবচেয়ে বেশি প্রকৃতিমগ্ন। পেশাগত কারণেই প্রকৃতির নানা অনুসঙ্গ যেমন রোদ-বৃষ্টি-ঝড় সম্পর্কে সম্যক ধারণা তাকে রাখতেই হয়। যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় পরিবেশ ও আবহাওয়া সম্পর্কে এক ধরনের জানাবোঝা কৃষকের রয়েছে। আকাশ দেখলেই সে বলে দিতে পারে ঠিক কতক্ষণ পরে বৃষ্টি হবে। বাতাসে কান পাতলেই সে বুঝতে পারে এবারের বর্ষায় বৃষ্টি কতটুকু হবে। পুরোপুরি না মিললেও এই হিসেব নিকেশগুলো কৃষককে কৃষিকাজে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সহযোগিতা করেছে দিনের পর দিন। কিন্তু জলবায়ুর পরিবর্তনের এই সময়ে এসে সব হিসেব নিকেশ পাণ্টে গেছে। অসময়ের বৃষ্টি কিংবা রোদ বদলে দিয়েছে কৃষকের এতো বছরের প্রকৃতির পাঠ। সুতরাং কৃষককেই মুখোমুখি হতে হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের এবং এতে কৃষিই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি।

সব কৃষকের কাছেই আমার প্রশ্ন থাকে, আচ্ছা, রোদ-বৃষ্টির হিসাব কি ঠিক আছে? চারা কি সময় মতো গজায়? কৃষকরা জানান, না, রোদ-বৃষ্টির চিরকালিন যে নিয়ম তা আর আগের মতো নেই। বীজ থেকে চারাও ঠিক আগের সময়ে গজাচ্ছে না। হিসেবগুলো সূক্ষ্ম হলেও প্রভাবটা অনেক বড়। ২০১৭ সালের হাওরের অকাল বন্যার কথা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। বেসরকারি সংগঠন পরিবেশ ও হাওর উন্নয়ন সংস্থার মাঠপর্যায়ের জরিপে মতে, অকাল বন্যা সে বছর হাওরাঞ্চলের সাত জেলায় গড়ে ৭৫ ভাগ ফসল তলিয়ে যায়। এতে ২২ লাখ টন ধান হারিয়েছেন হাওরের কৃষক। ১১ লাখ ৩৪ হাজার ৬০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রায় দুই হাজার টন মাছ এবং ৩০ হাজার হাঁস মারা গেছে। প্রায় এক হাজার টন সবজি নষ্ট হয়েছে। সব মিলিয়ে অর্থের হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা। সে সময় আমি হাওর অঞ্চল ঘুরে দেখেছি, কথা বলেছি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সঙ্গে। আর মাত্র সাতদিন পর ঢলটা আসলে এই ১৩ হাজার কোটি টাকা লোকসান হতো না। সরকারের দুর্যোগ পরবর্তী শক্তিশালী ব্যবস্থাপনার কারণে ওই অঞ্চলের কৃষকরা অনেকটা ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছে। তা না হলে বড় ধরনের একটা বিপর্যয় ঘটে যেতো। শুধু হাওর অঞ্চলের কৃষকরাই নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদসী-মায় আমাদের সকল কৃষক ও কৃষি। তাই এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে এখন থেকেই। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে পর্তুগালের হুবেল কোম্পানির কথা। বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনকে বড় একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে তারা। আর তাই তারা এখনই ভাবছেন ২০ বছর পরের কৃষি নিয়ে। এ নিয়ে চলছে তাদের নানামুখী গবেষণাও। তারা মনে করছে পর্তুগালের আগামীর কৃষির মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে সেচব্যবস্থা। সেচের পানি ভয়াবহরকম কমে আসছে। তাই তারা লবণাক্ত পানিসহিষ্ণু জাত তৈরির বিষয়ে গবেষণা করছে-বেশ সাফল্যও পেয়েছেন। কিছু জাত তারা উন্নত করেছেন, যেগুলোয় সেচ হিসেবে সমুদ্রের পানি দেওয়া যায়। ভবিষ্যতে টেকনোলজিই হবে কৃষির প্রাণ। টেকনোলজিতে যে যত উন্নত হবে তার আয়ত্বেই থাকবে কৃষি তথা খাদ্য নিরাপত্তা। তাই পরিবর্তিত জলবায়ুতে বিশ্বের সঙ্গে টিকে থাকতে টেকনোলজিতেও উন্নত হতে হবে আমাদের।

একদিকে যেমন অসময়ে বৃষ্টি কৃষির ক্ষতি করছে, অপরদিকে বৃষ্টি না হওয়ায় খরায় উর্বরতা হারাচ্ছে অনেক অঞ্চলের মাটি। বিশেষ করে আমাদের উত্তরাঞ্চলে এই সমস্যা প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা শুধু আমাদের দেশেই নয়, অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে সারা বিশ্বকেই এর মুখোমুখি হতে হচ্ছে। উন্নত বিশ্ব এখন থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছে পরিবর্তিত জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। আমাদেরও ভাবতে হবে, প্রস্তুতি নিতে হবে ভবিষ্যতকে মাথায় রেখে।

২০১২ ও ২০১৪ সালে সমুদ্র সীমা জয়ের পর ব্লু-ইকোনমির একটা বড় সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয় আমাদের জন্য। মনে আছে ২০০৫ সালে আমি ‘হৃদয়ে মাটি ও মানুষ’-এর প্রোগ্রাম ধারণ করার জন্য জাপানে যাই। সেখানে টোকিও সাগরের দীর্ঘ বালুতটজুড়ে সামুদ্রিক শৈবালের চাষ হতে দেখেছি। জাপানের রেন্তোরায় অনেক খাবারেই শৈবালের উপস্থিতি পেয়েছি। ইতিহাস বলে, ১৬৭০ সালে টোকিও সমুদ্রে সর্বপ্রথম শৈবাল চাষ শুরু হয় এবং ১৯৪০ সালে তা বাণিজ্যিক রূপ নেয়। তারপর জাপান, চীন, কোরিয়া, ফিলিপিনসহ বিভিন্ন দেশে শৈবাল হয়ে ওঠে এক অনন্য অর্থকরী সবজি। নানারকম পুষ্টি উপাদান, ভিটামিন, খনিজ ও আয়োডিনের বিশাল আধার এই সামুদ্রিক শৈবাল। জাপান প্রতি বছর ২ বিলিয়ন ডলারের শৈবাল উৎপাদন করে। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসাবে সারা বিশ্বে ২৫ হাজার মেট্রিক টন শৈবাল উৎপাদন হয়-যার বাণিজ্যিক মূল্য ৬.৫ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের উপকূলীয় তটরেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭১০ কিলোমিটার। ১৯টি জেলার ১৪৭টি উপজেলায় মোট ২৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকায় শৈবাল চাষ হতে পারে কৃষি তথা ব্লু ইকোনমির নতুন ধারা। কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে কক্সাজারে শৈবাল চাষের একটি প্রকল্প গত বছর আমি দেখে এসেছি। পরিকল্পিত উপায়ে শৈবাল চাষ করা গেলে সেটি যেমন আমাদের পরিবেশের জন্য ভালো হবে, তেমনি অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় হতে পারে সামুদ্রিক শৈবাল।

\*গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব

ব্রু-ইকোনমির আর একটা বড় অধ্যায় সামুদ্রিক মাছ। কাগজে কলমে আমাদের সামুদ্রিক মাছের প্রজাতির সংখ্যা ৪৭৫ হলেও বাস্তবতা ভিন্ন। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র ২৫০-৩০০টি জাতের অস্তিত্বের কথা বলছে। দিন দিন কমে যাচ্ছে সামুদ্রিক মাছের জাত। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভয়াবহ বিষয় চোখে পড়েছে। গত মার্চে কক্সাজারের বেশ কিছু সামুদ্রিক মাছের বাজার আমি ঘুরে এসেছি। যেখানে সরাসরি সমুদ্র থেকে মাছ ধরে এনে জেলেরা বিক্রি করে। দেখলাম জেলেরদের হাত থেকে একেবারে ছোট থেকে শুরু করে মাঝারি বা বড় কোন মাছই রক্ষা পাচ্ছে না। জাল এমনভাবে তৈরি করা যাতে ছোট মাছগুলোও আটকে যাচ্ছে। বড় মাছ মানুষের খাবার হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। ছোট ছোট মাছ যেগুলো সামুদ্রিক ময়লা থেকে পৃথক করা যায় না, সেগুলোও মুরগি ও মাছের খাদ্য হিসেবে প্রক্রিয়াজাত করে ফেলা হচ্ছে। নির্বিচারে সব ধরনের মাছ ধরে ফেলার জন্য দিন দিন সামুদ্রিক মাছের জাত যেমন হারিয়ে যাচ্ছে, তেমনি হুমকির মুখে আছে সামুদ্রিক প্রাণিকূল।

প্রায় ১ লাখ ১৮ হাজার বর্গকিলোমিটারের ‘ব্রু স্পেসে’ শুধু মৎসই নয় খনিজ, জ্বালানি ও ওষুধের উপাদান আহরণ নিয়েও আমাদের তেমন কার্যক্রম নেই। অন্যদিকে ভারত ও মায়ানমার ঠিকই সমুদ্রের সম্পদ আহরণে উঠে-পরে লেগেছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতি ব্রু-ইকোনমি তথা সমুদ্রের অর্থনীতির উপর অনেকাংশই নির্ভরশীল।

বাংলাদেশে পরিবেশের ক্ষতির আরও একটি বড় কারণ আমার মনে হয় নবায়নযোগ্য জ্বালানির কম ব্যবহার। সেই আশির দশক থেকে বায়োগ্যাস, সৌরশক্তি ব্যবহার করে রান্না-বান্নার কাজ করার জন্য কৃষকদের সচেতন করার কাজ করে আসছি। কিন্তু প্রচারের তুলনায় প্রসার খুব একটা হয়নি। ইউরোপের দেশগুলোতে দেখেছি, বিশেষ করে নেদারল্যান্ডস বা জার্মানিতে বেসরকারিভাবে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানও বায়োগ্যাসপ্ল্যান্টের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে শক্তি উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত করছে। সরকারও এইসব ব্যাপারকে বেশ উৎসাহ দিয়ে আসছে। বিশাল আকারে না হোক, ক্ষুদ্র আকারে প্রতিটি কৃষক যদি নিজের পরিবারের রান্নার কাজটা বায়োগ্যাস বা সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে করতে পারে, তাহলে বেঁচে যাবে পরিবেশের অসংখ্য গাছ। বেশি না, ৫ বছরেই পাল্টে যাবে বাংলাদেশের পরিবেশের চিত্র। সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশ সত্যিই সবুজ হয়ে উঠবে।

বলছিলাম কৃষির কথা, কৃষকের কথা। কৃষিকে টিকিয়ে রাখতে হলে পরিবেশের যত্ন নিতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে কৃষকবান্ধব পরিবেশ। না বুঝে কৃষকরাও পরিবেশের ক্ষতি করছেন দেদারসে। অপরিচালিত পুকুর খনন, রাসায়নিক প্রয়োগ এবং যথেষ্ট চাষবাস সাময়িক উৎপাদন বৃদ্ধি করলেও সুদূরপ্রসারি ক্ষতিকর প্রভাব রেখে যাচ্ছে আগামী প্রজন্মের জন্য। এরজন্য মাটিও হারাচ্ছে তার উর্বরতা। তাই কৃষককেও পরিবেশ সংরক্ষণে নিরাপদ কৃষির জন্য সচেতন করে তুলতে হবে। টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রতিটি মানুষকেই তৈরি করে নিতে হবে পরিবেশ সচেতন মানুষ হিসেবে।



## বাংলাদেশের বিরল বন্যপ্রাণী: বাঘের নাম মেঘছাপা

শরীফ খান\*

কালাপাহাড়ের আড়ালে সূর্যটা নেমে যাবার পরে বন-পাহাড়ে সন্ধ্যার অন্ধকার যেন নামতে শুরু করল দ্রুত বেগে। এতক্ষণে বাঁশমহালের পাশের বয়সী বৈলাম গাছটির ডালে উপড় হয়ে শোওয়া নিশাচর প্রাণীটি উঠে বসল। চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, গভীর ঘুমে তলিয়ে ছিল ওটা এতক্ষণ। ঘুমানোর ভঙ্গীটাও খুব সুন্দর! মোটা ডালের উপরে চারখানা পা মেলে দিয়ে আর অনেক লম্বা লেজটা অজগর সাপের মতো ঝুলিয়ে দিয়ে উপড় হয়ে ঘুমাচ্ছিল ওটা। মাত্র ৫ ফুট উপরের বিশাল খোঁড়লে তার ৪টি বাচ্চাও ঘুমাচ্ছিল। ওদেরকে অবশ্য দেখা যাচ্ছিল না।

প্রাণীটি একবার তাকালো উপরের দিকে, হয়ত বুঝে নিল ছানা ৪টি কী অবস্থায় আছে এখন। ঘুমে, না জেগে। তারপর বড়সড় চওড়া পান্না রঙের জিভটা বের করে হাঁফসি কাটল। তারপর ডালের উপরে দাঁড়িয়ে ৪/৫ বার শরীর-মাথা টানটান ও উপর-নিচ করে যেন ডন বৈঠক করে শরীরের আলস্য তাড়ানোর পরে মাথার উপরের খোঁড়লের দিকে তাকিয়ে চাপা শব্দ তুলল গলায়। অমনি বিড়ালের বাচ্চার মতো ৪টি বাচ্চাই ঠেলাঠেলি-গুতোগুতি করে খোঁড়ল থেকে বেরিয়ে কার আগে কে নামবে প্রতিযোগিতায় মেতে নেমে মায়ের কাছে এসেই বাঁপিয়ে পড়ল মায়ের দুধের বাঁটে। মা জানে, ছানারাও জানে, একটু পরেই মা বেয়বে শিকারে, ফিরতে দেরিও হতে পারে, ছানাদের তাই পেটপুরে দুধ পান করা চাই। ছানারা দুধ পান করছে বটে, মা সতর্কভাবে কান ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে চারপাশের শব্দাবলী শুনতে চেষ্টা করছে। অন্ধকারে চোখ জ্বলছে দু-সেলের টর্চের মতো। অবশ্য, এটা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও আছে এদের, নাহলে যে, চোখের আলো দেখেই পালাবে শিকার-প্রাণীরা।

দুধপান শেষ হবার আগেই মা দ্রুতবেগে উঠে দাঁড়িয়েই মোটা ডালখানা বেয়ে রওয়ানা দিল সামনের দিকে। ব্যাপার বুঝে ছানারা মায়ের লেজটা সামনের দুপায়ে আঁকড়ে ধরতেই মা ঘুরে দাঁড়ালো ঝট করে, থাবা চালালো। ছানারা মায়ের শারীরিক ভাষায় স্পষ্ট বুঝে ফেলল, মায়ের কানে এমন কোনো শব্দ এসেছে, যেটা শিকার-প্রাণী হতে পারে! অমনি ছানাগুলো স্থির হয়ে গেল। মা পা টিপে টিপে দ্রুত এগিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছানাদের উপরে ডালের গোড়ায় এসে নেমে গেল গাছ বেয়ে নিঃশব্দে। ছানাদের বয়স মাত্র ৪ মাস। অবাক-কৌতূহলে দেখছে মায়ের গতিবিধি। মা মাটিতে নেমেই বসে গেল, অনেকটা কেন্নোর মতো বুক ঘসে এগিয়ে গিয়ে ও পাশের আরেকটি গাছে চড়ে মাত্র ৭ ফুট ওপরের মোটা ডালখানার উপরে উপড় হয়ে শুয়ে গেল। হ্যাঁ, সুঁড়িপথ পাড়ি দিয়ে বুনা গিড়িপথ ধরে এদিকেই এগিয়ে আসছে ৪/৫টি মায়াহরিণ (Barking Deer)। প্রস্তুত ডালের প্রাণীটি। লম্বা লেজটি এখন আর ঝুলছে না, তাতে হুশিয়ার হয়ে যাবে হরিণগুলো। ডালের তলা পেরিয়ে যখন সতর্কভঙ্গীতে চলে যাচ্ছে হরিণগুলো, তখন দুঃস্বপ্নের মতো একটির ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল প্রাণীটি, চোখের পলকে ঘাড় কামড়ে ধরে মাটিতে পেড়ে ফেলল এমন কৌশলে যে, সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ভেঙ্গে গেল হরিণটির। বাকিগুলো বিদ্যুৎবেগে ডাকতে ডাকতে কোথায় যে হারিয়ে গেল! ওদিকের গাছের ডালের বাচ্চাগুলো এতক্ষণে খুশিতে লাফালাফি-জড়াজড়ি শুরু করল। তারা এতক্ষণ প্রখর দৃষ্টিতে দেখছিল মায়ের শিকার কৌশলের খুঁটিনাটি। একটু বাদে মা অতবড় শিকারটিকে ঘাড় কামড়ে ধরে গাছ বেয়ে উঠে এল কী আশ্চর্য কৌশলে যে! মায়াহরিণের ওজন হয় ১৪-১৬ কিলোগ্রাম পর্যন্ত। এই মায়াহরিণটির বয়স কম, ওজন হবে ৭/৮ কিলোগ্রাম। আর শিকারি এই প্রাণীটির ওজন হয় ১৮-২২ কিলোগ্রাম। শিকার এনে এমন কৌশলে মোটা ডালের উপরে রাখল যে, গাছ থেকে পড়বে না শিকার। ছানাগুলোর কী আনন্দ! মাংস খাওয়ার বয়স তাদের হয়ে গেছে। আজ প্রথম মাংস খাবে।

গভীর টিলা-পাহাড়ী বনের খুব সুন্দর এই শিকারি প্রাণীটির নাম ‘মেঘডম্বর বাঘ’ বা ‘মেঘাবাঘ’ বা ‘মেঘছাপা বাঘ’ বা ‘গেছোবাঘ’ বা ‘লতাবাঘ’ বা ‘লামাচিটা’। ইংরেজি নাম Clouded Leopard। বৈজ্ঞানিক নাম Neofelis nebulosa (নিউফেলিস ন্যাবুলোসা)। লম্বায় লেজ বাদে ৮৫-১০৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। উচ্চতা ৫০-৬০ সেন্টিমিটার। পরিবার Felidae (ফ্যালিডি)। এই পরিবার তথা বিড়াল প্রজাতির যে সব প্রাণী বাংলাদেশে কমবেশি আজো আছে, সেগুলো হল বাঘ (Tiger), চিতাবাঘ, (Leopard), মর্মর বিড়াল (Marbled Cat), মেছোবাঘ বা গোবাঘা অথবা পাতিভাম (Fishing Cat), বনবিড়াল (Jungle Cat), চিতাবিড়াল (Leopard Cat) ও মেঘছাপা বাঘ (Clouded Leopard)।

মেঘছাপা বাঘের শরীরের রঙ অনেকটা শাওনের মেঘের মতোই। পুরো শরীর ও লেজে যেন কোনো দক্ষ চিত্রশিল্পীর তুলির আঁচড়ের সাদা-কালো-বাদামি-মেটে-হলদে ও ছাই রঙের কালির নান্দনিক সৌন্দর্যে ভরপুর, আশ্চর্য কারুকাজ! শরীরে ফুটে আছে চৌকো-অর্ধবৃত্তাকার ও ত্রিভুজাকৃতির নকসও। বুক-পেট সাদাটে-বাদামি। মাথা ও লেজে কালো কালো ছিট বা ফোঁটা বসানো। পুরোটা লেজে পর্যায়ক্রমিক ভাবে চওড়া-কালো বলয় রয়েছে। চোখ হলদে-পান্না রঙের। শরীরের তুলনায় এদের পাগুলো যেমন খাটো, তেমনি মাথাটাও বড়। বাংলাদেশে মেঘছাপা বাঘেরা মহাবিপন্ন এখন, বিরলও। সারা বিশ্বেও এরা সংকটাপন্ন। বর্তমানে এরা খুব অল্প সংখ্যায় টিকে আছে বৃহত্তর সিলেট ও বৃহত্তর চট্টগ্রামের গহীন বন তথা চিরসবুজ বনসহ আমাদের উত্তর সীমান্তের গারো পাহাড় শ্রেণীর বনে।

\*পাখি গবেষক এবং জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৩ বিজয়ী

মেঘছাপা বাঘের মূলখাদ্য নানান রকম পাখি, কাঠবিড়ালী-ইঁদুর-বন্যশূকর-হরিণ-বানর-উল্লুক-হনুমান। সুযোগ পেলে গরুর বাছুর ও ছাগলছানা সহ বুনো খরগোশ। ধনেশ পাখি এদের খুব প্রিয় খাদ্য। এরা গাছ থেকে গাছ হয়ে অন্য গাছে চলতে পারে ক্ষিপ্ৰগতিতে, লক্ষবর্ষও ভালোই জানে, গাছই এদের আবাসস্থল। গাছের খোঁড়লে-কোটরে ছানা দেয়। শজারু (Porcupine) ও বনঝুই (Pangolin) সামনে পড়লে এরা ওদের সাথে মজার খেলায় মাতে। যেমন শজারুরা শরীরের কাঁটা ফুলিয়ে গোলগাল হয়ে যায়। তবুও ধরাপড়ার অভিনয় করে ওদেরকে পেরেশান করে ফেলে। শজারুর কাঁটার আঘাতে বাঘ-চিতাবাঘের পর্যন্ত পা ও মুখে ঘা হয়ে পচন ধরে, মেঘছাপা বাঘতো ওদের তুলনায় কিছুই না। বনঝুই বিপদে পড়লে একেবারে ফুটবলের মতো গোল হয়ে যায়, শক্ত আবরণের জন্য ওদের কচুও করতে পারে না মেঘছাপা বাঘেরা। তবু মজা করার জন্য লাথি দিয়ে দিয়ে ফুটবল খেলে যেন!

নিশাচর-বৃক্ষচারী ও নিভৃতচারী মেঘছাপা বাঘেরা গাছ থেকে নামতে পারে মাথা নিচের দিকে দিয়েও। সেক্ষেত্রে লম্বা লেজটা অনেক সাহায্য করে। নিভৃতচারী, নিশাচর ও বৃক্ষবাসী হওয়ায় প্রকৃতি থেকে এদের ছবি তোলা এক অসম্ভব কাজই বটে। এক সময় ঢাকা চিড়িয়াখানা ও চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানায় ছিল। এখন আছে কক্সবাজারের ডুলাহাজরা সাফারি পার্কে। জীবনে আমি প্রকৃতিতে এদেরকে মাত্র ৫ বার দেখেছি। একবার ২টি ছানাও দেখি। এরা ছানা দেয় শরৎকাল থেকে শীতকালের ভেতরে। ছানারা মায়ের গর্ভে থাকে ৮৭-৯০ দিন। গাছের খোঁড়লে ছানা দেয় ১-৫টি পর্যন্ত। ছানারা স্বাবলম্বী হয় দুই বছর বাদে। তার আগে থেকেই অবশ্য ছানারা মায়ের লেজে লেজে ঘোরে, শিকারের ও আত্মগোপনের ট্রেনিং নেয়।



পূর্ণবয়স্ক মেঘছাপা বাঘ



বসে আছে মেঘছাপা বাঘ



মেঘছাপা বাঘের জিভ



মেঘছাপা বাঘের চামড়া



মেঘছাপা বাঘের ২ বছর বয়সী ছানা



মেঘছাপা বাঘের ১ মাস বয়সী ছানা

ছবি: মুজাহিদুল ইসলাম ও তানভীর খান

## ওজোনস্তর রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় মন্ট্রিল প্রটোকল ও এর কিগালি সংশোধনী

মোঃ জিয়াউল হক\*

### পটভূমি:

১৯২৮ সালে আবিষ্কৃত হ্যালাকার্বনের ব্যবহার রিফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিংসহ নানা ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭০ সালের দিকে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন যে, হ্যালাকার্বন পৃথিবীর স্ট্রাটোস্ফিয়ারে থাকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ওজোনস্তর ক্ষয়ের জন্য দায়ী যা সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মিকে ফিল্টার করে। ১৯৮৫ সালে ব্রিটিশ ও জাপানী বিজ্ঞানীগণ এন্টারটিকায় ওজোন হলের সন্ধান পান এবং এই বছরই ওজোনস্তর রক্ষায় ভিয়েনা কনভেনশন গৃহীত হয়। পরবর্তীতে ওজোনস্তর রক্ষায় ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর যুগান্তকারী মন্ট্রিল প্রটোকল গৃহীত হয়। এই প্রটোকলটি প্রথমে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী ৮টি দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংশোধনী ও এ্যাডজাস্টমেন্ট-এর ইত্যাদির মাধ্যমে মন্ট্রিল প্রটোকল ওজোনস্তর রক্ষায় যুগান্তকারী অবদান রেখে যাচ্ছে। প্রটোকলের আওতায় প্রায় ১০০টির মতো ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৯৮% ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার ও উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

ওজোনস্তর রক্ষায় মন্ট্রিল প্রটোকলের সর্বশেষ কিগালি সংশোধনী গৃহীত হয়। ২০১৬ সালের ১৫ই অক্টোবর রুয়ান্ডার কিগালিতে অনুষ্ঠিত মন্ট্রিল প্রটোকলের ২৮তম পার্টি সভায় এই সংশোধনী গৃহীত হয়। এই সংশোধনীটি জলবায়ু পরিবর্তন রোধে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এতে অধিক বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ক্ষমতাসম্পন্ন হাইড্রোফ্লোরোকার্বন (এইচএফসি) এর ব্যবহার পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সংশোধনী বাস্তবায়িত হলে এই শতাব্দির শেষে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা ০.৫ সে. বৃদ্ধি কমানো সম্ভব হবে।

### মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নে বাংলাদেশ:

বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষর করে এবং পরবর্তীতে ১৯৯৫ সাল হতে পরিবেশ অধিদপ্তর এই প্রটোকলের বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষর করেছে এবং সকল রাষ্ট্র প্রটোকল বাস্তবায়নে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। প্রটোকলের বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী বাংলাদেশ হতে সিএফসি-এর ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে রোধ করা হয়েছে।

২০০৭ সালে মন্ট্রিল প্রটোকল যুগান্তকারী মন্ট্রিল এ্যাডজাস্টমেন্ট গ্রহণ করে। মন্ট্রিল এ্যাডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে এইচসিএফসি-এর ফেজ আউট সিডিউল ১০ বছর এগিয়ে আনা হয়। অর্থাৎ এইচসিএফসি-এর ফেজ আউট সিডিউল ২০৪০ সালের বদলে ২০৩০ করা হয়। এইচএফসি ফেজ আউটের লক্ষ্য বাংলাদেশ এইচসিএফসি ফেজ আউট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (এইচপিএমপি)-এর স্টেজ-১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১৮ সালে ৩০% এইচসিএফসি ফেজ আউট করতে সক্ষম হয় এবং ফোম স্ট্রোর হতে এইচসিএফসি-এর ব্যবহার সম্পূর্ণ ফেজ আউট করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ এইচপিএমপি স্টেজ-২ প্রণয়ন করছে যা মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ডের ৮১-তম নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়। এইচপিএমপি স্টেজ-২ বাস্তবায়িত হলে এয়ারকন্ডিশনার ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর হতে এইচসিএফসি-এর ব্যবহার সম্পূর্ণ রোধ করা সম্ভব হবে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশের লক্ষ্য ৬৭.৫% এইচসিএফসি-এর ব্যবহার রোধ করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ বর্তমানে মন্ট্রিল প্রটোকল বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণরূপে মেনে চলছে।

### মন্ট্রিল প্রটোকল ও এইচএফসি ফেজ ডাউন কল্পে কিগালি সংশোধনী:

প্রায় সকল ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যই অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রিন হাউস গ্যাস হিসেবে চিহ্নিত। মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (সিএফসি)সহ অন্যান্য প্রধান ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার শূণ্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হয়। এতে করে পৃথিবী থেকে প্রায় ১৩৫ মিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সমপরিমাণ গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানো সম্ভবপর হয়েছে।

এইচএফসি হল মনুষ্যসৃষ্ট পদার্থ যা ওজোনস্তরক্ষয়কারী দ্রব্যের বিকল্প হিসেবে আনা হয়। এই এইচএফসিগুলো সাধারণত রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়। গ্রিন হাউস গ্যাস হিসেবে চিহ্নিত এইচএফসি-এর বিকল্প প্রযুক্তির প্রসার বাড়ছে।

\*পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

কিগালি সংশোধনীতে শক্তিশালী গ্রিন হাউস গ্যাস এইচএফসি পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মন্ট্রিল প্রটোকল এবং কিগালি সংশোধনী বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার একটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য; এইচএফসির Global Warming Potential প্রায় ১২০০ পর্যন্ত হয়।

কিগালি সংশোধনী বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য সর্বশেষ প্রচেষ্টা বিবেচনা করা যেতে পারে। কিগালি সংশোধনীতে ১৯ প্রকার এইচএফসি নিয়ন্ত্রণ করার কথা রয়েছে। যেহেতু প্রায় সবরকম এইচএফসি ব্যবহারের বিকল্প এখনো পর্যাপ্ত না থাকায় সংশোধনীতে এইচএফসি শুধুমাত্র হ্রাস করার কথা বলা হয়েছে। সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার কথা বলা হয়নি।

কিগালি সংশোধনী সফলতার সাথে কার্যকর হলে ২০৫০ সালের মধ্যে ৭০ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইডের সমাপরিমাণ এইচএফসি নিঃসরণ এড়ানো সম্ভব হবে। ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী ১০৬ বিলিয়ন এসি অপারেট করবে। এসব এসি যদি শক্তি শাস্যী হয় তবে তা বিদ্যুৎ উৎপাদনে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন হ্রাস করতে সক্ষম হবে।

কিগালি সংশোধনী বাস্তবায়নের ফলে রিফ্রিজারেশন-এয়ারকন্ডিশনিং, ফোম, এ্যারোসল, অগ্নিনির্বাপন, ও দ্রাবক সেক্টরে ব্যাপক প্রভাব পড়বে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আমাদের উচিত হবে কখনই পুরোনো প্রযুক্তি গ্রহণ না করা, যদি কোন আধুনিক বিকল্প প্রযুক্তি থাকে। যেসব যন্ত্রপাতিতে এইচএফসি রয়েছে, সেগুলো যেন কোন অবস্থাতেই লিক করা না হয় যাতে এইচএফসি বায়ুমণ্ডলে নিঃসরিত হতে না পারে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহ মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ড হতে অর্থ সাহায্য নিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারে।

বাংলাদেশে ইতোপূর্বে এইচএফসি ব্যবহার রোধকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। বাংলাদেশের ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ রেফ্রিজারেটর তৈরীতে এইচএফসি ব্যবহার করে। ইতোমধ্যে ইউএস স্টেট গভর্নমেন্টের আর্থিক সহায়তায় ইউএনডিপি-এর মাধ্যমে একটি ডেমনস্ট্রেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এবং মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ডের সহায়তায় রেফ্রিজারেটর উৎপাদনে এইচএফসি ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে রোধ করা সম্ভব হবে।

আশা করা যাচ্ছে, ২০১৯ সাল নাগাদ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ শেষ হবে। এর ফলে রেফ্রিজারেটর উৎপাদনে বছরে প্রায় ০.৩ মিলিয়ন কার্বন ডাই-অক্সাইড সমতুল্য টন নিঃসরণ এড়ানো সম্ভব হবে। এছাড়া কিগালি সংশোধনী করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ কা হয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম ন্যাশনাল কুলিং প্ল্যানের খসড়া প্রণয়নের কাজ। সরকার নীতিগতভাবে কিগালি সংশোধনী অনুস্বাক্ষরের পক্ষে রয়েছে এবং আশা করা যায় সরকার অতিশীঘ্রই অনুমোদন ও অনুস্বাক্ষর করবে।



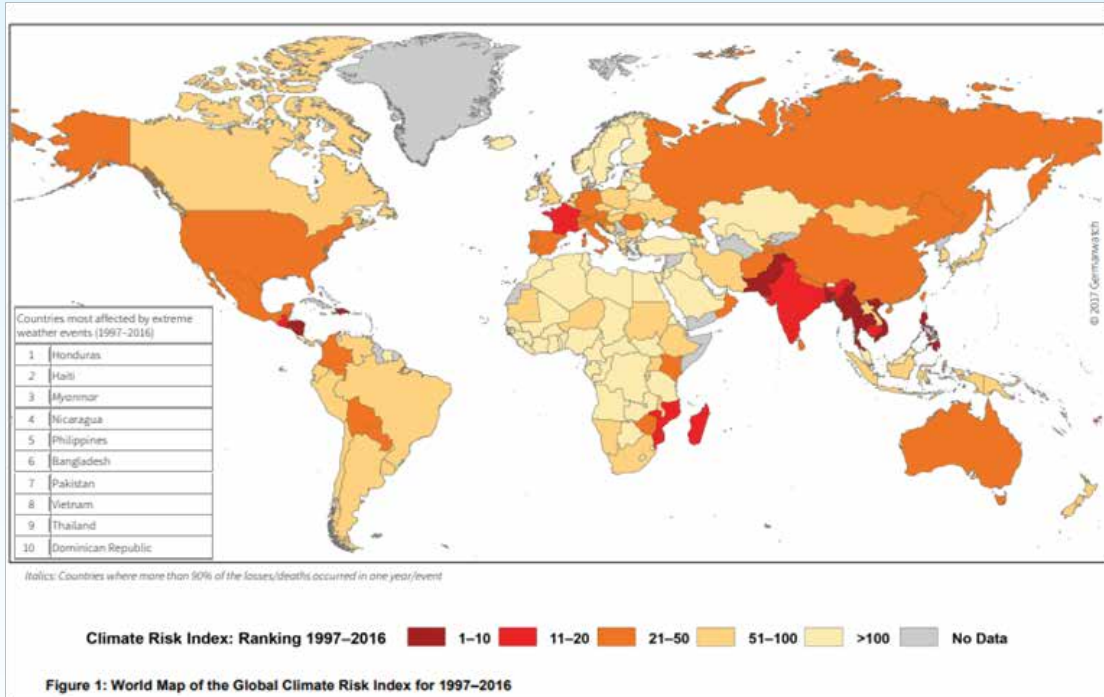
## পরিবেশ অধিদপ্তরের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রম

মির্জা শওকত আলী\*

শাহনাজ রহমান\*\*

দিলরুবা আক্তার\*\*\*

জলবায়ু পরিবর্তন ও এর বিরূপ প্রভাব সারা বিশ্বেই বহুল আলোচিত বিষয়। পৃথিবীব্যাপী গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ বলে ধারণা করা হয়। Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) এর Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5°C above preindustrial levels and related global greenhouse gas emission pathways অনুযায়ী শিল্প বিপ্লব পূর্ববর্তী সময় হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রায় ১.০ ডিগ্রী সেলসিয়াস (০.৮ হতে ১.২ ডিগ্রী) বৃদ্ধি পেয়েছে যা ২০৩০-২০৫২ সাল নাগাদ আরও ০.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস বা শিল্প বিপ্লব পূর্ববর্তী সময় হতে সর্বমোট ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে গত ১৯০১ সাল হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত সময়ে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ১৭ থেকে ২১ সেন্টিমিটার। বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন স্থানে ঘন ঘন সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, খরার আঘাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আভাস দিচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়, জার্মান ওয়াচ কর্তৃক প্রকাশিত 'বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক ২০১৬' অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দীর্ঘমেয়াদী প্রাকৃতিক দুর্যোগের সর্বোচ্চ ঝুঁকি সূচকে ৬ নম্বরে বাংলাদেশের অবস্থান চিহ্নিত হয়েছে (চিত্র ১)।



চিত্র ১: বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক ২০১৬

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং উক্ত মন্ত্রণালয়ের কারিগরি সংস্থাসমূহ নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ লেখায়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিবেশ অধিদপ্তর দেশে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

### ১. জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু অভিযোজন এবং প্রশমন প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক কার্যক্রমে Climate Technology Centre and Network (CTCN) এর ভূমিকা

<sup>1</sup><https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/publication/20432.pdf>

\*পরিচালক (জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন), পরিবেশ অধিদপ্তর

\*\*উপপরিচালক (আন্তর্জাতিক কনভেনশন), পরিবেশ অধিদপ্তর

\*\*\*সহকারী পরিচালক (জলবায়ু পরিবর্তন), পরিবেশ অধিদপ্তর

উন্নত দেশগুলো হতে উন্নয়নশীল দেশসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন এবং প্রশমন সংক্রান্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে UNFCCC Gi Technology Mechanism এর বাস্তবায়নকারী হচ্ছে Climate Technology Centre and Network (CTCN)। UN Environment Programme (UNEP) কর্তৃক গঠিত একটি কনসোর্টিয়াম CTCN এর মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তরের কাজটি প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পেয়েছে। CTCN-জাতীয় পর্যায়ে উক্ত প্রযুক্তি হস্তান্তরের সমন্বয় সাধনের জন্য প্রতিটি দেশে একটি National Designated Entity (NDE) স্থাপনের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় দেশে পরিবেশ অধিদপ্তরকে NDE এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে NDE Focal Point হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করেছে। দেশে প্রযুক্তি প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা হতে প্রাপ্ত অনুরোধের ভিত্তিতে NDE ৫টি প্রকল্প CTCN এ দাখিল করে, যার মধ্যে ইতোমধ্যে নিম্নবর্ণিত ০৩টি প্রকল্পে CTCN সহায়তা প্রদান করেছে।

১.১ প্রথম প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প/কার্যক্রম: Technical assistance for saline water purification technology at household level and low-cost durable housing technology for coastal areas of Bangladesh (পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন কর্তৃক দাখিলকৃত)।

উক্ত কার্যক্রমের ১ম কম্পোনেন্ট এর আওতায় দক্ষিণ কোরিয়ার Green Technology Centre (GTC) এবং Korea Institute for Civil Engineering and Building Technology (KICT) সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার জন্য একটি টেকসই বাড়ি নির্মাণের ডিজাইন প্রস্তাব করেছে; যা ভবিষ্যতে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে পাইলটিং করা হবে। টেকসই বিবেচিত হলে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড এ প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল করে বিভিন্ন জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বেশ কিছু সংখ্যক বাড়ি নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

দ্বিতীয় কম্পোনেন্ট এর আওতায় দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিষ্ঠান Glory and Tech উপকূল এলাকায় লবণাক্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের কার্যক্রমটি পরিচালনা করছে; তারা দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের নিকট থেকে ৫ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করে পরিবেশ অধিদপ্তরের আর্থিক এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্মতির ভিত্তিতে প্রকল্পটির পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করেছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় রিভার্স অসমোসিস প্রযুক্তিসহ অন্যান্য ফিল্ট্রেশন পদ্ধতির মাধ্যমে লবণাক্ততা, আয়রন, আর্সেনিক এবং পানির ক্ষারীয়তা দূর করা হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটি Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্প হিসেবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় CDM কমিটি কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আগামী ১০ বছর সাতক্ষীরা জেলার ১০ টি গ্রামের ৪০ হাজার মানুষকে বিনামূল্যে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করা হবে। প্রকল্পের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালন ব্যয় CDM এর বিক্রিত Certified Emission Reduction (CER) হতে সংগৃহীত হবে।

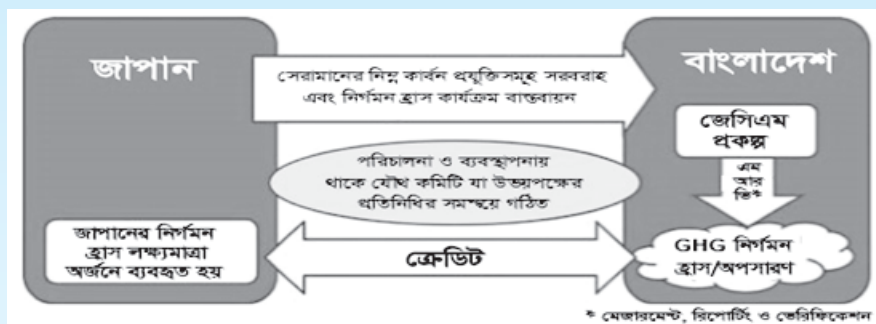
১.২ ২য় প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প/কার্যক্রম: Development of a certification course for energy managers and energy auditors of Bangladesh (টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত) উক্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রমটি মার্চ, ২০১৯-এ শেষ হয়েছে। উক্ত কারিগরি প্রকল্পের আওতায় ভারতের ন্যাশনাল প্রডাকটিভিটি কাউন্সিল কর্তৃক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে ৬টি ভিন্ন ভিন্ন ট্রেনিং মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তাসহ বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার ১৪ জন প্রকৌশলী/কর্মকর্তা ভারতে ২ (দুই) সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যতে এ Certification কোর্সটি টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় দেশেই আয়োজন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

১.৩ ৩য় প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প/কার্যক্রম: Technology for Monitoring & Assessment of Climate Change Impact on Geo-morphology (Sea level rise/fall, Salinity, Sedimentation etc) in the Coastal Areas of Bangladesh (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক দাখিলকৃত)। প্রকল্পটির কারিগরি সহায়তা Danish Hydraulic Institute (DHI) কর্তৃক প্রদান করা হবে। প্রকল্পটির কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হবে। প্রকল্পের আওতায় সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ভূ-তাত্ত্বিক গঠনের পরিবর্তন মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ করা হবে।

## ২. Joint Crediting Mechanism (JCM)

জাপান সরকার কর্তৃক গৃহীত Joint Crediting Mechanism (JCM)-এর আওতায় বাংলাদেশের বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ জাপান হতে বিদ্যুৎ, জ্বালানী, শিল্প ও অন্যান্য খাতে স্বল্প কার্বন নিঃসরণযোগ্য প্রযুক্তি, পণ্য, সেবা ও অবকাঠামো নির্মাণ/প্রচলনে সহায়তা লাভ করেছে যার মূল লক্ষ্য স্বল্প কার্বন নিঃসরণযোগ্য উন্নয়ন নিশ্চিত করা ও টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখা (চিত্র-২)। JCM-এর

আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নে জাপান সরকার কর্তৃক ৩০% হতে ৫০% পর্যন্ত অনুদান প্রদান করার সুযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, JCM-এর আওতায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও জাপানের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ১৯ মার্চ ২০১৩ তারিখে ঢাকায় “Low Carbon Growth Partnership” শীর্ষক গড়ট স্বাক্ষরিত হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশে JCM সচিবালয় হিসেবে কাজ করছে।



### ২০১৭-২০১৮ বছরে JCM সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রগতি নিম্নরূপ

বাংলাদেশের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় জাপানের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সাথে Joint Crediting Mechanism (JCM) সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। JCM-এর আওতায় জাপানের সহায়তায় ইতোমধ্যে ০৪টি জ্বালানী সাশ্রয়ী প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ময়মনসিংহের সুতিয়াখালীতে ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে (ছক-১)।

ছক-১: দেশে বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন JCM প্রকল্প/কার্যক্রম

|    | প্রকল্পের নাম                                                               | জাপানী পক্ষ                          | বাংলাদেশ পক্ষ                               | প্রকল্প অগ্রগতি                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ১. | High Efficiency Centrifugal Chiller in Sugar Mil                            | Ebara Refrigeration Equip. & Systems | City Sugar Industries Ltd., Narayanganj     | বাস্তবায়িত                                               |
| ২. | Installation of High Efficiency Loom at Weaving Factory                     | Toyota Tsusho Corporation            | Hamid Fabrics Ltd.                          | বাস্তবায়িত                                               |
| ৩. | Introduction of PV-diesel Hybrid System at Fastening Manufacturing Plan     | YKK Corporation                      | YKK Bangladesh Pte Ltd., Savar EPZ          | বাস্তবায়িত                                               |
| ৪. | Installation of High Efficiency Centrifugal Chiller in Clothing Tag Factory | Ebara Refrigeration Equip. & Systems | Next Accessories Ltd.                       | বাস্তবায়িত                                               |
| ৫. | 50MW Solar PV Power Plant Project, at Sutiakhali, Mymensing                 | Pacific Consultants                  | HDFC Sin Power Ltd. & IFDC Solar Power (BD) | সেপ্টেম্বর ২০১৯ এ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার কথা রয়েছে। |

JCM প্রকল্প গ্রহণে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোক্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর প্রতিবছর ২টি করে কর্মশালা আয়োজন করে। ইতোমধ্যে, বিগত বছরগুলোতে Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries (FBCCI), Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), Chittagong Chamber of Commerce and Industry (CCCI), Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) সহ অন্যান্য ভেন্যুতে বেশ কিছুসংখ্যক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

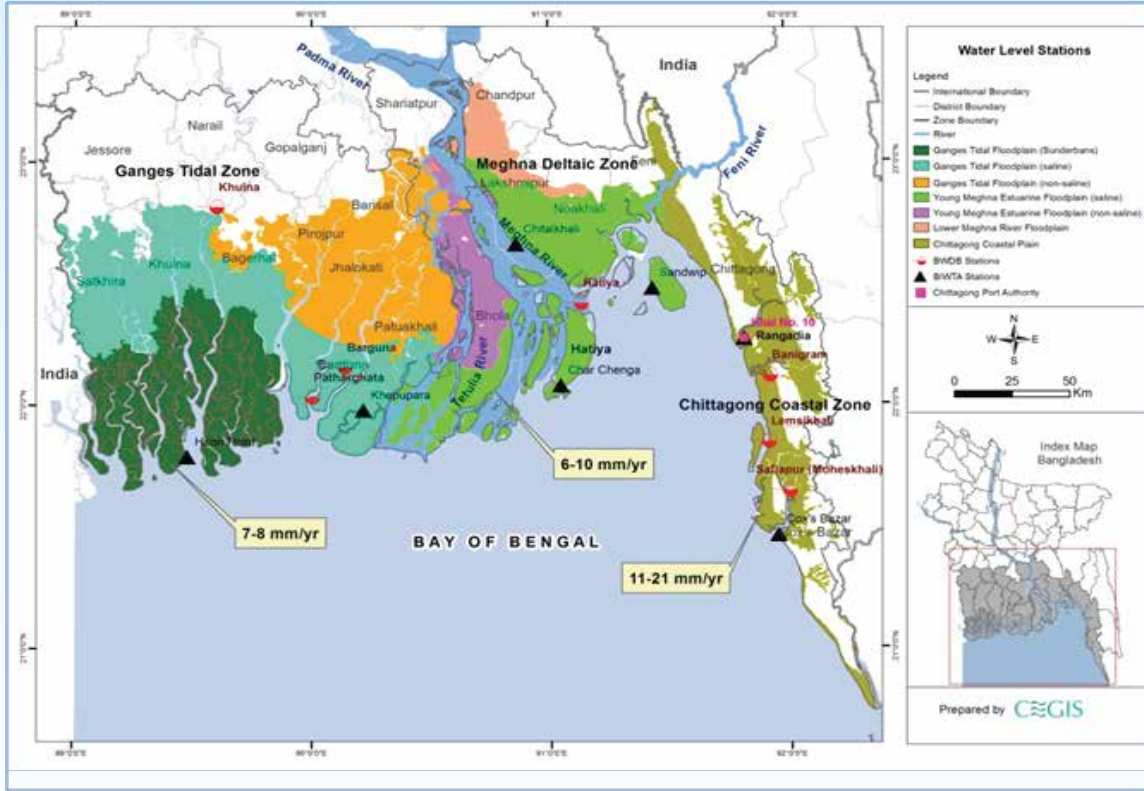
### ৩. Clean Development Mechanism (CDM) বা কার্বন ট্রেডিং

গ্রিন হাউজ গ্যাস নিগরন হ্রাসের লক্ষ্যে Kyoto Protocol এর আওতায় দেশে CDM) কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকার ইতোমধ্যে দূস্তর বিশিষ্ট Designated National Authority (DNA)-র অংশ হিসাবে জাতীয় সিডিএম বোর্ড এবং জাতীয় সিডিএম কমিটি গঠন করেছে। DNA এ পর্যন্ত মোট ২১ টি CDM প্রকল্প অনুমোদন করেছে এবং তন্মধ্যে ১৩ টি প্রকল্প জাতিসংঘের CDM Executive Board হতে Registration পেয়েছে। দুটি নতুন প্রকল্পের অনুমোদন চলমান রয়েছে। তবে বিশ্ববাজারে প্রতিটন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মূল্য ১ ডলারের নীচে হওয়ায় এ কার্যক্রম প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে। তবে পর্বে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহ যেমন - সৌর বিদ্যুৎ, আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটা এবং বর্জ্য থেকে কম্পোস্ট তৈরির প্রকল্প হতে ৮ লক্ষ টনের অধিক কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিগরন হ্রাস করা সম্ভবপর হয়েছে।

২০১৮ সালে CDM DNA কর্তৃক বাংলাদেশের স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান বন্ধু ফাউন্ডেশন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার একটি প্রতিষ্ঠান ইকো-আই এর মধ্যে যৌথ উদ্যোগে সারাদেশে উন্নত প্রযুক্তির ৬ লক্ষ চুলা বাজারজাত করণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ২ মিলিয়ন বা ২০ লক্ষ চুলা বিক্রয় এবং বাজারজাত করণের কার্যক্রম চলছে।

## ৪. জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন

৪.১ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা: সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি নিরূপণের লক্ষ্যে দেশীয় তিনটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় তথ্য-উপাত্ত বিশেষণ করে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক “Assessment of Sea Level Rise and Vulnerability in the Coastal Zone of Bangladesh through Trend Analysis” শীর্ষক একটি গবেষণা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত গবেষণা হতে দেখা যায় যে, নিম্নগাঙ্গেয় পললভূমি, মেঘনা মোহনা পললভূমি এবং চট্টগ্রাম উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার গড়ে প্রতি বছর ৬-২১ মিলিমিটার (চিত্র-৩)। এ গবেষণা প্রতিবেদনটি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবে বাংলাদেশের ঝুঁকি নিরূপণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং আন্তর্জাতিক নেগোসিয়েশনে বাংলাদেশের পক্ষে একটি দালিলিক প্রমাণ হিসেবে কাজ করছে।



চিত্র ৩: বিগত ত্রিশ বছরে নিম্ন গাঙ্গেয় পললভূমি, মেঘনা মোহনা পললভূমি এবং চট্টগ্রাম উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার; উৎস: পরিবেশ অধিদপ্তর, ২০১৬।

৪.২ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ফলো-আপ গবেষণা: এ গবেষণার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট-এর অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় “Projection of Sea Level Rise and Assessment of its Sectoral (Agriculture, Water and Infrastructure) Impacts” বা “বাংলাদেশের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপণ এবং কৃষি, পানিসম্পদ ও অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব নিরূপণ” - শীর্ষক গবেষণামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে - (ক) Satellite Altimetry Data ব্যবহার করে বাংলাদেশের সমুদ্র স্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি নিরূপণ; (খ) ২০৩০, ২০৫০, ২০৭০, ২০১০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপণ ও তার ভিত্তিতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে digital elevation models (DEMs) প্রণয়ন করা; (গ) উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি, পানিসম্পদ এবং অবকাঠামোর উপর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব নিরূপণ। গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পন্ন হলে উপকূল এলাকার ঝুঁকি নিরূপণ এবং নীতি নির্ধারণকণ কর্তৃক করণীয় নির্ধারণে সহায়ক হবে।



### ৪.৩ অভিযোজন ফান্ডে প্রকল্প দাখিল

সম্প্রতি Adaptation Fund (AF) Board হতে "Adaptation Initiative for Climate Vulnerable Offshore Small Islands and Riverine Charland in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। ৯.৯৯৫ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৮৪ কোটি টাকা) ব্যায়ে রংপুর জেলার গঙ্গাছড়া উপজেলার, লক্ষিতারি ইউনিয়নে (নদী বিধৌত চর) এবং ভোলাজেলার চরফ্যাশন উপজেলার মুজিবনগর ইউনিয়নে (সমুদ্র উকূলবর্তী চর) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

৪.৪ Global Environment Facility (GEF) এর সহায়তায় Least Developed Countries Fund (LDCF) এর অর্থায়নে এবং United Nations Environment Programme (UNEP) এর কারিগরি সহায়তায় বরেন্দ্র ও হাকালুকি হাওর এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় ৫.২ মিলিয়ন ডলার ব্যায়ে প্রতিবেশ ব্যবস্থাবিত্তিক অভিযোজন (Ecosystem based Adaptation to Climate Change) কার্যক্রম বিষয়ক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

### ৪.৫ Capacity Building Initiative on Transparency (CBIT)

Paris Agreement এর আর্টিকেল ১৩ এর আওতায় বিশ্বব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা শক্তিশালী করার জন্য একটি Transparency Framework গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় অন্যান্য আরও কার্যক্রমের মধ্যে National Communication Ges Biennual Update Report (BUR) আরও স্বচ্ছতার সাথে করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য Food and Agriculture Organization (FAO) এর মাধ্যমে Global Environment Facility (GEF) হতে প্রায় ১ মিলিয়ন ডলার (৮ কোটি টাকা) পাওয়া যাবে। পরিবেশ অধিদপ্তর এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

প্রকল্পের আওতায় Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) এর গাইডলাইন্স অনুযায়ী (১) Energy, (২) Industrial Processes & Product Use (IPPU), (৩) Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) এবং Waste খাতের গ্যাস নিঃসরণ আরও স্বচ্ছতার সাথে করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

### ৪.৬ Bangladesh's Country Programme for Green Climate Fund 2018

গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডে ভবিষ্যতে মানসম্পন্ন প্রকল্প দাখিলের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা হতে অভিযোজন এবং প্রশমন প্রকল্প আহবান করে। প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ হতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ Journey with Green Climate Fund: Bangladesh's Country Programme for Green Climate Fund 2018 প্রণয়ন করেছে; উক্ত প্রোগ্রামে পরিবেশ অধিদপ্তরের ১ (এক) টি আঞ্চলিক প্রকল্পসহ মোট ১০ (দশ) টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (ছক-২)।

| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম                                                                                                                           | বাজেট (মিলিয়ন ডলার) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ১      | Promotion of Climate Friendly Cooking: Bangladesh, Kenya and Senegal                                                                    | ১১৩                  |
| ২      | Drought impact assessment and adaptation in water resource and irrigated agriculture in drought-prone Barind Area, northwest Bangladesh | ১৫                   |
| ৩      | Soil Management and Food Security Through Climate-Smart Agriculture in Drought Prone Barind Area, Northwest Bangladesh                  | ১৫                   |
| ৪      | Greening the Brick Sector in Bangladesh for emission reduction and better natural resources management                                  | ৪০                   |
| ৫      | Dissemination of improved paddy parboiling systems to reduce GHG emission and localized air pollution                                   | ২৪                   |
| ৬      | Building a climate and environment sensitive generation through green clubs in schools                                                  | ২৭                   |
| ৭      | Ecosystem based Adaptation (EbA) in the Ecologically Critical Areas (ECAs) of Bangladesh                                                | ৬০                   |
| ৮      | Establishment of Model Cities in Environment Management                                                                                 | ২৭                   |
| ৯      | Living with nature through coastal protection in Bangladesh                                                                             | ৪৫                   |
| ১০     | Adaptation initiative for climate vulnerable flood prone area in Bangladesh                                                             | ৩৫                   |

ছক-২: Bangladesh's Country Programme for Green Climate Fund 2018 তে অন্তর্ভুক্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ

পর্যায়ক্রমে প্রকল্পগুলো পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাব আকারে প্রণয়ন করে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মাধ্যমে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড-এ অর্থায়নের জন্য দাখিল করা হবে।

## বরেন্দ্র অঞ্চলে খরা প্রশমনে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা

জালালউদ্দিন মোঃ শোয়েব\*

বরেন্দ্র অঞ্চল প্রায় ৭,৭২৭ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ২৪০২৩ হতে ২৫০ ১৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮০ ০২ হতে ৮৮০ ৫৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে বিস্তৃত। ইহা বাংলাদেশের প্রায় ৫.২৫ শতাংশ যা খরাপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। এলাকায় প্রায় ৫,৮৩০ বর্গ কিলোমিটার আবাদি জমি এবং নব্বই দশকের পূর্বে সমুদয় এলাকা প্রধানত খরিপ মৌসুমে রোপাআমনের চাষ এবং বৎসরের অন্য সময়ে সীমিত আকারে স্বল্প সেচ ব্যবস্থায় আলু, শাকসজি ও বোরো ধানের চাষ করা হত যা খরার কারণে ফলন কমে যেত বা ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হত।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১৯৯২ সাল হতে প্রায় ৩০ প্রকল্পের মাধ্যমে বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রায় ৩,১৫,৫৬৭ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ এলাকা সেচের আওতায় এনে এলাকার খরা প্রবণতা প্রশমিত করেছে। এর পাশাপাশি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমিত ও এলাকার জীব বৈচিত্র্যও বৃদ্ধি করেছে। এ কর্মকাণ্ড অত্যন্ত উৎসাহ ব্যঞ্জক এবং প্রশিধানযোগ্য। সংক্ষেপে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হল।



বরেন্দ্রের খরা পীড়িত এলাকা



বরেন্দ্রের খরা প্রশমিত এলাকা



সেচের জন্য নদীর পানি ব্যবহার করে ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমানো:

এ প্রযুক্তির মাধ্যমে পদ্মা নদী হতে ৩.৫ কিলোমিটার দূরবর্তী গোদাগাড়ী উপজেলার সরমংলা এলাকায় ভূগর্ভস্থ পাইপের মাধ্যমে সফল ভাবে সেচের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এ ব্যবস্থার ফলে সরমংলার প্রায় ২৫ কিলোমিটার খালে পানি সংরক্ষণ এবং পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১৪ টি চেকডেম প্রদান করে ১,৮৫০ হে: জমিতে সেচ প্রদান, ৫,৫৩০ জন উপকারভোগী, বৎসরে প্রায় ২০,৫০০ মে: টন ধান উৎপাদন ও খালের দুই পাড়ে ৬৫,৫০০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো হয়েছে। এর সফলতা বিবেচনা করে প্রযুক্তিটি রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী ও পুটিয়া; চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তফাপুর এবং নওগাঁ জেলার দামুইরহাট ও মহাদেবপুর উপজেলায় প্রায় ৯,৪০০ হে: এলাকায় ১৮,০০০ এর অধিক কৃষককে সেচ সুবিধা প্রদান করছে। এ প্রযুক্তির আওতায় যে সকল এলাকায় খাল নেই সেসব এলাকায় পুকুরে পানিসংরক্ষণ ও সৌরশক্তি সংযোজিত সেচ পাম্পের মাধ্যমে পানি বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। নিম্নে ছবির সাহায্যে প্রযুক্তিটি উপস্থাপন করা হল।



(ক)



(খ)



(গ)



(ঘ)



(ঙ)



(চ)

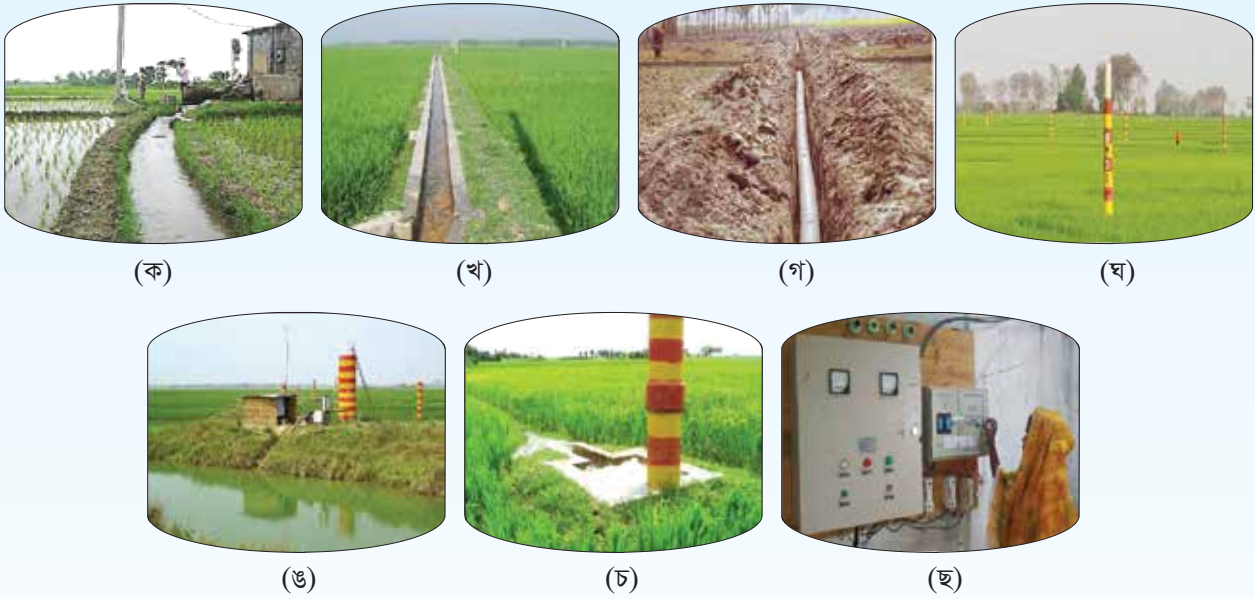
\*সাবেক মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

\*প্রকল্প- কোর্ডিনেটর, ই এন এ এল ইউ এলডি ই পি/এসএলএম প্রকল্প

(ক) পদ্মানদী হতে সরমংলা খালে পানি প্রবাহের চিত্র; (খ) হাটপাড়ায় পদ্মানদী হতে ১২টি পাম্পের সাহায্যে পানি উত্তোলনের পনটুন; (গ) পদ্মানদী হতে ৩.৫ কি:মি দূরে সরমংলা খালে পানি সংরক্ষণ ও মাছ চাষ; (ঘ) সরমংলা খালে পানি সংরক্ষণের জন্য বাঁধ বা চেকডেম; (ঙ) সরমংলা খাল হতে সৌর শক্তি ব্যবহার করে ভূগর্ভস্থ পাইপদ্বারা সেচের পানি সরবরাহ; (চ) পুকুরে পানি সংরক্ষণ ও সৌরশক্তি সংযোজিত সেচ পাম্পের মাধ্যমে পানি বিতরণ ব্যবস্থা।

#### ভূগর্ভস্থ পাইপের সাহায্যে সেচের পানি সরবরাহের সক্ষমতাবৃদ্ধি

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সর্বমোট ১২৫ উপজেলায় ১৬,০০০ গভীর নলকূপের পানি ভূগর্ভস্থ পাইপের মাধ্যমে সেচ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সুপেয় পানি সরবরাহ করা হয়। এ ব্যবস্থার ফলে এ দুই বিভাগের প্রায় তিনলাখ হেক্টরের বেশী জমিতে সেচের জন্য পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে এবং বরেন্দ্র এলাকার ৯.৫ লক্ষ কৃষক সরাসরি উপকৃত হচ্ছে। পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় কৃষিজমি ও পানির অপচয় রোধ, বেশী এলাকা সেচব্যবস্থার মধ্যে আনা এবং সাংবাসরিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে এ প্রযুক্তি কার্যকর। বরেন্দ্র এলাকার এ প্রযুক্তি আরো বেশী কৃষক বান্ধব করার জন্য পানির প্রি-পেইড কার্ড ও সৌরশক্তি সংযোজন করে পানি ও বিদ্যুতের অধিকতর সাশ্রয় সম্ভব হয়েছে। এর পাশাপাশি ক্ষুদ্র সেচযন্ত্রের সাহায্যে খাল বা পুকুরের পানি এ প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত করে পানি সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। নিম্নে ছবির সাহায্যে প্রযুক্তিটি উপস্থাপন করা হল।



(ক) পূর্বের মাটির নালায় পানি সরবরাহ ; (খ) পূর্বের পাকা নালায় পানি সরবরাহ; (গ) যেভাবে ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন করা হয়; (ঘ) বর্তমানে ভূগর্ভস্থ পাইপের মাধ্যমে সেচের পানি সরবরাহ; (ঙ) বর্তমানে খালের সৌরশক্তি চালিত খখচ-এর সাহায্যে ভূগর্ভস্থ পাইপের মাধ্যমে সেচের পানি সরবরাহ; (চ) উপযোগী এলাকায় ভূগর্ভস্থ পাইপের পানি জমিতে সরবরাহ মুখ; (ছ) গভীর নলকূপের পানির জন্য প্রি-পেইড কার্ড পদ্ধতি।

#### ভূপৃষ্ঠস্থ পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা বৃদ্ধি

এ প্রযুক্তির সাহায্যে বরেন্দ্র এলাকার পরিত্যক্ত বা মজা জলাধার বা খাল সংস্কার করে সেচের জন্য পানি সংরক্ষণ করা হয়। খালের পানি দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করার জন্য খালে বাঁধ বা চেকডেম দেয়া হয়, এছাড়া রাবার ডেম স্থাপন করে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্য দিকে খালের বিভিন্ন অংশে ভূগর্ভস্থ পানির আধার বৃদ্ধির জন্য গভীরকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল জলাধার হতে ক্ষুদ্র সেচযন্ত্রের (খখচ) সাহায্যে সংলগ্ন এলাকায় সেচ প্রদান করা হয় এবং এ সকল ক্ষুদ্র সেচযন্ত্র সৌরশক্তি সাথে সংযুক্ত করে এ প্রযুক্তি আরো সাশ্রয়ী করা হয়। নিম্নে ছবির সাহায্যে প্রযুক্তিটি উপস্থাপন করা হল।





(ক)



(খ)



(গ)



(ঘ)



(ঙ)



(চ)



(ছ)



(জ)



(ঝ)



(ঞ)

(ক) মজাখাল, বরিশাপুর; (খ) পূর্ণঃখননকৃত খালে পানি সংরক্ষণ, গোদাগাড়ী; (গ) পূর্ণঃখননকৃত খালে চেকডেম ও সংরক্ষিত পানি, গোদাগাড়ী; (ঘ) খালে রাবার ডেম, বারনই, পুটিয়া; (ঙ) খালে সংরক্ষিত পানি ও দুই পাশে বৃক্ষরোপণ, গোদাগাড়ী; (চ) খালে সংরক্ষিত পানি ও দুই পাশে বৃক্ষরোপণ, সরমংলা, গোদাগাড়ী; (ছ) পতিত জলাশয়, কুসুমকুন্ড, পোরশা; (জ) খননকৃত চ-একর জলাধার, কুসুমকুন্ড, পোরশা; (ঝ) সৌরশক্তি চালিত খেচ; (ঞ) খালে ভূগর্ভস্থ পানির আধার বৃদ্ধির ব্যবস্থা।

সৌরশক্তি সংযোজিত পাত কুয়ার (Dug well) পানি ব্যবহার করে খাবার ও ক্ষুদ্র পরিসরে সেচের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বরেন্দ্র এলাকায় খাবার জন্য 'পাতকুয়ার' পানি ব্যবহার করার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। সাধারণত এসকল এলাকায় (সাপাহর, পোরশা) গভীর নলকূপ কার্যকর নয়। বৎসরে এ সকল এলাকায় শুধুমাত্র একটি ফসল- রোপাআমন চাষ হত যা খরার কারণে অধিকাংশ সময় ক্ষতিগ্রস্ত হত। বাংলাদেশের প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এ প্রযুক্তিতে সৌরশক্তি ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা সংযোজন করেছেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৫০টি 'পাতকুয়া' খননকরে প্রতি 'কুয়ার' মাধ্যমে গড়ে ৮টি পরিবারে সুপেয় পানির ব্যবস্থাসহ ও প্রায় ১.৮ হেক্টর জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে। প্রতি কুয়া এলাকায় বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি, গম ও ফলের (বেশীর ভাগ বিভিন্ন প্রজাতির আম) চাষ করা হয়। নিম্নে ছবির সাহায্যে প্রযুক্তিটি উপস্থাপন করা হল।



(ক)



(খ)



(গ)





(ঘ)



(ঙ)

(ক) সৌরশক্তি ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা সংযোজিত পাতকুয়া (Dug well), সাপাহার; (খ) সৌরশক্তি ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা সংযোজিত পাতকুয়া (Dug well), করলডাঙ্গা, সাপাহার; (গ) পাতকুয়ার পানি ব্যবহার করে চাষাবাদ; (ঘ) সেচ সুবিধার পাশাপাশি সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ গভীর নলকূপ; (ঙ) সুপেয় পানি সংগ্রহ।

প্রবন্ধের উপস্থাপক বরেন্দ্র এলাকার WOCAT team-এর নিকট কৃতজ্ঞ। উক্ত Team WOCAT tools ব্যবহার করে বরেন্দ্র এলাকার SLM best practice documentation করেছে। আলোচ্য বিবরণীতে উক্ত সময়ের তথ্য ও অভিজ্ঞতার আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য জালালউদ্দিন মোঃ শোয়েব, প্রকল্প- কোর্ডিনেটর, [slmldproject@gmail.com](mailto:slmldproject@gmail.com) অথবা জনাব রফিকুল ইসলাম, ডেপুটি ম্যানেজার, বি এমডি, এ, [pd\\_seed\\_bmda@yahoo.com](mailto:pd_seed_bmda@yahoo.com) যোগাযোগ করা যেতে পারে।

## ইটভাটায় কৃষিজমির মাটি ও পরিবেশের অবক্ষয় এবং প্রতিকার

ড. মো. আলতাফ হোসেন\*

ইট (ইংরেজি: Brick) ইমারত তৈরির একটি অতি আবশ্যকীয় ও মৌলিক উপাদানবিশেষ। বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রথিবীর বিভিন্ন দেশে রোদে শুকানো বা আগুনে পোড়ানো ইট ব্যবহার হয়ে আসছে। যদিও ইট পাথরের মত দীর্ঘস্থায়ী এবং মজবুত নয়; তারপরও সহজলভ্যতা, অল্প খরচ এবং স্বল্প ওজনের জন্য এর জনপ্রিয়তা এবং ব্যবহার সর্বাধিক। খ্রীষ্ট-পূর্ব ৭,৫০০ বছর পূর্বে সবচেয়ে প্রাচীনতম ইটের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ ইট দক্ষিণ-পূর্ব আনাতোলিয়ার নিকটবর্তী দিয়াবাকির কাছাকাছি তাইগ্রিস এলাকা থেকে সংগ্রহীত হয়েছে। এরচেয়ে অল্প প্রাচীন ইট খ্রীষ্ট-পূর্ব ৭,০০০ থেকে ৬,৩৯৫ সালের মধ্যে জেরিকো এবং কাতাল হাইয়ুক এলাকায় দেখা গেছে। তবে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, মধ্যপ্রাচ্যে খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে আগুনে পোড়া ইট তৈরী করা হয়েছিল। আগুনে পোড়ানো ইট ঠাণ্ডা এবং আর্দ্র আবহাওয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে ও বেশ মজবুত প্রকৃতির হয়ে থাকে (<https://en.wikipedia.org/wiki/Brick>)।

আধুনিক বিশ্বে বিশাল বহুতল ভবন নির্মাণে কংক্রিট, অ্যালুমিনিয়াম সিট, প্লাস্টিক, কাঁচ ফাইবার, স্টীল এবং ধাতব বস্তুর ব্যাপক ব্যবহার হলেও বাংলাদেশসহ বহু স্বল্পোন্নত দেশে প্রধানত ব্যবহার হচ্ছে ইট। বাংলাদেশে সাধারণত বছরের অক্টোবর থেকে মার্চ মাসকে ইট তৈরীর উপযুক্ত সময় হিসেবে বেছে নেন ইট কারখানার মালিকেরা। ইট ভাটার মালিকেরা কৃষকদের লোভ দেখিয়ে এককালীন অল্প কিছু টাকা দিয়ে চাষাবাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জমির উপর অংশের উর্বর মাটি কেটে নিয়ে যায় ইট তৈরীর কাজে ব্যবহারের জন্য।



চিত্র: ক) ইট ভাটায় কার্ঠের ব্যবহার



খ) পাহাড়ী এলাকায় ইট ভাটা



গ) ইট ভাটা থেকে নির্গত ব্যাক কার্বন

মানুষের আয় বৃদ্ধির ফলে দেশে ইটের বাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। আজকের এই আধুনিক বিশ্বে ইটের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নিয়ম না মেনে এই প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরীতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবেশ, মানুষের স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস, স্বাস্থ্য, উর্বর মাটি এবং অতি উপকারী বায়ু। ইট তৈরীতে পোড়ানো হচ্ছে শত শত একর জমির উর্বর অংশ।

ইট ভাটার জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে কার্ঠ যা প্রতি বছর বাংলাদেশের ইট ভাটার ২৫% জ্বালানী সরবরাহ করে থাকে। এই প্রাকৃতিক কার্ঠ পোড়ানোর ফলে একদিকে যেমন নষ্ট হচ্ছে বনজ সম্পদ, অন্যদিকে নষ্ট হচ্ছে ওইসব বনে বসবাসকারী জীবজন্তুর ভারসাম্য। অতিরিক্ত কয়লা পোড়ানোর ফলে নির্গত হচ্ছে ধূলিকণা, পার্টিকুলেট কার্বন, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইড-সমূহ যা চোখ, ফুসফুস ও শ্বাসনালীতে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।



চিত্র: ইট ভাটার জন্য লালমনিরহাট সদরের মদনের চক এলাকার কৃষি জমির উপরিস্তরের মাটি কাটা হচ্ছে (ছবি: এস দিলীপ রায়, ২০১৬)

\*প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

কৃষি জমিতে ভারী ধাতুর উপস্থিতি এবং এসব বস্তুর সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কিত একটি গবেষণায় ২০১৫ সালে বলা হয় মাটির উপরি অংশে ভারী ধাতু ক্যাডমিয়াম এবং লেড এর উপস্থিতি পার্শ্ববর্তী ইট ভাটার বায়ু দূষণের ফল (Sikder et al., ২০১৫)।

গতানুগতিক পদ্ধতির ইটভাটা শুধু বায়ু দূষণই করে না বরং বায়ু হতে বিভিন্ন বায়ুমণ্ডলীয় উপায়ে মাটিতে এসব দূষণকে স্থানান্তরিত করে এবং ব্যাপকভাবে মাটি দূষণকে তরান্বিত করে, যা নষ্ট করে মাটির প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের ভারসাম্য। একটি হিসেব মতে ২৫০ বর্গমিটার ফ্লোরের একটি ৫তলা ভবন নির্মাণের জন্য ৫,০০,০০০ ইট প্রয়োজন যা তৈরীতে ১ হেক্টর ফারো স্পাইস (১০০ মি\*১০০ মি\* ১৫ সে. মি.) এরও বেশি মাটির উপরি অংশ প্রয়োজন (Osman, ২০১৪), যা বাংলাদেশে মাটি অবক্ষয়ের একটি অন্যতম কারণ।

কৃষি প্রধান এই দেশে ইটভাটার সবচেয়ে বড় প্রভাব হল মাটির উর্বর উপরি অংশ পুড়িয়ে ইট তৈরী যা দেশের কৃষির উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে কারণ প্রাকৃতিকভাবে মাটি তৈরী একটি সময় সাপেক্ষ বিষয়। আবাসিক এলাকা, কৃষি জমি এমনকি কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকায়ও ইটভাটা তৈরী হচ্ছে বলে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়েছে (ঢাকা ট্রিবিউন, ১৯ জুন ২০১৩,) যা এইসব এলাকার জনস্বাস্থ্য, কৃষি ও বনজ বৃক্ষের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে এবং এটি ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইনের লঙ্ঘন। এসআরডিআই কর্তৃক ২০০৫ এবং ২০১৭ সালে পরিচালিত দুটি পৃথক জরিপে অনুরূপ তথ্য উঠে এসেছে।

এতদসত্ত্বেও বিশ্বায়নের এই যুগে ইটের চাহিদাকে সামনে রেখে বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে ইট তৈরী করা হচ্ছে। ইউএনডিপি এর সহায়তায় বাংলাদেশে উন্নত প্রযুক্তিতে ইট তৈরী শুরু হয় ২০০৬ সালে। এই উন্নত পদ্ধতিসমূহ ১৫০ বছরের পুরানো পদ্ধতির পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং যা আমাদের পরিবেশ ও অর্থনীতির জন্য সুখবর বয়ে এনেছে। ভারতে একটি গবেষণায় দেখা যায় পাঁচটি বিভিন্ন পদ্ধতির ইট তৈরীর উন্নত প্রযুক্তির মধ্যে জিগ-জ্যাগ ও ভার্টিকেল সাফট ব্রিক কিল্ন (VSBK) পদ্ধতিতে কার্বন মনোক্সাইড এবং পার্টিকুলেটেড বস্তু নিঃসরণ ৬০-৭০% কমানো সম্ভব (Rajarithram et al., ২০১৪)।

এমতাবস্থায় জনসচেতনতা তৈরী করে উন্নত প্রযুক্তিতে ইট কারখানা তৈরীতে সরকারী ও বেসরকারী অর্থায়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ বান্ধব উদ্যোগই পারে একটি পরিবেশ বান্ধব, কম দূষক নিঃসরক ইট তৈরীর পরিবেশ সৃষ্টি করতে যা গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের বিপক্ষে বাংলাদেশের সুদৃঢ় অবস্থানকে নিশ্চিত করবে।

তাই পরিবেশ ও জলবায়ুর কথা বিবেচনা করে ২০২০ সালের মধ্যে সব ইটভাটা বন্ধের দাবি উঠেছে পরিবেশবাদীদের তরফ থেকে। তাহলে ঘর-বাড়ি নির্মাণের উপায়?

ইটের বিকল্প ও ব্যয় সাশ্রয়ী নির্মাণ উপকরণ নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করছে বাংলাদেশ হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এইচবিআরআই)। এ প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় উঠে আসে ইটের বিকল্প কনক্রিটের বকের কথা। এই বক নির্মাণ করা হয় সিমেন্ট ও নুড়ি পাথর দিয়ে। ইটের মতো পোড়াতে হয় না। বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিজেদের নির্মাণে ব্যবহার করছে ইটের বিকল্প কনক্রিট বক। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো তো সেই বক খোলা বাজারে বিক্রি করে না। তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে?

এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মুন্সিগঞ্জের টংগিবাড়ি থানার বালিগাঁওয়ের ছেলে মোহাম্মাদ শাহাদাৎ হোসেন শিপু নির্মাণ করেছেন কনক্রিটের বক তৈরির মেশিন বা ফর্মা। এই মেশিন দিয়ে একজন মানুষ দিনে খুব সহজেই ১০০টি বক বানাতে পারে। প্রত্যেক বকে খরচ পড়বে ৩০ টাকা। একটি বক সাড়ে পাঁচটি ইটের সমান। সাড়ে পাঁচটা ইটের দাম যেখানে কমপক্ষে ৫৫ টাকা, সেখানে ৩০ টাকায় কাজ হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জন্য এটি একটি পরিবেশবান্ধব সাশ্রয়ী উদ্যোগ।

পরিবেশ অধিদপ্তরের হিসাব মতে সারাদেশে ৭৯৩৩ টি ইটভাটা রয়েছে। হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের হিসাব মতে ১,৫০০ কোটি ইট তৈরীতে ১২৭ কোটি ঘনফুট মাটি প্রয়োজন হয় যার সিংহভাগই কৃষি জমির উপরিস্তর কেটে সংগ্রহ করা হয়। ব্রিক বার্নিং কন্ট্রোল এক্ট, ১৯৮৯ (যা ২০১৩ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী দোফসলী কৃষি জমিতে ইট ভাটা স্থাপন নিষিদ্ধ। আইনের সীমাবদ্ধতার কারণে এক ফসলী কৃষি জমিতে ইট ভাটা স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে ভারতে কৃষি জমি থেকে ইট ভাটার জন্য মাটি সংগ্রহ নিষিদ্ধ। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য এবং পুষ্টি নিরাপত্তা বিধান কৃষি জমির অবক্ষয় রোধে বাংলাদেশেও অবিলম্বে অনুরূপ আইন করা আবশ্যিক। কৃষি জমির উপরিস্তরের মাটির পরিবর্তে নদী/খাল পুনঃখনন করা মাটি ইট ভাটায় ব্যবহার নিশ্চিত করা হলে এবং পোড়ানো ইটের বিকল্প কনক্রিট বক স্থাপনা নির্মাণ পর্যায়ক্রমে বাধ্যতামূলক করা হলে তা পরিবেশ এবং কৃষি জমির অবক্ষয় রোধে স্থায়ী ভূমিকা রাখবে।

## আশাবাদী ভাবনার আলোকে আমার বাংলাদেশ

রওশন ইসলাম\*

আমি অজেয় প্রাণশক্তি অমিত সম্ভবনার বাংলাদেশের স্ফুরণের কথা বলছি।

আগামী দিনের বাংলাদেশকে আমরা কেমন দেখতে চাই।

স্বাধীন বাংলাদেশ।

হাজারো বছর ধরেও স্বাভাবিক আর আত্মনিয়ন্ত্রণের যে স্বপ্ন বাঙালির বুকে ধারণ করেছে তার চরম প্রকাশ আর বাস্তব রূপায়ণ ঘটে বিশ শতকে। সমাজ, রাজনীতি ও পরিবেশের বাস্তবতাকে সবচেয়ে প্রথমে আমলে দিতে হবে। এর পরিবর্তনের ধাক্কা আমাদের বহন করতে হবে। বিশ শতকের শেষ দশকে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে। যার ফলে পরিবর্তন এসেছে- হয়েছে, পরিবর্তন, গ্রহণ ও বর্জনের চ্যালেঞ্জ।

একথা ঠিক, বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের সম্পদ ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে। বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তির ফলে ব্যবসা বাণিজ্যে এমন সব সুযোগ আর বেড়েছে বহুগুণ, তাই আমাদের হতে হবে তথ্য প্রযুক্তির প্রতি আরো বেশি যত্নশীল। অবহেলিত মানুষের কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা খাতে (যেমন ভিজি এফ, ভিজিডি) বিনিয়োগ বাড়িয়ে যেতে হবে। আর লক্ষ্য রাখতে হবে এই বিনিয়োগ যেন দক্ষভাবে খরচ হয়।

দারিদ্র নিরসনের জন্য প্রযুক্তির উন্নয়নে উৎসাহ ও বিনিয়োগ বাড়িয়ে তুলতে হবে। আমাদের হতে হবে কৃষি ও প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পায়নে মনোযোগী। তাই আমাদের প্রয়োজন-আরো বেশি পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড বাড়িয়ে রাষ্ট্রকে পরিবেশ উন্নয়নে নেতৃত্ব দেওয়া।

বাংলাদেশের অসংখ্য উন্নয়ন সংগঠন সমাজ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। তাই এখন আমাদের প্রয়োজন সঠিক প্রস্তুতির। আসুন বিশ্বায়নের কুফল এড়িয়ে সুফলগুলো ঘরে তুলে নেওয়ার জন্য সঠিক প্রস্তুতি নেই।

আমরা এখন একুশ শতকের মানুষ। শুরু হয়ে গেছে নতুন শতাব্দী, শতাব্দীর এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা কি প্রস্তুত? এখন আমাদের সামনে তাকানোর সময়, নতুন সুযোগ আর সম্ভাবনা সন্ধানের সময়, ঘুরে দাঁড়াবার সময়।

এমনি এই সময়কে আমরা হেলায় হারাতে পারি না। পরিবর্তন হচ্ছে বিকাশের লক্ষণ। আমরা কি পারছি আমাদের চারপাশের পরিবেশ পরিবর্তন করে এগিয়ে যেতে? আমাদের চারপাশে যা দেখি বা যে সব উপাদান আর বস্তুসম্ভার যা কিনা আমাদের স্বাস্থ্য, ভালমন্দ ও সুখ দুঃখের কর্তৃত্ব নিয়ে গড়ে উঠে আমাদের পরিবেশ। অর্থাৎ একটা জীবের পরিবেষ্টক ও প্রভাব বিস্তারকারী সজীব ও জড় উপাদানের মোট সমষ্টি বা যোগাযোগ হচ্ছে পরিবেশ।

এই পরিবেশ দূষণ মোটামুটি চারটে অংশে বিভক্ত। যেমন-পানিদূষণ, বায়ুদূষণ, মাটিদূষণ, আর শব্দদূষণ, তার সাথে আবার যুক্ত হয়েছে তেজস্ক্রিয় দূষণ বর্জ্য ও রাসায়নিক বিদ্যুদূষণ।

পৃথিবী নামের গ্রহ তার সুন্দর প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতা সৃষ্টি আর পরিবেশ সংরক্ষণে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণে সবাইকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সারা বিশ্বের সাথে একযোগে বাংলাদেশ ও পালিত হয় 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' ইউনেপ, যার বর্তমান নাম জাতিসংঘ পরিবেশ (UN Environment) প্রতিবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে থাকে। উপযুক্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে বিধি নির্ধারিত পদ্ধতি ও মানমাত্রা বজায় রেখে কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়া করণ, পূর্বব্যবহ-রোপযোগীকরণ ও চূড়ান্ত পরিত্যাজনের উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বর্জ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার নির্দেশনা রয়েছে।

আমরা কলকারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য পদার্থ পৌর ও বাণিজ্য কঠিন বর্জ্য, পৌর নর্দমার ময়লা, ভূমি ও বাণিজ্যিক কঠিন বর্জ্য, ভূমি ক্ষয় ও ভূমি বিপর্যয়ের পলি, প্রাণিজাত আবর্জনা, কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের তারতম্য হীন ব্যবহার, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ইত্যাদি সবগুলোকে পানি দূষণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

বর্তমান বিশ্বে বায়ুদূষণ খুব আলোচিত একটা সমস্যা। দ্রুত বর্ধনশীল নগরায়ন ও শিল্পায়নের চাহিদা হিসেবে অধিক মাত্রায় জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, কলকারখানার উন্মুক্ত নিঃসরণ, জনসচেতনতার অভাব ইত্যাদি কারণে বায়ুদূষণ বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে চরম আকার ধারণ করেছে।

\*আঞ্চলিক কমিশনার, রাজধানী অঞ্চল, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন



বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, বায়ুদূষণের কারণে প্রতিবছর বিশ্বে প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে। যার একটি বড় অংশ এশিয়ান। আমেরিকার Institute for Health Metrics and Evaluation এর হিসাব অনুযায়ী ২০১৬ সালে পরিবেশ দূষণের কারণে মানুষের কর্মঘণ্টা যতটা কমেছে তার দুই তৃতীয়াংশই হচ্ছে বায়ুদূষণের কারণে।

শুরু মৌসুমের আবহাওয়া বায়ুদূষণ সহায়ক বিধায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি, সঠিক আইন প্রণয়ন ও এর প্রয়োগের মাধ্যমে সব সেক্টর থেকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ নিঃসরণ কমানোর উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে বায়ুদূষণ কমানো সম্ভব বলে মনে করা যায়। একজন মানুষ প্রতিদিন বাতাসে দিচ্ছে প্রায় দুই পাউন্ড কার্বনডাইঅক্সাইড এবং চারপাশে গাছপালা থাকায় সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে তারা শ্বेतসার তৈরি করে অক্সিজেন বায়ুতে নির্গমনের ফলে সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপনের জন্য আমরা তা গ্রহণ করে বেঁচে থাকি।

কিন্তু বিভিন্ন কারণে এগুলোর পরিমাণ কম/বেশি হলে বা বায়ুতে দূষক মিশ্রিত হলে আমাদের শরীরের ক্ষতিকর অবস্থা সৃষ্টি করে। দূষণ মুক্ত বাতাস মানুষের মন ও স্বাস্থ্যের জন্য অতীব প্রয়োজন। আমাদের সবারই জানা প্রয়োজন একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ দিনে ১৬.৫ মিলাগ্রাম বাতাস গ্রহণ করে।

যুক্তরাষ্ট্রের EPA (Environmental Protection Agency) এর প্রতিবেদন ২০১৮ অনুযায়ী বিশ্বে দূষিত বায়ুর দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান লক্ষ্যণীয় যা রীতিমত জনজীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ এবং এস.ডি.জি এর ৩ নম্বর অভীষ্ট Good Health এর Well Being অর্জনে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুরু মৌসুমের আবহাওয়া বায়ুদূষণ সহায়ক বিধায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি, সঠিক আইন প্রণয়ন ও এর প্রয়োগের মাধ্যমে সব ধরনের সেক্টর থেকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ নিঃসরণ কমানোর উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে বায়ু দূষণ কমানো সম্ভব।

পরিবেশ দূষণের আর একটা প্রধান অংশ হচ্ছে-মাটিদূষণ, পাহাড়কেটে সমতলে রূপান্তরে কেবলমাত্র মাটি সরে যাচ্ছে না, এতে জীববৈচিত্র্য ও হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। পাহাড়ে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রাণীর বিচরণ ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হচ্ছে। এদের খাদ্যেও উৎস কমে আসছে, যার ফলে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী কূল বিলুপ্তির সম্ভাবনা

দেখা দিয়েছে সেই সাথে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নষ্টের পাশাপাশি মাটি দূষণসহ পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

তাছাড়া নগরায়ন, রাস্তা ঘাট নির্মাণ, বাড়ি নির্মাণ, বৃক্ষ নিধন, বন অপসারণ, খনিজ সম্পদ আহরণের ফলে মাটি দূষিত হয়। বন্যার কারণে ও মাটিদূষণ ঘটে। বনভূমি ও আবাদী জমি একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। আবাদী জমিতে অত্যাধিক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে পরোক্ষভাবে আবাদী জমি অনুর্বর ও পতিত জমিতে পরিণত হতে সহায়তা করা হয়। তাই রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের ব্যবহারজনিত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাটি সংরক্ষণ বা মাটি দূষণ নিয়ন্ত্রণ আমাদের অবশ্যই করতে হবে।

শব্দ দূষণ ও তা নিয়ন্ত্রণে সুস্পষ্ট বিধিমালা রয়েছে। বিধিমালাটির কার্যকর বাস্তবায়ন প্রয়োজন। শব্দ দূষণের কারণে মানুষের শ্রবণশক্তি কমে যায় এবং তা বধিরতায় পরিণত হয়। ফলে এর প্রভাবে মানুষের পারিবারিক, সামাজিক এবং স্বাস্থ্যগত অবস্থার অবনতি হয়। এই দূষণের কারণে তৈরী রোগসমূহ হলো শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা (এজমা), হৃদযন্ত্রের সমস্যা (হৃদরোগ, উদ্বেগ, বিষন্নতা এবং ঘুমের ব্যাঘাত), বিকল্প শ্রবণশক্তি মানুষের মেধা বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। তাছাড়া শব্দ দূষণ মানুষের মেধা ক্ষয় ও যোগাযোগ দক্ষতা নষ্ট করে, শারীরিক ও মানসিক ভাবে অসুস্থ প্রজন্ম একটা দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেনা।

তাই সময় এসেছে, অসংলগ্ন বৃক্ষ নিধন, বন অপসারণ, অসম সার ও যত্রতত্র কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করা এবং জনগনকে পতিত জমি, সড়ক মহাসড়ক ও রেললাইনের পাশে বনায়নে সম্পৃক্ত করা। আর যেন শুনতে না হয় যেখানে সেখানে হর্ণ বাজানো। কলকারখানা, তেল পরিশোধনাগার মটরযান থেকে অনিয়ন্ত্রিত গ্যাস নিঃসরণ, অনাবশ্যক ধোঁয়া আর আমরা দেখতে চাইনা বাধ্যতামূলক করা হোক-প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্য তালিকায় পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষাক্রম।

এখন থেকে আমরা শপথ নেই-একটি ও আবর্জনা দিবো না ধরণীবুকে, তাহলেই আমরা গড়তে পারবো এক নির্মল পরিচ্ছন্ন সোনার বাংলাদেশ, উপহার দিতে পারবো আশাদীপ্ত আমার আগামী প্রজন্মকে।

আমার আপনার সবার সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মুক্ত ও সুন্দর বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব। দেশ গড়ার অঙ্গীকার রক্ষার প্রচেষ্টায় আমাদের এগিয়ে যেতে হবে-সামনে আরো সামনে।

## অণুজীবের মাধ্যমে বর্জ্যজল শোধন

ড. এস এম রফিকুজ্জামান\*

কৌশিক চক্রবর্তী\*\*

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। বাংলা সাহিত্য থেকে শুরু করে বাঙালির খাদ্যাভাস পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবদান রয়েছে আমাদের নদ-নদী, খাল-বিলসহ বিভিন্ন জলজ সম্পদের। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলাদেশের আবহমান গল্পে যে সব খরস্রোতা নদী আর হরেক রকম মাছের উল্লেখ পাওয়া যায়, একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের চিত্র অনেকটাই ভিন্ন। অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে গড়ে উঠেছে হাজারো কলকারখানা। আর সেই সব কলকারখানার বর্জ্য জল নির্দিধায় শোধন না করেই ফেলে দেওয়া হচ্ছে নদী, বিল বা অন্যান্য জলাশয়ে। জাতিসংঘ বিশ্ব পানি উন্নয়ন রিপোর্ট ২০১৭ অনুযায়ী বাংলাদেশে উৎপাদিত বর্জ্য জলের মাত্র ১৭ শতাংশ শোধন করা হয় যা এশিয়া প্যাসিফিকের দেশগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন।

বাংলাদেশে কলকারখানা থেকে নিঃসৃত বর্জ্য জলের অধিকাংশ নদীতে গিয়ে মেশে যা পরবর্তীতে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ে। এই হাজার হাজার গ্যালন বর্জ্য জলের প্রভাবে শুধুমাত্র নদী ও মৎস্য সম্পদই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, দূষিত হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানি এবং কৃষিজ শস্যও। ভারী ধাতু এবং বিভিন্ন বিষাক্ত উপাদানের উপস্থিতি ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের কৃষিজ শস্য এমনকি গরুর দুধেও লক্ষ্য করা গেছে। গাজীপুরের তুরাগ নদীর যে অবস্থা আমি দেখেছি তাতে কোনোভাবেই এটাকে নদী হিসাবে বিবেচনা করা যায়না। কালো পানি আর প্লাস্টিক-পলিথিনসহ অন্যান্য বর্জ্যের একটি নিক্ষেপনের মাধ্যম হয়েছে এই নদীটি। শুধু গাজীপুর নয় ঢাকা, ডেমরা, নারায়ণগঞ্জসহ শিল্পোন্নত শহরগুলোতে এই ধরনের জলাশয়ের চিত্র নতুন কিছু নয়। অতিরিক্ত পরিমাণ পানি দূষণের ফলে উন্মুক্ত জলাশয়ের পানি যেমন মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর বসবাসের জন্য অযোগ্য হয়ে পড়ছে আবার অন্য দিকে মানুষের গৃহস্থালি ব্যবহার ও সেচের জন্যও অব্যবহার্য হয়ে যাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বর্জ্য জলের অন্যতম উৎস শিল্প কারখানাগুলোতে এত মোটা অংকের আর্থিক বিনিয়োগ থাকা সত্ত্বেও কেন পরিশোধন ছাড়াই বর্জ্য জল নিঃসরণ করা হচ্ছে? অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারখানা মালিকদের দিকে আঙ্গুল তোলা হলেও সেটাই একমাত্র কারণ নয় বলে আমি মনে করি। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে দৈনিক ডেইলি স্টার পত্রিকায় একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় বাংলাদেশে ব্যবহৃত কেমিক্যাল বর্জ্য শোধন প্ল্যান্ট গুলো স্থাপন করতে খরচ করতে হয় প্রায় ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকা। একই রিপোর্টে বলা হয় যে প্রতি কিউবিক মিটার পানি শোধন করতে খরচ হয় প্রায় ২৪ টাকা। অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও বর্জ্য জল শোধনের প্ল্যান্টগুলো আমদানিকৃত হওয়ার ফলে তার স্থাপনা ও ব্যবস্থাপনা উভয়ই বেশ কষ্টসাধ্য। বর্জ্য জল বর্তমানে একটি বহুল আলোচিত সমস্যা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো দেশীয় উদ্যোগ শিল্প কারখানাগুলোকে একটি সহজলভ্য সমাধান (শোধনাগার) দিতে পারেনি।

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে কেমিক্যাল নির্ভর পরিশোধনকে পুরোপুরি নিরাপদ পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। তাই অণুজীবের মাধ্যমে বর্জ্য জল শোধন করলে তা একটি টেকসই সমাধান দিতে পারে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে একটি অণুজীব বর্জ্য জল শোধনাগার তৈরি বর্তমান বাংলাদেশের জন্য একান্তই প্রয়োজন কারণ তা যেমন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সাশ্রয়ী আবার পরিশোধিত জল বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার্য। তাই অতি সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ বায়োলজি ও অ্যাকোয়াটিক এনভায়রনমেন্ট বিভাগের গবেষণাগারে আমরা পরীক্ষামূলকভাবে অণুজীবের সাহায্যে বর্জ্য জল পরিশোধন করার চেষ্টা করি এবং প্রাথমিকভাবে সাফল্য পাই। যেকোনো ধরনের বর্জ্য জলেই অণুজীব বাস করে থাকে এবং সেই অণুজীবগুলো ওই বর্জ্য ভেঙেই তাদের পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে এবং তাই সঠিক অপটিমাইজেশনের মাধ্যমে সেই সকল অণুজীবের দ্বারা ওই ধরনের বর্জ্য জলকে শোধন করা সম্ভব। সেইরকম একটি তত্ত্ব থেকেই গবেষণাটি পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিকল্পিত অণুজীব বর্জ্য জল শোধনাগারটি শুধুমাত্র নিরাপদ পানির উৎসই হবেনা, সহজ স্থাপনা ও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বর্তমানে ব্যবহৃত পরিশোধন প্ল্যান্টগুলোর তুলনায় খরচ বাঁচাবে প্রায় ৮০ শতাংশ (প্রতি কিউবিক মিটার পানিতে)।

পরিকল্পিত অণুজীব বর্জ্য জল শোধনাগারের পরিশোধিত পানি দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র্য এবং পাশাপাশি উন্মুক্ত জলাশয় যেমন নদনদী, খালবিল ইত্যাদির পানির উচ্চতা কাক্ষিত পর্যায়ে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। এই প্ল্যান্টের পরিশোধিত পানি ব্যবহার করা যাবে সেচ কাজে (এমনকি অণুজীব পরিশোধিত পানিতে জৈবিক এসিডের উপস্থিতির কারণে তা উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে), গৃহস্থালি কাজে ও পানীয় হিসাবে। ২০৩০ বিশ্ব পানিসম্পদ গ্রুপের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে,

\*সহযোগী অধ্যাপক, ফিশারিজ বায়োলজি ও অ্যাকোয়াটিক এনভায়রনমেন্ট বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

\*\*এম এস ফেলো, ফিশারিজ বায়োলজি ও অ্যাকোয়াটিক এনভায়রনমেন্ট বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ ২০৩০ সাল নাগাদ গ্রীষ্মকালে পানির চাহিদা ভূগর্ভস্থ পানির তুলনায় প্রায় ৪০ শতাংশ বেশি থাকবে। পানি সংকটের এই বর্তমান অবস্থার জন্যও দায়ী করা যেতে পারে শিল্প কলকারখানাগুলোর অনিয়ন্ত্রিত ও যত্রতত্র পানির ব্যবহার। তাই যেহেতু এই প্ল্যান্টের পরিশোধিত পানি কলকারখানায়ও ব্যবহার করা যেতে পারে সুতরাং পানি সংকটের মত সমস্যা রোধ করতে অণুজীব বর্জ্য জল শোধনাগার অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করবে। আমরা সকলেই জানি বর্তমান সরকার সফলতার সাথে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) পূরণ করেছে এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এই অণুজীব বর্জ্য জল শোধনাগার এসডিজি অর্জন করতে ভূমিকা রাখবে যার মধ্যে অন্যতম ষষ্ঠ লক্ষ্যমাত্রা যেখানে বলা হয়েছে পানির প্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে এবং তেরোতম লক্ষ্যমাত্রা যেখানে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগকে যার মাধ্যমে পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব কমানো সম্ভব।

বাংলাদেশের এই সময়ে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা করা খুবই জরুরি। সেক্ষেত্রে অণুজীবের মাধ্যমে বর্জ্য জল পরিশোধন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। কারণ এটি শুধুমাত্র জলজ সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যই রক্ষা করবে না পাশাপাশি নিশ্চিত করবে পানির সুর্ত্ত ব্যবহারও। আর তাই সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সরকারি মন্ত্রণালয়গুলো যেমন মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় প্রভৃতির এ ব্যাপারে দ্রুত যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি এ সম্পর্কিত উদ্ভাবনগুলোকে উৎসাহিতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

## বায়ুদূষণ, বজ্রপাত এবং আমাদের মাতৃভূমি

আনজুম তাসনুভা\*  
এস, এম, তারিকুল ইসলাম\*

প্রাচীন মিশরীয়রা মনে করতো দেবতা টাইফন আকাশ থেকে বজ্রহানে। কথিত আছে গ্রীকদের জিউস, রোমানদের জুপিটার যখন মর্ত্যের কারো উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন তখনই বজ্র-বিজলীর আঘাত হেনে সে ক্রোধ প্রকাশ করেছেন। জুপিটারের বজ্রাস্ত্র তৈরি হতো দেব কর্মকার ভালকানের নিজস্ব অগ্নিকুন্ডে। প্রায় ২৫০০খৃষ্ট পূর্বাব্দের একটি সুমেরীয় সীলমোহরে দেখা যায় বিজলীর দেবী জারপেনিভ ও তাঁর স্বামী যুদ্ধে গেছেন বায়ু রথে চড়ে দুহাতে দু' গুচ্ছ বজ্রবান নিয়ে। এ-সব কিংবদন্তী থেকে মানুষের মনে বজ্র বিজলীর স্থানটি আঁচ করা যায়। আর এই ডিজিটাল যুগের বিজ্ঞানীরা দাবী করছেন বায়ু দূষণের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে বজ্রপাতের। কালো মেঘ সৃষ্টির পেছনে বাতাসে নাইট্রোজেন ও সালফারের বিভিন্ন যৌগের পরিমাণ বেড়ে যাওয়াকেই দায়ী করছেন বিজ্ঞানীরা।

বজ্রের চেহারা আর তর্জন গর্জন এমন যে তার প্রতি ভয়ভীতি মানুষের চিরন্তন। তবে এ বছর যেন সময়ের আগেই চোখ রাঙ্গাচ্ছে বজ্রপাত। আবহাওয়াবিদগণের মতে মৌসুমী বায়ুর আগমনে বাংলাদেশে এপ্রিল থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত বজ্রপাতের হার বেড়ে যায়। সাধারণত মার্চের শেষভাগ থেকে জুনের প্রথমভাগ পর্যন্ত বজ্রপাত আঘাত হানে। কিন্তু ২০১৯ সালে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গেল। সময় এগিয়ে এলো অনেক খানিই। এবছর ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই বজ্রপাতের তান্ডব শুরু হয়ে গেছে সারাদেশে। ফেব্রুয়ারীর মধ্যম ভাগে (১৬ই ফেব্রুয়ারী) সারাদেশে বজ্রপাতে প্রাণ হারায় দুইজন শিশু সহ মোট চারজন (প্রথম আলো, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯)। ২০১৬ সালের ১১ ও ১২ মে দুই দিনে বজ্রপাতে ৫৭ জন মারা যায় (প্রথম আলো, ১৪ মে, ২০১৬)। এরপর ঐ মাসের ১৭ তারিখে দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় বজ্রপাতকে জাতীয় দুর্ভোগ হিসাবে ঘোষণা করে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের একটি গবেষণায় জানা যায় ২০১০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা ১৮১১ জন। বাংলাদেশে প্রথম সারির চারটা দৈনিক পত্রিকার তথ্য মতে ২০১৮ সালে দেশে মোট ২১৪ জন মানুষ বজ্রপাতে প্রাণ হারায়। কিন্তু ভাবনার বিষয় হলো এই ২১৪ জনের মধ্যে ১১৮ জনই মারা যায় মে মাসে। অর্থাৎ ২০১০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত দেশে শুধু বজ্রপাতে মৃতের সংখ্যা দুই হাজার ছাড়িয়ে গেছে। আর এই নয় বছরে কেবল মে মাসেই মারা গেছে আট শতাধিক মানুষ (২ মে ২০১৮, সারাদেশ)। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. এম এ ফারুখ তার গবেষণায় বলেন প্রতি বছর বজ্রপাতে মৃত্যুর কমপক্ষে ৪০ শতাংশই ঘটছে মে মাসে। প্রাকৃতিক দুর্ভোগে মৃত্যুর পরিসংখ্যানে দেখা যায় বিশ্বে বজ্রপাতে মৃত্যুর এক চতুর্থাংশই ঘটে বাংলাদেশে।

সম্প্রতি সিজনালা ক্যালেন্ডার ভিত্তিক বজ্রপাত হটস্পট নির্ণয় এর উপর নাসা ও মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক যৌথ গবেষণা সু-সম্পন্ন হয়। মূলত স্যাটেলাইট থেকে নেওয়া দশ বছরের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এটা করা হয়েছে। গবেষণা দলের নেতৃত্বে ছিলেন নাসার বিজ্ঞানী স্টিভ গডম্যান। গবেষণার তথ্য মতে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কঙ্গোর কিনমারা ডেমকেপ এলাকায়, মার্চ থেকে মে পর্যন্ত বাংলাদেশের সুনামগঞ্জে এবং জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ভেনিজুয়েলার মরাকাইবো লেক এলাকায় বেশি বজ্রপাত আঘাত হানে। উক্ত গবেষণায় বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে বজ্রপাতের পরিমাণ বেশি হওয়ার পেছনে ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যকেই দায়ী করছেন বিজ্ঞানীরা।

ভারতের খাসি পাহাড় ও মেঘালয় এলাকায় মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত ঘন মেঘ জমে থাকে। স্তরীভূত মেঘে মেঘে ঘর্ষণের ফলে পাদদেশে অবস্থিত সুনামগঞ্জে বজ্রপাতের পরিমাণও বেশি। প্রতি বছর মার্চ মাসের শেষের দিকে বোরো ধান কাটতে হাওরে বেশি সংখ্যক মানুষ থাকায় বজ্রপাতে হতাহতের ঘটনা যেন বেশিই ঘটছে। বজ্রপাতে প্রানহানির ৯৪% হচ্ছে গ্রামীণ জনপদে। তার মধ্যে উন্মুক্ত স্থানে মারা যাচ্ছে ৮৬% মানুষ (সুত্রঃ বাকুবি, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. এম এ ফারুখ)। কৃষক, শ্রমিক ও জেলে পেশার মানুষেরাই বলি হচ্ছে বজ্রপাতের। কৃষি জমিতে ব্যবহৃত হচ্ছে ভারী ধাতব কৃষি যন্ত্রাংশ যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বজ্রপাতকে ওই জায়গায় টেনে নেওয়ার ব্যাপারে। তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক কলিন প্রাইস তার “থান্ডারস্টর্ম লাইটেনিং অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ” শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে বলেন “বায়ুদূষণ এর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে বজ্রপাতের” টেক্সসের অ্যা অ্যান্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী নাসার কারিগরি সহায়তায় গবেষণা চালিয়ে দেখতে পেয়েছেন, বজ্রপাতের পরপরই ট্রপোসফিয়ারে (বায়ু মন্ডলের সর্বনিম্ন স্তর) প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন অক্সাইড (নাইট্রিক অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড) তৈরী হয়। কার্বন ডাই অক্সাইড ও কার্বন মনোঅক্সাইডের চেয়েও বিষাক্ত এ নাইট্রোজেন অক্সাইড রূপান্তরিত হয় ওজোন গ্যাসে। সেই গ্যাস বাতাসের এমন একটি স্তরে জমে থাকছে যে এর ফলে দূষণের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। এ বিজ্ঞানীদল তাদের গবেষণা পত্রে বলেছে বজ্রপাতের ফলে সৃষ্ট দূষিত অক্সাইড পরিবেশ দূষণের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই গবেষক দলের প্রধান ড. রেনি ঝাং-এর মতে বজ্রপাত যেমন বায়ু দূষণের মাত্রা বাড়ছে,

\*সহকারী অধ্যাপক, ইন্সটিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়



তেমনি আবার দূষণের ফলে বাড়ছে বজ্রপাতের হার। যেন এক গোলক ধাঁধা। তার মতে “বজ্রপাতের ফলে সৃষ্ট দূষিত বায়ু পরিবেশ দূষণের মাত্রাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। যানবহনের কারণে বা শিল্প দূষণের চেয়ে বজ্রপাতজনিত দূষণের মাত্রা অনেক বেশি। বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী ‘সায়েন্স’ এর এক প্রবন্ধে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার বজ্রপাত বিষয়ক গবেষক ডেভিড রম্প বলেন জ্বালানীর ব্যবহার বৃদ্ধি, অত্যাধিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ব্যবহার ও গ্রীন হাউজ গ্যাসের নির্গমন বৃদ্ধির কারণে ভূমন্ডলে নাইট্রোজেন অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। এই গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে বজ্রপাতের হার কমতে পারে। রম্প আরও বলেন ২০০০ সালে যেখানে বছরের একটি নির্ধারিত সময়ে দুইবার বজ্রপাত রেকর্ড করা হয়েছে, সেখানে এখন ঐ একই সময়ে তিনবার বজ্রপাত হচ্ছে। আর এজন্য তিনি বায়ু দূষণকেই দায়ী করছেন। অপর দিকে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞ মশিউর রহমান এর মতে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে মূলত বজ্রপাত বাড়ছে। তাঁর মতে “জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গত ৪০ বছরে বাংলাদেশের তাপমাত্রা শূন্য দশমিক ৭ ডিগ্রী বৃদ্ধি পেয়েছে। তাপমাত্রা এক ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে ২০ শতাংশ বজ্রপাত বৃদ্ধি পায়। এ হিসাবে বাংলাদেশে বজ্রপাত প্রায় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির পেছনে গ্রীন হাউজ গ্যাসের অধিক নির্গমনকেই দায়ী করেছেন তিনি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর অ্যাটমোস্ফেরিক রিসার্চের বিজ্ঞানী ডেভিড এডওয়ার্ডস ও তার গবেষক দল কানাডা ও ইউরোপের বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গবেষণা করে দেখতে পেয়েছেন বায়ুমন্ডলের কাছাকাছি যেখানেই ওজনের পরিমাণ বেশি, সেখানে বজ্রপাত হওয়ার পরিমাণও বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে বায়ুমন্ডলের নিচের স্তরে ওজনের পরিমাণ বাড়ার ফলই বজ্রপাত। বজ্রপাত আর বায়ুদূষণ যেন একে অপরের সাথে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িত।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খোলা জায়গা ও ডোবা-জলাশয় ভরাট, বনজঙ্গল কমে যাওয়া, বিশেষত তাল, সুপারি, নারকেল গাছের মতো উচু গাছপালাহাসের কারণে বজ্রপাতে প্রাণ হানি বেড়ে যাচ্ছে। এ সব বজ্রনিরোধক প্রাকৃতিক “টাওয়ার ব্লক” এর বজ্রপাতকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর প্রাকৃতিক ক্ষমতা রয়েছে। “আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৬” উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বজ্রপাত থেকে বাঁচতে বেশি করে তালগাছ লাগানোর পরামর্শ দেন। বর্তমানে দেশব্যাপী ১০ লাখ তাল গাছ লাগিয়ে বজ্রপাতজনিত মৃত্যু ঠেকানোর সবচেয়ে কার্যকর স্থানীয় প্রযুক্তি ব্যবহারের পদক্ষেপ নিয়েছেন সরকার। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এসকল গাছপালা বড় হলে বজ্রপাতে মৃত্যু কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে।

## বায়ুদূষণ: যে কারণে ঢাকার বায়ুমানের অবনতি ঘটছে

অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার\*

বায়ু আমাদের বেঁচে থাকার এক অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু প্রতিনিয়তই আমরা আমাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দূষিত করছি বেঁচে থাকার এই মূল্যবান উপাদানটিকে। বায়ুতে নিজ উপাদানের অতিরিক্ত বা অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু যেমন: পার্টিকুলেট ম্যাটার (PM2.5 I PM10), কার্বন মনোক্সাইড (CO), সালফার অক্সাইডসমূহ (SOX) এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ (NOX) মিশ্রিত হয়ে বায়ুর গুণাগুণ নষ্ট হওয়ার ঘটনাই বায়ু দূষণ। এই পার্টিকুলেট ম্যাটার গুলোর আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ও আন্তর্জাতিক ক্যান্সার সংস্থা (IARC) চগ২.৫ কে “জি-১ কার্সিনোজেন” তালিকাভুক্ত করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের হেলথ ইফেক্টস ইনস্টিটিউট ও ইনস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিঙ অ্যান্ড ইমপালুয়েশন এর যৌথ উদ্যোগে State of Global Air-২০১৯ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের দশটি দেশের মধ্যে বায়ু দূষণে মৃত্যুর সংখ্যায় পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। রিপোর্টে বিশ্বব্যাপী মৃত্যুহারের জন্য পঞ্চম ঝুঁকির কারণ হিসেবে বায়ু দূষণকে দায়ী করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী বায়ু দূষণ বিশ্বব্যাপী প্রায় ৫ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যুর কারণ। প্রতিবেদনে দক্ষিণ এশিয়াকে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত অঞ্চল হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং আরো বলা হয় উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলি চার থেকে পাঁচ গুণ বেশি চগ২.৫ দূষণের শিকার হয়। বায়ু দূষণ বিশ্বব্যাপী গড় আয়ু ১ বছর ৮ মাস কমিয়ে ফেলে, যেখানে দক্ষিণ এশিয়ার গড় আয়ু আরোও কমে গিয়ে ১ বছর ৭ মাসে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বের অনেক অংশে বায়ু দূষণের মাত্রা অত্যন্ত বিপজ্জনক। World Health Organization (WHO) এর তথ্যানুযায়ী ৯০% মানুষ দূষিত বায়ু গ্রহণ করছে। ফলস্বরূপ, প্রতি বছর প্রায় ৭ মিলিয়ন মানুষ বহিরাগত বায়ুদূষণ এবং গৃহস্থলীর বায়ু দূষণের পার্টিকুলেট ম্যাটারের এক্সপোজারের কারণে মারা যায়। এগুলির মধ্যে, বহিরাগত বায়ু দূষণের কারণে ৪.২ মিলিয়ন মানুষ মারা যায়। বায়ু দূষণের কারণে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অঞ্চলে প্রায় ২ মিলিয়ন মানুষ মারা যায়। WHO এর “Don't pollute my future!!” রিপোর্টের তথ্যানুযায়ী, সারাবিশ্বে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত বায়ু দূষণের ফলে প্রতিবছর ৫ বছর বয়সের নিচে ৫ লাখ ৭০ হাজার শিশু শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ, যেমন নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগের কারণে মারা যায়। সর্বশেষ Air Quality Database-২০১৮ অনুসারে, মধ্যম আয়ের দেশগুলোর ৯৭% শহরের বায়ু মান WHO এর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেছে। WHO এর তথ্যানুযায়ী প্রতিবছর বায়ু দূষণের ফলে ২১% নিউমোনিয়া, ২০% স্ট্রোক, ৩৪% হৃদরোগ, ১৯% COPD এবং ৭% ফুসফুসের ক্যান্সারের কারণে মারা যায়। আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত Cancer Facts & Figures-২০১৮ এর তথ্যানুযায়ী ২০১৮ সালে প্রায় ৬,০৯,৬৪০ জন ক্যান্সার রোগী মৃত্যুর ঝুঁকিতে ছিল। এছাড়াও শুধুমাত্র শ্বাসতন্ত্রের ক্যান্সারে আক্রান্ত নতুন রোগীর সংখ্যা প্রায় ২৫৩২৯০ জন এবং শ্বাসতন্ত্রে ক্যান্সারে আক্রান্ত মৃত ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় ১৫৮৭৭। National Institute of Cancer Research & Hospital (NICRH) এর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে ২০১৮ সালে মোট ২৬৯ জন ক্যান্সারের কারণে মারা যায়, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী মৃত্যু হয়েছে ফুসফুস ক্যান্সারে (৫৪ জন)। UNICEF এর এক গবেষণা অনুযায়ী বিশ্বে ৩০ কোটি শিশু দূষিত বায়ু অধ্যুষিত এলাকায় বাস করে, যার মধ্যে ২২ কোটিই দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাস করে।

যুক্তরাষ্ট্রের সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান এয়ারভিজ্যুয়ালের বিশ্বমান প্রতিবেদন ২০১৮ অনুযায়ী শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান দ্বিতীয়। ২০১৮ সালে বাংলাদেশের বাতাসে চগ২.৫ এর গড় মানমাত্রা ৯৭.১ ট্রান্স/স৩। বিশ্বে প্রত্যেকটি দেশ বায়ু দূষণের কবলে রয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানের এয়ারভিজ্যুয়ালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি দূষিত বায়ুর দেশ গুলোর তালিকায় রয়েছে এশিয়া এবং মধ্য প্রাচ্যের ১০টি দেশ। বিশ্বের ৭৩টি দেশের বায়ুর মানের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। চগ২.৫ এর গড় মান মাত্রার উপর নির্ভর করে এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান The Norwegian Institute for Air Research (NILU) এর সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর ২০১৬ সালে বায়ুদূষণের উৎস চিহ্নিত বিষয়ক এক গবেষণা করে। গবেষণা অনুযায়ী বায়ু দূষণের জন্য দায়ী উৎস সমূহের পরিমাণ যথাক্রমে ইটের ভাটা ৫৮ শতাংশ, যানবাহনের ১০ শতাংশ, অন্যান্য ৩২ শতাংশ। এসব উৎস থেকে নির্গত হচ্ছে পার্টিকুলেট ম্যাটার (PM), কার্বন মনোক্সাইড (CO), সালফার অক্সাইডসমূহ (NOX) এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ (SOX) যা দূষিত করছে বায়ুকে। ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় অপরিকল্পিত ভাবে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, ড্রেনেজ ও রাস্তাঘাট উন্নয়ন, মেরামত এবং সংস্কারের কার্যক্রমের নামে রাস্তা-ঘাট খোঁড়া-খোঁড়াখুঁড়ির কারণে বায়ুতে পার্টিকুলেট ম্যাটার মিশ্রিত হয়ে যায়। ড্রেন পরিষ্কারের পর বর্জ্য সমূহ রাস্তার পাশে স্তুপ করে রাখা

\*বিভাগীয় প্রধান, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

হয় যা বায়ু দূষণের জন্য দায়ী। উপরন্তু ড্রেনের বর্জ্য প্যাথজেনের উপস্থিতি থাকার দরুন নির্মল বায়ু হয়ে ওঠে অস্বাস্থ্যকর। এছাড়া বর্জ্য পোড়ানো অন্যান্য কলকারখানার কর্মকাণ্ডের কারণে বায়ুতে সীসা, ফরমালডিহাইড, তামা, সীসা ও ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি মিশে বায়ুকে দূষিত করেছে। স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ ও ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে ২০১৭ সালে ঢাকার ১২টি স্থান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে একটি গবেষণা করা হয়। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, ঢাকার বায়ুতে চগ২.৫ এর পরিমাণ আদর্শ মানমাত্রার চেয়ে অনেকাংশে বেশী। একই বিভাগের অপর এক গবেষণায় বায়ুতে মিশে থাকা মাইক্রোফ্লোরা (ব্যাকটেরিয়া) এর উপস্থিতি পাওয়া যায়। এই গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি স্থানের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। নমুনা গুলোতে মোট ২৬৮১ সংখ্যক ফাঙ্গাল কলোনির উপস্থিতি পাওয়া যায়। এসকল মাইক্রোফ্লোরা (ব্যাকটেরিয়া) মানবস্বাস্থ্যে ও গাছপালার উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ ৩টি উপজেলার (ধামরাই, সাভার, কেরানীগঞ্জ) ইটের ভাটা সাথে চগ২.৫ বৃদ্ধির সম্পর্ক নিয়ে অন্য একটি গবেষণা করে। গবেষণানুযায়ী ২০০৬, ২০১০, ও ২০১৮ সালে ইটের ভাটার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩০৭, ৪৯৭ ও ৫৫১ টি। ২০০৬ সালে ধামরাই, সাভার ও কেরানীগঞ্জ উপজেলার গড় বাৎসরিক PM2.5 এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৮.৬ ক্রম/m3, ৫৮.৬ ক্রম/m3, ৫৭.৭ ক্রম/m3 ২০১০ সালে ধামরাই, সাভার, কেরানীগঞ্জ উপজেলার গড় বাৎসরিক চগ২.৫ এর পরিমাণ যথাক্রমে ৫৮.৬ ক্রম/m3, ৫৮.৬ ক্রম/m3, ৫৭.৭ ক্রম/m3 এবং ২০১৬ সালে ধামরাই, সাভার ও কেরানীগঞ্জ উপজেলার গড় বাৎসরিক PM2.5 এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৪.৮ ক্রম/m3, ৬৪.৫ ক্রম/m3, ৬৩.১ ক্রম/m3। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বাংলাদেশ ও WHO এর মানমাত্রার প্রায় তিন বা চার গুণ বেশি।

ইট ভাটার দূষণ রোধে রয়েছে “ইট প্রস্তুত ও ইট ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ আইন) ২০১৩। এই আইনের ৬ নং ধারা অনুযায়ী-জ্বালানী কাঠের ব্যবহার নিষিদ্ধ: আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করিতে পারিবেন না। ধারা ৬ লঙ্ঘনকারীর দণ্ড যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৬ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া, ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করেন। তাহা হইলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। ৭ নং ধারা অনুযায়ী-কয়লার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ: আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত সালফার, অ্যাক্স, মারকারি বা অনুরূপ উপাদান সম্বলিত কয়লা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন না। ধারা-৭ লঙ্ঘনকারীর দণ্ড: যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৬ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া, ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানী হিসেবে নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত সালফার, অ্যাক্স, মারকারি বা অনুরূপ উপাদান সম্বলিত কয়লা ব্যবহার করে, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া রোধে “বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫” এর ধারা ৬ এর উপধারা (১) অনুযায়ী “স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণকারী যানবাহন চালানো যাইবা না বা ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণ বন্ধ করার লক্ষ্যে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কোনোভাবে উক্ত যানবাহন চালু করা যাইবে না”। ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘনকারীর প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড; দ্বিতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০(দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দেওয়া হবে। বায়ু দূষণ রোধে ইট তৈরিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও কম সালফারযুক্ত কয়লার ব্যবহার করতে হবে। ইট ভাটার দূষণ রোধে ইট প্রস্তুত ও ইটভাটা স্থাপন আইন মেনে চলতে হবে। ডিজেলের পরিবর্তে সিএনজি গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধি, উন্নত প্রযুক্তির ইলেক্ট্রিক বা হাইব্রিড গাড়ি ব্যবহার বৃদ্ধি ও ফিটনেস বিহীন যানবাহন ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। ব্যক্তিগত গাড়ী ব্যবহার কমিয়ে পাবলিক পরিবহন ব্যবহারের প্রতি সবাইকে আহ্বান করতে হবে। সাইকেল লেইন এর ব্যবস্থা করে মানুষকে সাইকেল ব্যবহারের প্রতি আহ্বান করতে হবে। প্রত্যেকটি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ থাকে। আমাদের সেই বাজেট বায়ু দূষণ রোধে কাজে লাগাতে হবে। বায়ু দূষণ রোধে আমাদের কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে, সবার আগে দূষণের উৎসগুলো চিহ্নিত করে দূষণ কমিয়ে আনতে হবে।

## পরিবেশ উন্নয়নে শেখ হাসিনার অবদান অপারিসীম-নিবেদন নিরন্তর

জেড.এম. কামরুল আনাম\*

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। বিশ্বজুড়ে পরিবেশ সুরক্ষায় বাংলাদেশের ভূমিকা প্রশংসিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে জাতিসংঘের ‘চ্যাম্পিয়নস অব দি আর্থ’ পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। প্রতিবেশগতভাবে নাজুক অবস্থায় থাকা বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের ‘সামগ্রিক পদক্ষেপের স্বীকৃতি’ হচ্ছে এই পুরস্কার।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশের প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের আন্তর্জাতিক পুরস্কার বা স্বীকৃতি আমাদের জন্য আনন্দের। আমাদের জানা আছে, গ্লোবাল ভিলেজ কনসেপ্টের জন্য পুরো পৃথিবী এখন প্রায় এক ছাতার নিচে অবস্থান করছে। বিশেষ করে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও পরিবেশ ইস্যুতে এখন প্রায় সারাবিশ্ব এক সুতোয় গাঁথা। অর্থনীতি, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বের সব দেশ কমবেশি এক সুতোয় গাঁথা আগে থেকেই। গত প্রায় দুই যুগে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও পরিবেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মতো একটি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর এরকম অর্জন আমাদের সামনে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা জোগায়।

নিজের বা সরকারের কাজের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুরস্কার প্রাপ্তি নতুন কিছু নয়। এর আগেও তিনি একাধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন। ২০১০ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) অংশ হিসেবে শিশুমৃত্যু হার কমানোর সাফল্যের জন্য জাতিসংঘের পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৯৯৯ সালে ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (এফএও) কর্তৃক ‘সেরেস পদক’ লাভ করেন তিনি। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো শেখ হাসিনাকে ১৯৯৮ সালে ‘ফেলিউ হুফে বইনি’ শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে। আমাদের মহান শহীদ দিবস বা একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে আজ সারা বিশ্বে যে উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হচ্ছে তার পেছনেও শেখ হাসিনার অবদান উল্লেখ করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন ইউনিভার্সিটি, জাপানের ওয়াসেদা ইউনিভার্সিটি, অস্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিসহ বিশ্বের একাধিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শেখ হাসিনাকে ডক্টর অব লজ উপাধি প্রদান করেছে। ২০০৫ সালে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শান্তির স্বপক্ষে অবদান রাখার জন্য শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি অব রাশিয়া। রয়েছে শেখ হাসিনার এরকম অসংখ্য অর্জন আমাদের গৌরবান্বিত করে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার বা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বহু কার্যকর উদ্যোগ ও পদক্ষেপ রয়েছে। বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিতকরণে তিনি যেমন দেশের অভ্যন্তরে নানা ভূমিকা রাখছেন তেমনি জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাংলাদেশ ও দেশের মানুষকে রক্ষা করতে সব সময় সক্রিয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন গত সরকারের আমলে দেশে জলবায়ু ট্রাস্ট গঠিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বে জলবায়ু বিষয়ক বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশের নেতৃত্বদান শেখ হাসিনার বিচক্ষণতার প্রমাণ দেয়।

জলবায়ুর পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বে একটি মারাত্মক হুমকিরূপে আবির্ভূত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশসহ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো। গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতাবৃদ্ধি ও সাগরপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বিশ্বজুড়েই দুর্যোগের মাত্রা ও পরিমাণ বাড়ছে। ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধ্বস, খরা-বন্যাসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত হচ্ছে মানুষ।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে দুর্যোগের আশঙ্কা বেড়ে যাওয়ায় বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে বিষয়টি ব্যাপক গুরুত্ব পাচ্ছে। পরপর কয়েকটি জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো এক্যবদ্ধ হয়েছে।

পরিবেশ রক্ষায় শেখ হাসিনার পদক্ষেপের কথা সর্বজনবিদিত। সরকারে থাকুন আর না থাকুন, বৃক্ষরোপণে শেখ হাসিনার যে উৎসাহ এবং বৃক্ষনিধন রোধে যে পদক্ষেপ তা আশাব্যঞ্জক। প্রতিটি নাগরিকের বাড়ি ও আশপাশে একটি করে বনজ, ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণের যে আন্দোলন আজ দৃশ্যমান তার শুরুরটা শেখ হাসিনাই করেছেন। আজ দেশে খাল-বিল, নদী-নালা, জলাধার সংরক্ষণে যে আন্দোলন চলছে তা এগিয়ে নেওয়ার কৃতিত্ব শেখ হাসিনার। দেশব্যাপী নদী বা খাল বা জলাধার উদ্ধারে শেখ হাসিনা সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সচেতন থাকতে হবে আমাদেরকেও। সচেতন হতে হবে সবাইকে। পরিবেশগতভাবে নিরাপদ সত্যিকারের সোনার বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য নিবেদিত থাকতে হবে সবাইকে নিরন্তর।

\*কলামিস্ট ও চেয়ারম্যান, সোনাগাজী উপজেলা পরিষদ, ফেনী



## আশ্চর্যজনক ঘাস বিনাঘাস

মো. গোলাম মওলা\*  
মোহা. আব্দুল কুদ্দুস মিয়া\*\*

### ভূমিকা

বিনাঘাস Poaceae পরিবারভুক্ত একটি বহুবর্ষজীবী ঘাস। এই ঘাসের বৈজ্ঞানিক নাম *Vetiveria zizanioides* (L.) Nash. সারা পৃথিবীতে *Vetiveria* গণের অধীন ১১টি প্রজাতি (Species) রয়েছে। বাংলাদেশে *Vetiveria zizanioides* (N) Nash নামে একটিমাত্র প্রজাতি পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এটা বিভিন্ন নামে পরিচিত। ময়মনসিং, কিশোরগঞ্জ ও বৃহত্তম সিলেট জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিনাছোবা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বিয়ানা, বৃহত্তম কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলায় চেঙ্গামুরা বা চেঙ্গামুরী এবং দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে বিনা অথবা বিনাজার ইত্যাদি নামে পরিচিত। এটি সাধারণত ছোবা বা ঝোড়ের মতো জন্মায় এবং প্রায় ২ মিটার লম্বা হয় এবং শিকড় মাটির ৩ মিটার গভীর পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। এদের শিকড় তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে। এর পাতা আখের পাতার মতো খুবই সরু। কাণ্ড সাধারণত শক্ত। জুন থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে ফুল ও ফল হয়।

### বিস্তৃতি

পৃথিবীব্যাপী প্রায় ৭০টি দেশে বিনাঘাস পাওয়া যায়। এ ঘাসের প্রায় ১১টি প্রজাতি রয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি প্রজাতি অস্ট্রেলিয়ায়, একটি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়, দুইটি আফ্রিকায়, একটি মোরিতাস ও আশেপাশের দ্বীপপুঞ্জে, একটি দক্ষিণ ভারতে, একটি পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকায় বিনাঘাস পাওয়া যায়। তবে ঢাকা, গাজীপুর, মানিগঞ্জ এবং নরসিংদীতে এর আধিক্য বেশী। বরেন্দ্র এলাকা যেমন নওয়াবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁও, বগুড়া, দিনাজপুর, সুনামগঞ্জ, সিলেট, সাতকানিয়া এবং চট্টগ্রামেও প্রচুর বিনাঘাস পাওয়া যায়। টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং গাজীপুরের শাল বনের ভিতর গাছের ছায়ায় বিনাঘাস পাওয়া যায় না। সুন্দরবনেও এটা পাওয়া যায় না। দক্ষিণের জেলাসমূহ যেমন খুলনা, সাতক্ষিরা, বাগেরহাট, বরগুনা, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল এবং কক্সবাজারে সাধারণত এটা অল্পবিস্তার পাওয়া যায়।

### বাসস্থান

বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে যেমন খরা, বন্যা, জলোচ্ছাস, জলাবদ্ধতা ও ঝড়ো পরিবেশে এটি টিকে থাকতে পারে। আবার অল্প, ক্ষার ( $pH ৭.০-১০.৫$ ) এমনকি অনূর্বর মাটিতেও জন্মাতে ও টিকে থাকতে পারে। বিনাঘাস ২০০ মি.মি. থেকে ৫০০০ মি.মি. বৃষ্টিপাত এবং শূন্য ডিগ্রি সে. থেকে ৫০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় টিকে থাকতে পারে। তবে বরফের মধ্যে এটা জন্মাতে বা টিকে থাকতে পারে না।

### বংশবিস্তার

আমাদের দেশে বিনাঘাস প্রাকৃতিকভাবে জন্মালেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এটা চাষ করা হয়। সাধারণত যৌন ও অযৌন উভয়ভাবেই এর বংশবিস্তার হতে পারে। তবে যৌন প্রজননের হার খুবই কম। মূলত অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমেই এর বংশবিস্তার হয়ে থাকে। অঙ্গজ প্রজননের ক্ষেত্রে বিনাঘাসের যে অংশ ব্যবহৃত হয় সেগুলো হলো কুশি বা টিলার, কাটিং, ক্রাম্প বা ঝাড় ইত্যাদি। টিস্যু কালচারের মাধ্যমেও এর বংশবিস্তার ঘটানো যায়।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের এক গবেষণায় দেখা যায় এক কুশি, দুই কুশি এবং তিন কুশির মাধ্যমে রোপিত বিনা ঝাড়ের নার্সারী থেকে এক বছর পর দুই কুশির ঝাড়ে সর্বাধিক ৮১ টি কুশি পাওয়া যায়। দুই কুশির ঝাড়ে জীবিত থাকার হার সর্বাধিক (৯৬.৭৯%)। তার পরের অবস্থান যথাক্রমে তিন কুশির ঝাড় (৯১.৬৭) এবং এক কুশির ঝাড় (৭৩.৭৯)। এক কুশি, দুই কুশি এবং তিন কুশির ঝাড়ে গড়ে বার্ষিক কুশি বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে ১০.২১%, ১৬.৯৯% এবং ১৪.০২%। জীবিত থাকার হার, বার্ষিক কুশি বৃদ্ধির হার এবং প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কুশির পরিমাণ বিবেচনায় দুই কুশির ঝাড় নার্সারিতে রোপনের মাধ্যমে বিনাঘাসের বংশবিস্তার উত্তম বলে পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিবেচিত হয়েছে।

### বিনাঘাসের ব্যবহার

হাজার বছর ধরে বিনাঘাস বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর বহুবিধ ব্যবহারের কারণে এটিকে আশ্চর্যজনক ঘাস বলা হয়ে থাকে। নিম্নে বিনা ঘাসের ব্যবহার উল্লেখ করা হল।

\*বিভাগীয় কর্মকর্তা, প্লাস্টেশন ট্রায়েল ইউনিট বিভাগ, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, বরিশাল

\*\*ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর, প্লাস্টেশন ট্রায়েল ইউনিট বিভাগ, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, বরিশাল

## ১। মাটি ক্ষয়রোধে বিন্নাঘাস

মাটি ক্ষয়রোধে বিন্নাঘাস সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে বলে এটাকে Soil blinder বলা হয়ে থাকে। অনেক উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ যেমন অস্ট্রেলিয়া, চীন, ভারত, মালয়েশিয়া, স্পেন, থাইল্যান্ড এবং জিম্বাবুয়ে ভূমি ক্ষয়রোধে বিন্নাঘাস ব্যবহার করে থাকে। মালয়েশিয়াতে মাটি ক্ষয়রোধে মহাসড়কের পাশে বিন্নাঘাস লাগানো হয়। এর শিকড়ের সূক্ষ্ম আরকিটেকচারাল গঠনের কারণেই মাটি ক্ষয়রোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। বিন্নাঘাসের শিকড় অনেক সূক্ষ্ম, শক্ত, ঘন এবং মাটির অনেক গভীরে চলে যেতে পারে। ফলে বিন্নাঘাস পানি প্রবাহের গতি কমিয়ে দেয় এবং মাটি ধরে রাখে। বুয়েটের এক পরীক্ষায় দেখা যায় বিন্নাঘাসের শিকড়যুক্ত মাটির সয়েল ব্লাইন্ডিং ক্ষমতা (Shear strength) শিকড় বিহীন মাটির তুলনায় প্রায় ৮-৭ গুণ বেশী। বিন্নাঘাসের তৈরী বেড়া (Hedge) প্রায় ১০০ বছর পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে। মাটি ক্ষয়রোধে বিন্নাঘাস ব্যবহার করলে একদিকে যেমন খরচ কম হবে অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

## ২। অন্যান্য ব্যবহার

### (ক) আর্থসামাজিক ব্যবহার

- অল্পবয়স্ক সবুজ, সতেজ পাতা গৃহপালিত পশু যেমন-গরু, ঘোড়া এবং ছাগলের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী পরিপক্ব এবং শুকনা বিন্নাঘাস দিয়ে ঘরের ছাউনি দিয়ে থাকে।
- গরু ছাগলের উৎপাত বা উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য সবজির বাগান এবং শস্যক্ষেতের চারিদিকে বেড়া হিসেবে বিন্নাঘাস লাগানো হয়। এছাড়া পাশাপাশি দুই মালিকের ক্ষেতের চারদিকে বিন্নাঘাস লাগিয়ে সীমানা ঠিক রাখা হয়।
- নার্সারি এবং পানের বরজে ছায়া তৈরির জন্য বিন্নাঘাস ব্যবহার করা হয়।
- গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী শুকনা বিন্নাঘাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে রান্না-বান্না এমনকি শীত নিবারণ করে থাকে।
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে বিন্নাঘাস ব্যবহৃত হয়।
- ফলের স্টক দিয়ে হাতপাখা তৈরি করা হয়।
- বিন্নাঘাস দিয়ে ঝাড়ু তৈরি করা হয়।
- মাদুর, বুড়ি এবং মাথার টুপি তৈরি করা হয়।
- কান্ড দিয়ে মাছ ধরার জন্য ভাসমান ফেতনা অথবা টোন তৈরি করা হয়।
- পল্লী এলাকায় অল্প পরিসরে খেলনা তৈরি করা হয়।
- কাগজ তৈরির কাঁচামাল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।
- থাইল্যান্ডে বিভিন্ন কুটিরশিল্পে এটা ব্যবহৃত হয়।
- কম্পোস্ট সার তৈরিতে এটা ব্যবহৃত হয়।

### (খ) সাংস্কৃতিক ব্যবহার

- হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তাদের পূজা আর্চনার সময় ধর্মীয় গুরুদের বিন্নাঘাসের তৈরি মাদুরে বসতে দেন এবং মাদুরের ওপর ফল, দুধ ও মিষ্টি ইত্যাদি রেখে দেন। উৎসবের পর ধর্মগুরু সবাইকে ফল, দুধ ও মিষ্টি বিতরণ করেন।
- মালেশিয়ায় বিন্নাঘাসের শিকড় দিয়ে খাসু খাসু নামক তরকারি রান্না করা হয়।

### (গ) ঔষধি ব্যবহার

- বিন্নাঘাসের শিকড়ের নির্যাস থেকে ক্ষুধাবর্ধক, আলসার নিরাময়ক এবং রক্তের বিভিন্ন রোগ নিরাময়কারী ওষুধ তৈরি করা হয়।
- বিন্নাঘাসের রস শুক্রমেহ এবং মাথা ব্যথা নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।
- বিন্নাঘাসের শিকড় দিয়ে পানিতে পেস্ট তৈরি করে জ্বরের সময় তাপমাত্রা কমানোর জন্য বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করা হয়।
- বিন্নাঘাসের পেস্ট মাংসপেশীর ব্যথা কমানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।
- গিনিতে বিন্নাঘাসের শিকড়ের নির্যাস টনিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

### (ঘ) প্রসাধনী হিসেবে ব্যবহার

- শিকড়ের নির্যাস থেকে খুস-খুস নামক প্রসাধনী তৈরির জন্য বানিজ্যিকভাবে বিন্নাঘাসের চাষ হয়ে থাকে।
- বিন্নাঘাস থেকে সুগন্ধি তৈল উৎপাদন করা হয়।
- মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে বিন্নাঘাস সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ ঘাসের শিকড় পানি শোষণ করে মাটির আর্দ্রতা রক্ষা করে। এছাড়া খনিজ ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান শোষণ করে মাটির উর্বরতা রক্ষা করে।

### উপসংহার

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার আয়তন ৪৭,২০১ বর্গ কিলোমিটার। মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৮% লোক উপকূলীয় এলাকায় বসবাস করে। ১৭৯৭ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬০টি ভয়াবহ সাইক্লোন বাংলাদেশে আঘাত করে। উপকূলীয় এলাকার জনগণের জ্ঞান মাল রক্ষার্থে বন্য, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা কমিয়ে আনার জন্য প্রায় ৪০০০ কিলোমিটার বেড়িবাধ তৈরী করা হয়। বেড়ি বাধগুলো রক্ষায় সাধারণত কংক্রিট ব্লক, পাথর অথবা কাঠের রিভেটমেন্ট, বালির বস্তা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল, কম কার্যকরী এবং পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। অন্যদিকে মাটি ক্ষয়রোধে বিনাঘাস লাগানো অধিক কার্যকরী এবং পরিবেশ বান্ধব।

বিনা ঘাসের চিত্র:



চিত্র: বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এর ২৪ নং ওয়ার্ডে জিয়া সড়কের পার্শ্বে বিনা ঘাস (ছবি মো. গোলাম মওলা)



চিত্র: বিনা ঘাস (ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত)

## আমরা কোন অবস্থানে দাঁড়িয়ে?

রাসনা শারমিন মিথি\*

জলবায়ু পরিবর্তন কেন যেন দরিদ্র দেশগুলোর ওপরই এক ধরনের বিমাতা সুলভ আচরণ করে। জলবায়ুর সাধারণ ছাঁট যেমন দরিদ্র দেশগুলোকে বেশি পোহাতে হয়, তেমনি যে কোনও ধরনের পরিবর্তনেরও প্রথম ধাক্কাটা সহিতে হয় তাদেরকেই। রোগ বলাই থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সব যেন প্রকৃতি উজাড় করে ঢেলে দেয় নুয়ে পড়া দেশগুলোর ওপর।

তবে ধনী দেশগুলো যে গা বাঁচিয়ে চলতে পারে তা নয়। ঈশ্বর থাকেন ভদ্রপল্লীতে, তাই হয়তো দুর্যোগ সামলে উঠতে পারে তারা। আর আমরা হতভাগা উন্নয়নশীল, তৃতীয় বিশ্ব কিংবা দরিদ্র বিশ্ব এ পরিবর্তনের বিষফোঁড়া নিয়ে পথ চলতে থাকি। ভদ্রপল্লীর জ্ঞানীগুণীধনী-জনেরা অবশ্য এ বিষফোঁড়া কাটার জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করে থাকেন। তবে বরাদ্দ পাওয়া যায় প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম। বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ সম্মেলন হয়, তাতে তর্কাতর্কি চলে, কাদা ছোঁড়াছুড়ি চলে। লিখে দেওয়া হয় এজেন্ডা। বেঁধে দেওয়া হয় সময়ের ফিতে। চুক্তি হয় রাশি রাশি ডলারের।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এন্টাকটিকার বরফ গলা শুরু হবে, বাড়বে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা। সমুদ্রের জলে ঢুবে যাবে পুরো মালদ্বীপ, বাংলাদেশের মতো দেশগুলোরও নিম্নাঞ্চল। মারাত্মক এ পরিবর্তনের কথা তো সবাই জানা। তবে তাপমাত্রা বাড়ার কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে গিয়ে কিছুটা কৌশলী হতে হচ্ছে চাষীদের। তীব্র তাপদাহ থেকে ফসলকে বাঁচিয়ে রাখতে দেওয়া হচ্ছে শক্তিশালী কিছু রাসায়নিক। যার কিছু অংশ সরাসরি চলে যাচ্ছে খাদ্যে। যখন বিষম খরা হয় তখন ভুট্টা, মটরসূটি এই ফসলগুলোকে বাঁচাতে মাত্রাতিরিক্তভাবে প্রয়োগ করা হয় নাইট্রোট ও হাইড্রোজেন সায়ানাইড। আর এ রাসায়নিকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার শুধু মানুষকেই না, গবাদিপশুকেও আক্রান্ত করে। তীব্র গরমের কারণে এই রাসায়নিকগুলো যেসব ফসলে প্রয়োগ করা হয় তা খেলে মানুষের নানান ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয় যার কারণে প্রতি বছর আফ্রিকাতে কয়েক হাজার লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করা হয়।

এ আশঙ্কাটা সবার আগে টের পেয়েছেন প্রফেসর জ্যাকলুইন ম্যাকগাল্ড। লন্ডনের গ্রেসহাম কলেজে দেওয়া এক বক্তৃতায় জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক প্রোগ্রামের সাবেক এই প্রধান বিজ্ঞানী বলেন, ইথিওপিয়ায় কৃষক আর গবাদী পশু মারা যাচ্ছিল রহস্যময় এক কারণে। তাদের নানারকম স্নায়ুবিদ্যক সমস্যা দেখা দিতে থাকে। যার মধ্যে অন্ধ হয়ে যাওয়া, চলাফেরায় সমস্যা তৈরি হওয়া ইত্যাদি। উপায়ভূত্ব না পেয়ে গবেষকরা সেখানকার ফসল নিয়ে গবেষণা শুরু করেন, তারা দেখতে পান অত্যধিক খরা থেকে ফসল বাঁচাতে ফসলের ওপর হাইড্রোজেন সায়ানাইড মাত্রাতিরিক্তভাবে স্প্রে করছে কৃষকরা। ২০১৬ সাল থেকেই ম্যাকগাল্ড ও তার টিম এ নিয়ে কাজ করছিলেন। আর এতে তাদের কাছে প্রতীয়মান হয় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আফ্রিকায় তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে। তার পরোক্ষ প্রভাব গিয়ে শেষ হচ্ছে খাদ্যে বিষক্রিয়ার মধ্য দিয়েই। শুধু আফ্রিকাই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া আর সুইডেনেও শস্যের মাঝে এক ধরনের ফাঙ্গাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে যা কিনা বিষাক্ত রাসায়নিক স্প্রে করার কারণেই হয়েছে। এ ধরনের ফাঙ্গাস আর ভাইরাস প্রতি বছরই আতঙ্কের নতুন নাম হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। এই নতুন সব ভাইরাসের জন্মদাতা কোনো না কোনো রাসায়নিক। আর এ রাসায়নিক ব্যবহারের মাত্রা বাড়ানোতে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা যায় বিশ্ব উষ্ণতাজনিত জলবায়ুর পরিবর্তনকেই। হয়তো কিছুদিনের মধ্যে বাংলাদেশেও এরকম কিছু ভাইরাস বা ফাঙ্গাসের অস্তিত্ব পাওয়া যাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জলবায়ু পরিবর্তনের বলি হচ্ছে সাধারণ মানুষ। কার্বন নিঃসরণের ফলে তাপমাত্রা বাড়ছে আর সে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রবণতা। ২০১৫ সালে প্যারিসে জলবায়ু বিষয়ক যে সম্মেলন হয়েছিল তাতে উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশেষ করে বাংলাদেশ খানিকটা আশাবাদী হয়েছিল। কারণ এ সম্মেলনে দেশগুলো গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন প্রশমিত করার জন্য একটি সমঝোতায় পৌঁছায়। তারা কার্বন নির্গমনের মাত্রা কমিয়ে বৈশ্বিক উষ্ণতা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমানোর বিষয়ে সম্মত হয়। তবে, সে মত কাজ তেমন একটা এগুতে পারে নি। কারণ, সবচেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরনকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ব্রাজিল ও ভারতের মতো দেশগুলো এ বিষয়ে তাদের সঠিক অবস্থান নির্ধারণ না করলে সম্মেলনগুলোর এজেন্ডা ফলপ্রসূ হবে না।

সূত্র: দ্য ইনিডপেন্ডেন্ট নিউজের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিনিধি Josh Gabbatiss এর প্রতিবেদন থেকে অনুপ্রাণিত

\*সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, হবিগঞ্জ



## পরিবেশ রক্ষায় আমাদের প্রধানমন্ত্রী: প্রত্যয় ও পদক্ষেপ

মোমিন মেহেদী\*

আমাদের দেশ এগিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষের জন্য নিবেদিত আছেন। শেখ হাসিনার পরিবেশ বিষয়ক সফলতায় চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ পুরস্কার প্রাপ্তির পর ইউএনইপির তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক অচিম স্টেইনার তার বক্তব্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করে বলেছেন, ‘বেশ কয়েকটি উদ্ভাবনমূলক নীতিগত পদক্ষেপ এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাকে বাংলাদেশ তার উন্নয়নের মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। জলবায়ু অভিযোজন কর্মসূচির অগ্রগামী বাস্তবায়নকারী এবং অভিযোজন নীতির পক্ষের বলিষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে শেখ হাসিনা অন্যদের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।’ আর বাংলাদেশে জাতিসংঘের তৎকালীন আবাসিক সমন্বয়ক রবার্ট ওয়াটকিনস বলেছেন, ‘বিশ্বের অন্যতম দুর্ভোগপ্রবণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করতে পেরেছে।’

আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রসঙ্গে পরিবেশ উন্নয়নই শুধু নয়; বিভিন্ন উন্নয়ন নিয়ে কথা বলতে পারি। তার মধ্যে অন্যতম হলো- পিপলস অ্যান্ড পলিটিকস বিশ্বের পাঁচজন সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানকে চিহ্নিত করেছেন, যাদের দুর্নীতি স্পর্শ কওে নি, বিদেশে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই, উল্লেখ করার মতো কোনো সম্পদও নেই। বিশ্বের সবচেয়ে সৎ এই পাঁচজন সরকার প্রধানের তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

কাজের অবদানের জন্য তাকে নানা পুরস্কারে ভূষিত করা হয় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে। পরিবেশ বিষয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত থাকায় ২০১৪ সালে ইউনেস্কো তাকে ‘শান্তির বৃক্ষ’ ও ২০১৫ সালে ওমেন ইন পার্লামেন্টস গ্লোবাল ফোরাম নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তাকে রিজিওনাল লিডারশিপ পুরস্কার এবং গ্লোবাল সাউথ-সাউথ ডেভলপমেন্ট এজেন্ডা-২০১৪ ভিশনারি পুরস্কারে ভূষিত করে। বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে অব্যাহত সমর্থন, খাদ্য উৎপাদনে সয়ম্বরতা অর্জন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে অবদানের জন্য আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫ সালে তাকে সম্মাননা সনদ প্রদান করে। জাতিসংঘ পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশ এবং টেকসই উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে শেখ হাসিনাকে তাদের সর্বোচ্চ পুরস্কার ‘চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ-২০১৫’ পুরস্কারে ভূষিত করেছে। টাইম ম্যাগাজিনের বিবেচনায় বিশ্বের প্রভাবশালী ১০ নারী নেত্রীর একজন মনোনীত হয়েছিলেন শেখ হাসিনা। একজন সাহসী নেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা সবসময় নিজেকে প্রমাণ করেছেন। মধ্যপ্রাচ্যের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক খালিজ টাইমস রোহিঙ্গাদের সংকট মোকাবিলায় শেখ হাসিনার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাকে ‘নিউ স্টার অব দ্য ইস্ট’ বা ‘পুর্বের নতুন তারকা’ হিসেবে আখ্যায়িত করে।

২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ‘শান্তিবৃক্ষ’ সম্মাননা তুলে দেওয়ার সময় ইউনেস্কোর প্রধান ইরিনা সেকোভা বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন সাহসী নারী। বিশ্ব পর্যায়েও প্রধানমন্ত্রীর নারী ও কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়নে রয়েছে জোরালো কণ্ঠ। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয়ের মারাত্মক ঝুঁকিতেও বাংলাদেশ তার অবস্থান থেকে ইতিবাচক ভূমিকা রাখায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রশংসা পেয়েছেন। শান্তিবৃক্ষ সম্মাননা দেওয়ার সময় শেখ হাসিনা তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, ‘২০১৫ পরবর্তী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে আমরা আমাদের রূপকল্প-২০৪১-এর ভিত্তিতে একটি উন্নত, সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গঠনের সোপান রচনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই কর্মযজ্ঞে নারী ও মেয়েশিশুরা সব সময়ই আমাদের বিবেচনার অগ্রভাগে থাকবে।’

উল্লেখ করা প্রয়োজন বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। আর এ কারণে জলবায়ুজনিত কারণে পরিবেশ সংরক্ষণ ও তার বিপর্যয় রোধের বিষয়টিকে বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবেশ সুরক্ষা এবং এর পক্ষে জনসচেতনতা তৈরিতে সম্ভাব্য সব ধরনের উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করছেন। বর্তমান সরকার পরিবেশের ব্যাপারে কোনো ধরনের ছাড় দিতে নারাজ। পরিবেশ ধ্বংস, বন দখল, নদী-খাল দখলসহ পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন যে কোনো শক্তির বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থানে। এসব সম্ভব হয়েছে এ বিষয়ে সরকারের জিরো টোলারেন্স নীতির কারণে। পরিবেশের জন্য হুমকি কিংবা ক্ষতিকর কোনো গোষ্ঠী বা শক্তিকে শক্তভাবে প্রতিহত করতে বদ্ধপরিকর সরকার ও তার সংশ্লিষ্ট দপ্তর। বর্তমান সরকার মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে, ধরিত্বে সবুজ থাকলে মানুষের প্রাণ সবুজ থাকবে- আর মানুষের মনপ্রাণ সবুজ থাকলে তার জীবনীশক্তি, কর্মস্পৃহা ও উদ্যম বহুগুণে বেড়ে যাবে। আর এর ফলে জাতীয় জীবনে এর সুদূরপ্রসারী ভূমিকা থাকবে।

\*চেয়ারম্যান, নতুনধারা বাংলাদেশ ও প্রতিষ্ঠাতা, জাতীয় পরিবেশধারা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা আদায়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে জোরালো দাবি তুলে ধরতে সচেষ্ট থেকেছেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে এ বিষয়ে বিশ্বের জনমত তৈরি করেছেন এবং বিশ্ব দরবারে পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে বাংলাদেশের ক্ষতির বাস্তবসম্মত চিত্র তুলে ধরেছেন। দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় রেখে তিনি এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবাইকে যার যার জায়গা থেকে নিবেদিতভাবে কাজ করে যাওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। পরিবেশ বাঁচলে মানুষ বাঁচবে- আর মানুষ বেঁচে থাকলে দেশও স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ যে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা বিশ্বব্যাপী প্রশংসা পেয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে প্রথম এমন সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আর বাংলাদেশই বিশ্বের প্রথম দেশ যে তার নিজস্ব তহবিলে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মানুষকে সম্পৃক্ত করেছেন। প্রান্তিক মানুষ থেকে শুরু করে সমাজের সব স্তরের মানুষকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে একীভূত করে দেশকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার এক যুদ্ধে জড়িয়েছেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্নকে পরিপূর্ণ করতে তিনি এই যুদ্ধে দেশপ্রেমিক সবাইকে এক সূতোয় গেঁথেছেন। আর তারই ধারাবাহিক সফল পাচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশ। বিশেষ করে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর অগ্রগতি, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে সকল সেক্টরে অভাবিত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশের কাছে বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন আর অগ্রগতির রোল মডেল।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ও ত্বরান্বিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে সেসব কর্মকাণ্ডের সফলও পেতে শুরু করেছে দেশ। ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ন প্রকল্প, ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, বিনিয়োগ বিকাশ এবং পরিবেশ সুরক্ষা। ইতোমধ্যে এই ১০টি উদ্যোগ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী কাজও এগিয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নিজে এই ১০টি উদ্যোগের সর্বোচ্চ বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এবং তার সার্বিক মনিটরিং করার বিষয়টিও নিজে দেখভাল করছেন। প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম হলো পরিবেশ সুরক্ষা।

দেশের মোট জনশক্তির অর্ধেকই নারী। নারী সকল উন্নয়ন ও অগ্রগতির মূল শক্তি। নারীর হাতে পরিবেশ ও প্রকৃতি সঠিক পরিচর্যা পায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে নারীদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণও নিশ্চিত করেছেন।

## বায়ুদূষণ: মানবসৃষ্ট এক কালব্যাপি

হাসান জাহিদ\*

সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইকোনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এক জরিপে বিশ্বে বসবাসের সবচেয়ে অযোগ্য শহরের তালিকায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অবস্থান দ্বিতীয়তে ও যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ককে ঢাকার নিচে স্থান দিয়েছিল। বলাই বাহুল্য, বসবাসের অযোগ্যতা নির্ধারিত হয় কয়েকটি প্যারামিটারে-যথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা, অপরাধের মাত্রা, দূষিত পরিবেশ প্রভৃতি।

তাৎক্ষণিক পরিবেশ দূষণের মধ্যে অন্যতম ভয়াবহ দূষণ হলো বায়ুদূষণ-আরো স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় অ্যাক্সিয়েন্ট এয়ার কোয়ালিটির লক্ষণীয় মাত্রায় অবনতি, যা তাৎক্ষণিক শারীরিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিসহ বিলম্বিত ও সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকারক উপাদান হয়ে থাকে।

এই বছর (২০১৯) জাতিসংঘের ইউনাইটেড ন্যাশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম বা ইউনেপ বিশ্ব পরিবেশ দিবসের থিম বা প্রতিপাদ্যনির্ধারণ করেছে ‘বায়ুদূষণ,’ ছোটো দুটি শব্দ, অথচ পরমাণু বোমার মতো ভয়াল। আর কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়-এই বছরের হোস্ট কান্ট্রি হলো চীন, যে দেশটি শিল্পায়নের তাগিদে মিশাইলের মতো ছুটছিল, এবং ছুটছে। শুধু তাই নয়, ব্রাজিল, ভারত ও মেক্সিকো পাল্লা দিয়ে ছুটছে। দূষণ ছড়িয়ে পড়ছে বর্ণিত এবং প্রতিবেশী দেশগুলোতে। দূষণ এখন বিশ্বমাত্রিক, যাকে বলা হয় ট্রান্সবায়ন্ডারি। যখন স্থানিক দূষণ আঞ্চলিকতা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে বর্ধিত কলেবরে তখন সেটা অন্য দেশকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। বিশেষ করে বায়ুদূষণ এখন অতি দ্রুত বৈশ্বিক ব্যাপ্তি লাভ করছে। আর এই কারণেই বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ দূষণ ছাড়াও উন্নত বিশ্ব ও শিল্পায়িত দেশগুলোর অধিক কার্বন নিঃসরণজনিত কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের কুফলে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী। নাজুক ভৌগোলিক অবস্থান ও নিম্নাঞ্চল হওয়াতে সমুদ্রপৃষ্ঠ স্ফীতির ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল চরম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে; লবণাক্ততা ছড়িয়ে পড়তে পারে মধ্য ভূভাগ পর্যন্ত। তার ওপর বড়-ঝড়ো, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ও খরা-বন্যার প্রকোপ তো রয়েছেই।

চীন পরিণত হয়েছে পরাশক্তিতে। তারা বায়ু দূষিত করছে, একটা শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলেছে, সেইসাথে ২০১৯ বিশ্ব পরিবেশ দিবসের হোস্ট কান্ট্রিও হয়ে গেছে।

পরিবেশদূষণের মধ্যে বায়ুদূষণ, বিশেষভাবে ঢাকা ও অন্যান্য বড় শহরগুলোতে পরিবেশ ও বায়ুদূষণের যেপ্রতিযোগিতা চলছে বিপজ্জনক মাত্রায় ও কলেবরে, তা জনস্বাস্থ্যের জন্য ভয়াবহ হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিককালে অতি উদ্বেগ, স্বাস্থ্যহানি ও নানা রোগব্যাধির অন্যতম কারণ গ্রামাঞ্চলে, এমনকি কৃষিক্ষেত্র ও সেসবের আশেপাশে অপরিষ্কৃত ও চরম বায়ুদূষণকারী অগণিত ইটভাটা ও অসংখ্য কলকারখানা স্থাপনের প্রতিযোগিতা।

বিশ্ব ফোরামে দেন-দরবার করার ক্ষমতাও চীনের আছে। এক সূত্রে জানা যায়, দানবীয় বায়ুদূষণের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে চীনের বিভিন্ন শহরে সাড়ে তিন লাখ থেকে চার লাখ মানুষের অকালমৃত্যু হয়েছে। তবে প্রশংসনীয় যে, চীন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একইসাথে পরিবেশ সচেতনও হয়ে উঠেছে। বিশ্ব ব্যাংকের মতে, চীন পৃথিবীর গুটিকয়েক দেশের একটি যে দেশ খুব দ্রুত সেই দেশের বৃক্ষাচ্ছাদন ও বনায়ন বাড়িয়ে তুলেছে।

বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণে ও টেকসই উন্নয়নে, এমডিজি অর্জনে এবং সর্বোপরি পরিবেশ রক্ষায় দেশে ও বিশ্ব ফোরামে জোরালো ভূমিকা রাখছে। কিন্তু সীমাবদ্ধতাও আছে। একদিকে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের চাপ, অন্যদিকে জনসংখ্যার আধিক্য অথচ দক্ষ জনবলের অভাব, শিল্প উদ্যোগদানের অবিবেচনাপ্রসূত শিল্পায়ন, তথা দূষণকারী কলকারখানা স্থাপন সার্বিক পরিস্থিতিতে নশ্বর ও ঠুনকো করে তুলছে।

এখন কথা হলো, বাস্তবতা যেখানে কার্বন বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকছে, সেখানে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে একটা সুস্পষ্ট অবস্থান নিতে হবে। বিপন্নতার মাত্রা কমাতে কার্বন বাণিজ্যের দিকে নজর দিতে হবে, একইসাথে পরিবেশ-বান্ধব শিল্পায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে; এই শিল্পায়ন হতে হবে টেকসই ও দূষণহীন। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হতে হবে আন্তর্জাতিক মানসম্মত। এখানে প্রসঙ্গত একটা উদাহরণ

\*পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ও সার্টিফায়ড মেম্বর, ইকো-ক্যানোডা

টানা যায়। আমাদের দেশে অনেক ইটভাটা হচ্ছে। তবে তা এলোমেলো ও তীব্র দূষণসৃষ্টিকারী। তদুপরি, ইটভাটা নির্মিত হচ্ছে যত্রতত্র এবং বনাঞ্চল নিশ্চিহ্ন করে। চিমিনিসমূহ যথোপযুক্ত উচ্চতার ও উন্নত জ্জ্বার সমৃদ্ধ নয়। এই বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের নজরদারি থাকলেও দেশের সবকটি ইটভাটার দূষণ চিহ্নিতকরণ ও মনিটরিংয়ে ঘাটতি রয়েছে। এখন, একটি ইটভাটা স্থাপনের অর্থ কর্মসংস্থান ও গৃহ বা স্থাপনা নির্মাণ সামগ্রীর যোগান বেড়ে যাওয়া। কিন্তু এই সুফল যদি বেশি মাত্রায় কুফলের জন্য দেয় তবে তা উদ্বেগজনক এবং কার্বন নিঃসরণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। দেখা গেছে যে, গ্রামের ভেতরে আবাদি জমির ঠিক মাঝখানেই ইটভাটা গড়ে উঠেছে, এবং এর জন্য প্রচুর গাছপালা কেটে ভাটার স্থান নির্ধারণ করা হয়। এই অবস্থার নিরসনকল্পে ইটভাটার জন্য নির্দিষ্ট স্থান বেঁধে দিতে হবে, বা জোনিং করে দিতে হবে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের ক্লিন এয়ার অ্যান্ড সাসটেইনেবল এনভায়রনমেন্ট (কেস) প্রকল্পের আওতায় বাতাসের মান খতিয়ে দেখা হচ্ছে নিয়মিত। জানা মতে, এ উদ্দেশ্যে ঢাকায় চারটি, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট মহানগর এবং গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে একটি করে নির্মল বায়ু পরীক্ষা কেন্দ্র চালু হয়েছে। ১১টি কেন্দ্রে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে বাতাসকে ভালো, মধ্যম, অস্বাস্থ্যকর, খুব অস্বাস্থ্যকর, অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর-এই পাঁচ ক্যাটেগরিতে চিহ্নিত করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দূষিত ইটভাটা ও কলকারখানা চিহ্নিত করে সেসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে বা প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে সেসব ভাটা বা কারখানাকে দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, তথা উপযুক্ত চিমনি নির্মাণ ও গাছের বদলে কয়লা বা বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার এবং কারখানার ক্ষেত্রে ইটিপি বা ইটিপি প্রযোজ্য নয়, এমনসব কারখানাকে দূষণ নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করানো যেতে পারে। মনে রাখতে হবে কতিপয় ইটভাটা বা কারখানার জন্য বৃহত্তর জনপদ, ফসল, বৃক্ষ বা জনস্বাস্থ্য ভয়াবহ পরিণতির দিকে যেতে পারে।

শুধুগ্রামে বা শহরতলীতেই নয়, বায়ুদূষণের সমস্যা এখন সমগ্র বাংলাদেশের।

বায়ুদূষণ নিয়ে কাজ করে এমন একটি সংস্থা ‘স্টেট অভ গ্লোবাল এয়ার’এর প্রতিবেদনেও বিষয়টি উঠে এসেছে। সেখানে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর বাসিন্দাদের ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ কোনো না কোনো ভাবে বায়ুদূষণের মধ্যে বাস করছে। এসব দেশের মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি মানুষ কোনো না কোনো দূষিত এলাকায় বাস করে।

সূত্রমতে, বায়ুদূষণের কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর মারা যাচ্ছে ১ লাখ ২৩ হাজার মানুষ আর ভারত ও চীনে মারা গেছে ১২ লাখ মানুষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পরিবেশ অধিদপ্তরের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, শুষ্ক মৌসুমে যে নির্মাণকাজগুলো হচ্ছে, তাতে সকাল-বিকেল দুই বেলা নির্মাণসামগ্রী, বিশেষ করে বালু ও ইট পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু রাজধানিসহ অন্যান্য শহরে বেশির ভাগ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের নির্মাণসামগ্রী যত্রতত্র ফেলে রেখে ধুলা সৃষ্টি করে দূষণের মাত্রা বাড়িয়ে তুলছে।

এখানে আরেকটু বলা দরকার যে, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর শৈশব পেরিয়ে এখন যৌবনের দ্বারপ্রান্তে। আগে লোকবল ছিলনা, সাংগঠনিক কাঠামো মজবুত ছিলনা, যথেষ্ট বিধি ও আইন ছিলনা। এখন দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। পর্যায়ক্রমে জেলায় দপ্তর স্থাপিত হচ্ছে। জনবল, প্রশাসনিক কাঠামো ও কার্যপরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। বেড়েছে মাঠ পর্যায়ে তৎপরতা। বর্তমান সরকার পরিবেশদূষণ রোধে ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবিলায় সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছে নানা প্রতিকূল অবস্থাতেও।

তবে বায়ুদূষণের ক্ষেত্রে দৃশ্যপট অনেকটাই নৈরাশ্যজনক। চলন্ত বা যানজটে আটকে পড়া গাড়ি থেকে কালো ধোঁয়া নির্গমন, নির্মাণাধীন ভবন বা রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির কাজে ইট-পাথর-সিমেন্ট প্রভৃতি থেকে ছড়িয়ে পড়া দূষিত পদার্থ জনস্বাস্থ্যের জন্য, বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক মানুষ ও গর্ভবতী মায়াদের জন্য মারাত্মক বিপজ্জনক। বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে বায়ুদূষণের ঝুঁকি কমানো বেশ কঠিন কাজ বলে উল্লেখ করেছেন গবেষকরা। ঢাকা একটি দ্রুত বর্ধনশীল নগরী। এখানে মানুষের চাপ বাড়ছে, বেড়ে চলেছে যানবাহনের সংখ্যা ও বিবিধ স্থাপনা নির্মাণের বেগতিক আগ্রাসন।

বায়ুদূষণকে অদৃশ্য ঘাতক হিসেবে বর্ণনা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে ৭০ লাখ মানুষ অপরিণত বয়সে মারা যায়। বায়ুদূষণ অলজেইমারস রোগ এবং স্মৃতিভ্রমের ঝুঁকি তৈরি করে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল স্কুল অভ পাবলিক হেল্থের গবেষক শি চেন বলেন, ‘গবেষণায় আমরা যেসব নমুনা সংগ্রহ করেছি তার মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি যে কোন্ বয়সের মানুষের ওপর বায়ুদূষণ কতোটা প্রভাব ফেলে। আমাদের প্রাপ্ত তথ্য নতুন একটি বিষয়।’

এই গবেষণার সময় ২০১০ সালে থেকে ২০১৪ সাল সময়ের মধ্যে ১০ বছর এবং তার চেয়ে বেশি বয়সী মানুষের ওপর পরীক্ষা চালানো হয়।



তাদের বুদ্ধিমত্তা যাচাই করার জন্য ২৪টি গণিত এবং ৩৪টি শব্দ চিহ্নিত করার প্রশ্ন দেয়া হয়েছিল। এর আগের গবেষণায় দেখা গিয়েছিল যে বায়ুদূষণের কারণে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দূষণের শিকার অনেকের মাঝে মানসিক সমস্যাও তৈরি করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা হেল্থ ইফেক্টস ইনস্টিটিউট এবং ইনস্টিটিউট ফর হেল্থ মেট্রিকস অ্যান্ড ইভালুয়েশনের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদন বলছে, বায়ুতে যেসব ক্ষতিকর উপাদান আছে, তার মধ্যে মানবদেহের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক উপাদান হচ্ছে পিএম ২.৫ (পার্টিকুলেট ম্যাটার-বাংলায় সূক্ষ্ম বস্তুকণা)। এতোদিন এই উপাদান সবচেয়ে বেশি নির্গত করত চীন। গত দুইবছরে চীনকে ছাড়িয়ে ওই দূষণকারী স্থানটি দখল করে নিয়েছে ভারত। চীন ও ভারতের পরেই রয়েছে বাংলাদেশের অবস্থান। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে জাপানের রাজধানী টোকিও। প্রতিবেদনটিতে মূলত কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বায়ুদূষণের ঘনত্ব পরিমাপ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বায়ুদূষণের কারণে বাংলাদেশে বছরে ১ লাখ ২২ হাজার ৪০০ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে বলে উল্লেখিত হয়েছে। আর বায়ুদূষণের কারণে শিশুমৃত্যু হারের দিক থেকে পাকিস্তানের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান (২০১৭)। পিএম ২.৫ ছাড়াও বায়ুর অন্যান্য দূষণকারী পদার্থের (লেড, সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার বা এসপিএম) উপস্থিতির দিক থেকে সামগ্রিক দূষণের একটি চিত্র ওই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। তাতে শীর্ষ বায়ুদূষণকারী দেশ হিসেবে চীন, ভারত, ইয়োরোপীয় ইউনিয়নের দেশ, রাশিয়া ও পাকিস্তানের পরেই রয়েছে বাংলাদেশের অবস্থান।

### বিশ্বজুড়ে বায়ুদূষণের চিত্র:

- বায়ুদূষণের কারণে প্রতিবছর ৭০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়
- পৃথিবীর ৯১ শতাংশ মানুষ এমন স্থানে বসবাস করে যেখানে বায়ুদূষণের মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে বেশি
- পৃথিবীর যে ২০টি শহর সবচেয়ে বেশি বায়ুদূষণের মধ্যে আছে তার মধ্যে ভারতের ১৪টি শহরের অন্যতম উত্তরাঞ্চলের কানপুর তালিকার শীর্ষে
- সারা বিশ্বে প্রতি ১০জনের মধ্যে ৯ জন দূষিত বাতাস সেবন করেন
- গবেষকরা বলছেন, যেসব পরিণত বয়সের মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কম তারা সবচেয়ে বেশি বায়ুদূষণের ঝুঁকিতে আছেন; কারণ তারা ঘরের বাইরে নানা ধরনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন

পরিতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, বিশ্বের সবচেয়ে বায়ুদূষিত দেশের তালিকার শীর্ষে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ। এটা এই বছরেরই প্রতিবেদন। এরপরই রয়েছে পাকিস্তান ও ভারত। তার মানে হলো গোটা ভারতীয় উপমহাদেশ মহা বায়ুদূষণে আক্রান্ত। আইকিউএয়ার, এয়ারভিজুয়াল ও গ্রিনপিসের গবেষণা প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণ কঠিন কাজ হলেও অসম্ভব কিছু নয়। আর এখনই উত্তরণ না ঘটালে গড় আয়ু কমবে, অকালমৃত্যু ঘটবে এবং রোগবালাই বেড়ে অসহনীয় পর্যায়ে চলে যাবে। বায়ুদূষণ রোধে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি সচেতন হতে হবে সাধারণ মানুষ, শিল্প উদ্যোক্তা ও দূষণকারীকলকারখানা ও যানবাহনের মালিকদের।

পদক্ষেপ নেয়ার এখনই সময়।

## আমরা এখন কী করব, আমাদেরই ঠিক করতে হবে

নারায়ণ সরকার\*

ফণীর আঘাতের পর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দেশ।

পৃথিবীটা তো ধীরে ধীরে গরমই হয়ে উঠছে।

কেন, কীভাবে, বলাবাহুল্য, এই মুহূর্তে আলাদা করে তেমন কোনো আলোচনার আর কোনো প্রয়োজন নেই। বিষয়টি বহুচর্চিত।

পৃথিবীর জলবায়ু বদলে যাচ্ছে।

বিষয়টি ব্যাখ্যার দরকার। দুইয়ের মধ্যে তফাৎটি। পৃথিবীর উত্তপ্ত হয়ে ওঠা এবং পৃথিবীর জলবায়ু বদলে যাওয়া, এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎটি। তফাৎটি ব্যাখ্যার দরকার, কারণ দুটিকে প্রায়শই সমার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রকৃতপক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনেরই একটি অংশ মাত্র। জলবায়ু পরিবর্তন বলতে কেবলমাত্র উষ্ণতার পরিবর্তনকেই বোঝায় না, বোঝায় বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন, বাতাসের পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়কেও। আর এই সব পরিবর্তন যখন এক দশক বা তারও বেশি সময় ব্যাপী স্থায়ী হয় তখনই তাকে জলবায়ুর পরিবর্তন হিসেবে গণ্য করা হয়।

পৃথিবী গরম হয়ে উঠেছে আর তার ফলশ্রুতিতে কিছু এসবও ঘটতে শুরু করেছে, বৃষ্টিপাতের ধরনধারণ বদলাচ্ছে, ঝড়ঝঞ্ঝার প্রাদুর্ভাব ঘটছে। তাই কেবলমাত্র উষ্ণতার পরিবর্তনের পরিবর্তে সামগ্রিকভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ে আলোচনাই ক্রমশ মুখ্য হয়ে উঠছে।

আর একই সঙ্গে কেবলমাত্র পৃথিবীর ভবিষ্যৎ প্রাকৃতিক অবস্থা নয়, দুর্শ্চিন্তা বাড়ছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ আর্থনীতিক অবস্থা নিয়েও। বিশ্ব উষ্ণায়নের পরিপ্রেক্ষিতে জলবায়ুর যে ধরনের পরিবর্তন ঘটছে তা এতটাই গভীর, তার প্রভাব এতটাই ব্যাপক যে, তা স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করতে বসেছে অর্থনীতির বুকে। অন্তত অর্থনীতিবিদদের এমনটিই ধারণা। যে ধরনের সমস্যা, যে ধরনের মন্দা শুরু হয়েছে তা দীর্ঘস্থায়ী হবে। তবে সে প্রসঙ্গে যাবার আগে জলবায়ুর এই পরিবর্তন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে নেওয়া যাক।

এই গ্রহের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত ১৯৭৯ সালে, জেনেভায়, প্রথম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে। তবে সে ছিল একেবারে প্রাথমিক পর্বের আলোচনা। প্রকৃত অর্থে জলবায়ু সংক্রান্ত আলোচনার গোড়াপত্তন করে ১৯৯২ সালের রিও সম্মেলন। ঐ সম্মেলনের তৈরি হয়, রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাঠামোগত চুক্তি।

জলবায়ুর কী ধরনের পরিবর্তন আশংকা করছেন বিজ্ঞানীরা? ঠিক কী ধরনের পরিবর্তন তা বলা একটু মুশ্কিল। বস্তুত, বিজ্ঞানীরা আশংকা করেছেন, বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে আগামী দিনে রীতিমত খামখেয়ালীপনা শুরু করে দেবে এই গ্রহের জলবায়ু। কোথাও বন্যা তো কোথাও খরা, প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা, তুষারপাত, কোথাও তীব্র শীত তো কোথাও তীব্র গরম। তবে খামখেয়ালীপনা থাকলেও কিছু কিছু জিনিস ঘটবেই বা ইতোমধ্যেই ঘটতে শুরু করেছে বলে বিজ্ঞানীমহল দাবি করেছেন।

যেমন, কৃষি উৎপাদন, বিশেষত খাদ্যশস্যের উৎপাদন, উল্লেখযোগ্যভাবে বিপর্যস্ত হবে। কিছু উদ্ভিদ আছে, যাদের সালোকসংশ্লেষের হার গরম বাড়লে কমে আসে, ফলে ফলন কমে। আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য ধান, গম, এই শ্রেণীভুক্ত। স্বাভাবিকভাবেই গরম বাড়লে খাদ্যের অভাব বাড়বে। অনেকে আবার বলেছেন গরম তো তখনই বাড়বে যখন বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়বে, আর বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়লে বরং গাছের সালোকসংশ্লেষে সুবিধা হবে, সালোকসংশ্লেষের হার বাড়বে, ফলে ফলনও বাড়বে। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয় তবে এক্ষেত্রে ফলন তাদেরই বাড়বে অধিক উষ্ণতায় যাদের ফলন বাড়ে। এদের মধ্যে অধিকাংশই আগাছা ও গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। আর আছে জোয়ার, বজরা, ভুট্টার মত কিছু অপ্রধান খাদ্যশস্য। কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হবার আরো একটি কারণ আছে। গরম বাড়লে পৃথিবীজুড়ে সর্বত্র হিমবাহ গলবে, বাড়বে সমুদ্রতলের উচ্চতা। ফলে সমুদ্রের জল ঢুকে আসবে স্থলভাগে, চাষের জমিগুলো হয়ে উঠবে লবণাক্ত। এছাড়া ঢুকে আসা সমুদ্রের জল ভাসিয়ে দেবে মিষ্টি জলের উৎসগুলোকে। অভাব দেখা দিবে পানীয় জলেরও।

গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের বাষ্পীভবনের হার বাড়বে। প্রথম দিকে এর ফলে অতিবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি থেকে ঘন ঘন বন্যা দেখা যাবে এইসব। তারপর খরা নেমে আসবে উষ্ণতার অত্যধিক দাপটে। বলাবাহুল্য এর ফলে কৃষি উৎপাদন তো ব্যাহত হবেই, বন্যার ফলে সম্পত্তিহানি ও প্রাণহানির ঘটনাও ঘটবে অসংখ্য।

\*প্রাবন্ধিক ও কবি

সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সামগ্রিক ঝড়ঝঞ্ঝার প্রকোপ ইতোমধ্যেই বাড়তে শুরু করেছে। বারবার ঝড়ের আঘাতে প্রচুর সম্পত্তিহানির ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া গরমে যে সমস্ত রোগের জীবাণুগুলোর বৃদ্ধি ঘটে সে সমস্ত রোগের প্রকোপ বাড়তে শুরু করেছে। যেমন, কলেরা, ম্যালেরিয়া। এর কারণ আবহাওয়া একটু বেশি গরম হলে মশার প্রজনন সময় দীর্ঘতর হয়, মশার লার্ভাগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি ভালো হয়।

বিশ্ব উষ্ণায়ন শুধু জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটাবে না, বিশ্ব অর্থনীতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে বিপুল পরিমাণ আর্থিক বোঝার ভার। উৎপাদন কমবে। তার একটা ক্ষতি আছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলো সামলে ওঠার খরচ আছে। স্বাস্থ্যহানি তো আবার খরচই শুধু বাড়ায় না ভবিষ্যৎ উৎপাদনশীলতার উপরও থাবা বসায়। এইসব বিপুল ক্ষতির আশংকাতেই কেউ আর পরিবেশের এই ক্ষয়ক্ষতিকে উড়িয়ে দিতে পারছে না।

বিশ্ব অর্থনীতির জগতে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বার্ষিক প্রতিবেদন হল আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার কর্তৃক প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক। বিশ্ব অর্থনীতির উপর জলবায়ুর এই পরিবর্তনের প্রভাব কী পড়বে তার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে প্রতিবেদনে। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের দরুণ অর্থনীতির উপর যে প্রভাব পড়ে তাকে দুভাগে ভাগ করা চলে— বাজার সংক্রান্ত প্রভাব এবং বাজার-বহির্ভূত প্রভাব। বাজার সংক্রান্ত প্রভাবের মধ্যে আছে কৃষি, বনসৃজন, মৎস্যচাষ, পর্যটনের মত ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, মাটির তলার জলভাণ্ডারের উপর প্রভাব ইত্যাদি। অন্যদিকে স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব, বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রভাব ইত্যাদি বাজার-বহির্ভূত প্রভাবের উদাহরণ (ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, ২০০৮) এখন অর্থনীতির উপর প্রভাব বলতে বোঝাচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তনের দরুণ বাজার সংক্রান্ত প্রভাব ও বাজার বহির্ভূত প্রভাবের ফলে মোট জাতীয় উৎপাদন কতটা কী কমবে।

কতটা কী কমবে সে ব্যাপারে কিন্তু সুনিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে যে বিপদ এসেছে বা আসছে, প্রযুক্তির বিকাশ দিয়ে তাকে কতটা সামাল দেওয়া যাবে সে ব্যাপারে অনিশ্চয়তার কারণেই বিভিন্ন রকম তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। আবার কোনো কোনো সমীক্ষায় বাজার বহির্ভূত বিষয়, যেগুলো সরাসরি উৎপাদন বাড়া-কমার সঙ্গে জড়িত নয় সেগুলোকে হিসেবের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। ফলে সেক্ষেত্রে যে হিসেবেটা পাওয়া যাচ্ছে সেখানে উৎপাদন হ্রাসের অংকটি তুলনামূলক ভাবে ছোট।

তবে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অর্থনীতি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সে প্রশ্নে মতবিরোধ থাকলেও একটা ব্যাপারে নেই। তা হল, এই ক্ষতির সিংহভাগ বহন করবে গরিব দেশগুলো, সে দেশের ততোধিক গরিব মানুষজন। এর কারণ, অনুন্নত দেশগুলোর প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে এই সব দেশে বৃষ্টি ঠিকঠাক না হলে এমন কোনো জলসেচ ব্যবস্থা নেই যে চাষ চালিয়ে নেওয়া যাবে। ফলে যে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অভিঘাত সামলে ওঠা গরিব দেশগুলোর পক্ষে কঠিন। আবার এই সমস্ত দেশে অর্থনীতির প্রতিষ্ঠানলোর ঠিকঠাক গড়ে না ওঠার ফলেও প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে সমস্ত আর্থনীতিক অভিঘাতের জন্য দেয় সেগুলোও সহজে সামলাতে পারে না গরিব মানুষগুলি। উন্নত দেশে কোনো কারণে ফলন মার খেলে কপাল কুঁচকে ওঠে না চাষির, কারণ তার শস্য বীমা করা আছে। গরিব দেশের হয়তো বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোই সে ভাবে গড়ে ওঠেনি।

সোজা কথায় বিশ্ব উষ্ণায়নের সমস্যা, জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা আজ সারা পৃথিবীর সমস্যা হলেও তার অভিঘাত সর্বত্র সমান নয়। কাকে কতটা ধাক্কা সহ্য করতে হবে, তার অনেকটা নির্ভর করবে আর্থনীতিকভাবে কে কতটা শক্ত তার উপর। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফল ভোগ বেশি করতে হবে গরিব দেশগুলোকে। তার কারণ এই যে, যে পরিকাঠামো থাকলে জলবায়ু পরিবর্তনের পরিণাম সামলে নেওয়া যেত তা তাদের নেই, উপার্জন করতে হবে। আর উপার্জন করতে হবে মানে খরচ বাড়বে। এক তো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তার উপর আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য খরচ। জলবায়ুর পরিবর্তনের দরুণ অর্থনীতিক বিপর্যয় তাই কোনো অংশেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চেয়ে কম হবে না। আমরা এখন কী করব, আমাদেরই ঠিক করতে হবে।

## জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রভাব: বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

মোঃ ইউসুফ মেহেদী\*

বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়ের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন অন্যতম। পৃথিবীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এ বিষয়ে ভাবনার বিকল্প নেই। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি কোন অলীক ধারণা নয় বরং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্য। আজ থেকে ৪৫০ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবী নামক গ্রহের সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি লগ্ন থেকেই পৃথিবীকে বেঁটন করে আছে বায়ুমণ্ডল। পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডলের বয়স মহাবিশ্বের বয়সের এক তৃতীয়াংশ। এ বিপুল সময়ের মধ্যে পৃথিবীর অজস্র ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে, সেই সাথে পরিবর্তন ঘটে বায়ুমণ্ডলের অবস্থারও। মূলত বায়ুমণ্ডল বলতে পৃথিবীর চারপাশে ঘিরে থাকা বিভিন্ন গ্যাস মিশ্রিত স্তরকে বুঝায়। এ স্তরসমূহ পৃথিবী তার মধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা ধরে রাখে। একে আবহমণ্ডলও বলা হয়। পৃথিবীর কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থাকে আবহাওয়া বলে। আর পৃথিবীর কোন স্থানের ৩০ বছরের বেশি সময়ের আবহাওয়া অর্থাৎ বায়ু, তাপ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির গড়কে বলা হয় জলবায়ু।

এ পৃথিবীর ৪৫০ কোটি বছরের ইতিহাসে জলবায়ু পরিবর্তন নতুন কোনো বিষয় নয়। শুরুতে পৃথিবীর জলবায়ু যেমন ছিল আজ আর তেমন নেই। সৃষ্টির প্রথম ২০০ কোটি বছরের জলবায়ুর তুলনায় পরের ২৫০ কোটি বছরের জলবায়ুর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অন্যদিকে পৃথিবীর সকল অঞ্চলের জলবায়ুও এক রকম নয়। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর কোনো দুইটি স্থানে হুবহু একই ধরনের জলবায়ু পাওয়া সম্ভব নয়। পৃথিবীতে বারবার জলবায়ু পরিবর্তন হয়েছে তা আমরা বিভিন্ন প্রমাণাদি থেকে নিশ্চিত হতে পারি। ফসিল রেকর্ডসহ বিভিন্ন প্রমাণাদি থেকে বিজ্ঞানীরা অন্তত পাঁচবার প্রজাতিসমূহের গণবিলুপ্তি দেখতে পেয়েছেন। প্রজাতিসমূহের প্রথম বিশাল গণবিলুপ্তি ঘটে আজ থেকে ৪৯ কোটি থেকে ৫৪ কোটি বছরপূর্বে ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে। এসময় প্রায় ৫০% প্রজাতি পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে যায়। এরপরে, অবডেভনিয়ান, ডেভনিয়ান এবং সর্বশেষ ক্রেটাসিয়ান কালপর্বের শেষ দিকে অর্থাৎ প্রায় ৬.৫-৭ কোটি বছর পূর্বে অতিকায় সরীসৃপ প্রজাতি ডাইনোসরদের গণবিলুপ্তি ঘটে। সময়ে সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ-খাওয়াতে না পারার জন্যই জীবপ্রজাতির এরূপ গণবিলুপ্তি ঘটে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা সবযুগে এক রকম ছিল না। কখনও শীতলতা গিড়ে যেয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকা বরফে ঢেকে গেছে। আবার কখনও উষ্ণতা বেড়ে গিয়ে মেরু অঞ্চলের বরফও গলে গেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হলো পৃথিবীর তাপমাত্রার পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়া। এ তাপমাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধির অন্যতম প্রাকৃতিক কারণ হলো পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যকার দূরত্বের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটা। যখন পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যকার দূরত্ব কমে যায় তখন পৃথিবী বেশি তাপ শোষণ করে। আবার পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যকার দূরত্ব বেড়ে যায় তখন পৃথিবী কম তাপ শোষণ করে। এভাবে Glacial ও Inter Glacial যুগের অবতারণা ঘটে। অন্যদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণয়ন পথে এর অক্ষ সূর্যের দিকে হেলে যাবার কারণে তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। যখন অক্ষ সূর্যের দিকে হেলে যায় তখন পৃথিবীর বেশির ভাগ অংশ সূর্যের আলো পায় এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এ তত্ত্ব প্রথম প্রকাশ করেন রাশিয়ার বিজ্ঞানী মিলাঙ্কভিচ।

মি. মিলাঙ্কভিচ তত্ত্বানুসারে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষ বছরের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের পৃথিবীর তাপমাত্রা শিল্প বিপ্লবের পর থেকে দ্রুততম সময়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বৃদ্ধি প্রাকৃতিক কারণে নয় এটা নিশ্চিত। তাহলে এর কারণ কি? এ বিষয়ে ১ম ধারণা প্রদান করেন সুইডেনের বিজ্ঞানী আর্হেনিয়াস ১৮৯৬ সালে। তিনি প্রমাণ করেন যে, জীবাশ্ম জ্বালানোর ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বনের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। আর এ কার্বন এমন একটি মৌল যার তাপধারণ ক্ষমতা রয়েছে। ফলে সূর্য থেকে আগত তাপ ও পৃথিবী হতে বিকিরিত তাপ কার্বন শোষণ করে এবং পৃথিবীর মোট তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসেরও অধিক বাড়তে পারে। এ ধারণাটি ১ম স্বীকৃতি লাভ করে ১৯৮৮ সালে। ঐ বছরটি ১৮৮০ সাল হতে ঐ পর্যন্ত সময়ে সবচেয়ে উষ্ণতম বছর হিসাবে প্রমাণিত হয়। পৃথিবীর ৬০টিরও অধিক দেশের ২৫০০ এর অধিক বিজ্ঞানী অসংখ্য লিটারেচার রিভিউ করে এমত দেন যে, গ্রিন হাউজ গ্যাস বৃদ্ধির কারণেই পৃথিবীর তাপমাত্রা খুব দ্রুততম সময়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মূলত বায়ুমণ্ডলীস্থ কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ওজোন ও জলীয় বাষ্পকে গ্রিন হাউজ গ্যাস বলা হয়। সূর্যের আলো যখন পৃথিবীতে আসে তখন এ আলোর সাথে আসে তাপ (ইনফ্রারে ফ্রিকোয়েন্সিতে) যা পৃথিবীর গায়ে প্রতিফলিত হয়। পৃথিবীর সকল বস্তু ও স্থান সূর্যের আলো এবং ইনফ্রা-রে হতে তাপ শোষণ করে এবং উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আবার কিছু তাপ গ্রিন হাউজ গ্যাসের কারণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতরে আটকে থাকে এবং এ কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এগ্যাস ইনফ্রা-রে শোষণ করে নিজের তাপমাত্রা বাড়িয়ে তোলে এবং আয়নার মত পৃথিবী থেকে বের হওয়া তাপ কে নিচের দিকে প্রতিফলিত করে। ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের

\*সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়



তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এ কথা প্রমাণিত যে, গ্রিন হাউজ গ্যাস না থাকলে পৃথিবীর তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর চেয়ে নিচে নেমে যেত। সে ক্ষেত্রে পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিকুলের বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। সে বিবেচনায় বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউজ গ্যাসের উপস্থিতি অতি প্রয়োজন। কিন্তু আশংকার বিষয় হচ্ছে যে, পৃথিবীর জন্য অতি মূল্যবান এ গ্রিন হাউজ গ্যাসই পৃথিবী ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এজন্য মূলত আমরা মানুষই দায়ী। কারণ মানুষ প্রতিনিয়ত প্রয়োজনে কিংবা ভোগ বিলাসের ফলে বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউজ গ্যাসের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত বাড়িয়ে তুলছে। ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রতিবছর আগের তুলনায় বেড়ে চলছে।

সংশয়ের বিষয় হচ্ছে যে, বিজ্ঞানীদের ধারণা এশতকে বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে ০.৩ থেকে ৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এমনকিশিল্পকারখানা যেখানে বেশি সেখানে গড়ে ০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। ২১০০ সাল নাগাদ সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়বে ২৬ থেকে ২৮ সেন্টিমিটার। একথা সত্য যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রের পানির উষ্ণতা বেড়ে গেছে। এক গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী অ্যান্টার্কটিকার যে অঞ্চলে দ্রুত বরফ গলছে, সেখানে গত এক দশকে বরফ গলার মাত্রা তিনগুণ বেড়েছে।

এসব লক্ষণ বিবেচনায় পৃথিবীকে আসন্ন বিপদের হাত হতে রক্ষার নিমিত্ত ১৯৯২ সালের ৩ জুন হতে ১৪ জুন তারিখ পর্যন্ত ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত হয় ধরিত্রী সম্মেলন। এ সম্মেলনে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) নামে একটি বৈশ্বিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যার মূল লক্ষ্য ছিল বায়ুমণ্ডলের গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের হার এমন অবস্থায় স্থিতিশীল রাখা যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মানবিক পরিবেশের জন্য বিপত্তিকর না হয়। অতঃপর বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধকল্পে জাতিসংঘের উদ্যোগে কয়োটো প্রটোকল নামে আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৭ সালে জাপানের কয়োটো নগরীতে UNFCCC সমর্থনকারী দেশসমূহ এ প্রটোকল গ্রহণে সম্মত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী কিন্তু কাজকর্ম লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় এর মেয়াদ আরো ৮ বছর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু উন্নত দেশের অসহযোগিতার কারণে কয়োটো প্রটোকল বাস্তবায়ন সফলতার মুখ দেখেনি।

গত ১২ ডিসেম্বর, ২০১৫ সালে প্যারিস সম্মেলনে (CoP 21) বিশ্বের ১৯৫টি দেশ একটি চুক্তির ব্যাপারে একমত হয়। ২০১৬ সালে ২২ এপ্রিল চুক্তিটি সই করার জন্য খুলে দেওয়া হয় এবং ৪ নভেম্বর, ২০১৬ থেকে এ চুক্তিটি কার্যকর হয়। চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের অপূরণীয় ক্ষতি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা। এজন্য এ চুক্তিতে কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম ভুক্তভোগী দেশ। ১৯৯১ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ৯৩টি বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়। এতে সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৯০ কোটি ইউএস ডলার। ছয় ঋতুর দেশ হিসেবে পরিচিত এদেশটির ঋতুচক্রকে এখন চেনাটাই দূস্কর। এদেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের স্থায়ীত্বকাল ও রুক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে, ২০৫০ সাল নাগাদ ০ থেকে ১৫ শতাংশ লোক ক্ষুধার করালগ্রাসে নিক্ষিপ্ত হবে। শিশুদের অপুষ্টির পরিমাণ বাড়বে ২১ ভাগ। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে যে দশটি দেশ খাদ্য স্বল্পতারহুমকির মুখে আছে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। সমুদ্রের উচ্চতামাত্র ১ মিটার বাড়লে এদেশের মোট আয়তনের শতকরা ১৮ ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এছাড়া সমুদ্রের উচ্চতা বাড়ায় সমুদ্র তীরবর্তী জেলাগুলোর পানিতে লবণাক্ততা বেড়ে গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা গত ৪২ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। আবার বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টির কারণে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। শুধু তাই নয় এর অভিঘাত মোকাবেলায় সরকার বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯ (বিসিসিএসএপি-২০০৯) প্রণয়ন করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম এ ধরনের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিসিসিএসএপি ২০০৯-এ বর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগে ২০০৯-১০ অর্থবছরে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) গঠন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত দেশের অর্থ প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা না করে নিজস্ব অর্থায়নে এ ধরনের তহবিল গঠনবিশ্বে প্রথম। যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিশেষভাবে প্রসংগিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু সহিষ্ণু প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করাই বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ট্রাস্ট ফান্ডটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০ বলবৎ করা হয়।

সরকারে রাজস্ব বাজেট হতে ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ১০টি অর্থ বছরে ট্রাস্টফান্ডে ৩ হাজার ৫ শত কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলে বরাদ্দকৃত অর্থ এবং তহবিল হতে প্রাপ্ত সুদ দ্বারা ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত প্রায় ৩১৫০.০৫ (তিন হাজার একশত পঞ্চাশ কোটি পাঁচ লক্ষ) কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬৭১ (ছয়শত একাত্তর) টি (৬০৮টি সরকারি এবং ৬৩টি বেসরকারি) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত প্রকল্পের মধ্যে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ৩৩০টি (সরকারি-২৭৩টি, বেসরকারি-৫৭টি) প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে সরকারি ৩৩৫টি প্রকল্পের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় অভিযোজন, প্রশমন ও গবেষণা খাতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে অভিযোজন খাতে উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কাজের মধ্যে রয়েছে উপকূলীয় এলাকায় সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ-১৪টি, উপকূলী এলাকায় বেঁড়িবাঁধ নির্মাণ-২৩১.৪০ কিঃমিঃ, খালখনন/পুনঃখনন কাজ-৫৯০.৬০ কিঃমিঃ, রাবার ড্যাম নির্মাণ-৩টি, আরসিসি ড্রেনেজ নির্মাণ-১২৮.৭০ কিঃমিঃ, নলকূপ স্থাপন-৩৩২৯টি, পানি বিশুদ্ধকরণ সৌর প্যান্ট-২৪৫১টি, জলবায়ু সহিষ্ণু শস্য ও বীজ উৎপাদন এবং বিতরণ: ১৯ হাজার ৪২৮ মেট্রিক টন, ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু গৃহ নির্মাণ- ৮৫২৯টি, নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ৯০ কিঃমিঃ এবং সবজি ও মসলা উৎপাদনের জন্য ভাসমান বেড স্থাপন: ১,২৯০০টি। ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রশমন খাতে উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কাজের মধ্যে রয়েছে বনায়ন: ৬৯২১.৭ হেক্টর, বৃক্ষরোপণ: ৭ কোটি ১১ লক্ষ ৪৬ হাজারটি, উন্নত চুলা বিতরণ: ২৮,০০০টি, সোলার হোম সিস্টেম-১০,৯০৮টি, সোলার প্যানেল স্থাপন ৩০ কিলোওয়াটের ১৫টি সোলার সিস্টেম, ৩৩ কিলোওয়াটের ১টি সোলার প্র্যান্ট স্থাপন, বায়োগ্যাস প্র্যান্ট-৭৯০১টি, কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্র্যান্ট-১৩টি, সোলার ইরিগেশন পাম্প-২০টি, বন্ধু চুলা স্থাপন- ৯ লক্ষ, উদ্যোক্তা তৈরী-৬০০০ জন, সোলার স্ট্রীট লাইট: ১৭৫১টি এবং শিক্ষা বন্ধু বাতি বিতরণ-২০,৬৬০টি।

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় দৃঢ় নেতৃত্বের জন্য ২০১৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পলিসি লিডারশীপ ক্যাটাগরীতে জাতিসংঘের পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সর্বোচ্চ পদক ‘Champions of the Earth’ পদকে ভূষিত করা হয়েছে। মূলত জীবনযাত্রার মান নিয়ন্ত্রণ করে প্রকৃতির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণেই পারে একটি সুন্দর পৃথিবী প্রতিষ্ঠা গড়তে। ধরিত্রী রক্ষার নিমিত্ত মানুষ সর্বক্ষেত্রে পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় আরও সচেষ্ট হবে সে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

## চট্টগ্রামের উদ্ভিদ যাদুঘর

হেয়দুল আলম\*

১৯৫৫ সালেবার আউলিয়ার পূণ্যভূমি খ্যাত চট্টগ্রাম শহরের ঘোলশহর এলাকায় বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ গবেষণা ইনস্টিটিউটের বন ব্যবস্থাপনা উইং এর অধীনে ১১টি বিভাগ আছে, যার মধ্যে বন উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ অন্যতম। এই বন উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগেই রয়েছে বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম মৃত গাছের বাগান বা হারবেরিয়াম। গত ১৯৫৯ সনে BFRI হারবেরিয়াম প্রতিষ্ঠিত করা হয়। হারবেরিয়ামকে বাংলায় উদ্ভিদ সংগ্রহশালা বলে। বৈজ্ঞানিকভাবে বলতে গেলে যা শুষ্ক বা স্পিরিটে সংগৃহীত বিশদ তথ্য সম্বলিত একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিন্যস্ত উদ্ভিদ সংরক্ষণাগার। এখানে উদ্ভিদ নমুনা (Botanical specimens) শুকিয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা হয়। এটাকে উদ্ভিদ নমুনার যাদুঘরও বলা যেতে পারে। তাছাড়া, এখানে উদ্ভিদ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য (Data base) সংরক্ষিত থাকে। প্রতিষ্ঠালাভের পর থেকে শ্রেণীকরণবিদ্যার গবেষণা, উদ্ভিদবিদ্যার চর্চা, দেশের ভেষজ সম্পদ এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ সম্পদের গবেষণা ও উন্নয়ন, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং দেশের জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) সংরক্ষণে এই হারবেরিয়াম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এটি দেশের ২য় বৃহত্তম হারবেরিয়াম। এই হারবেরিয়ামে ১৮০ পরিবারের ৭৫০ গণের অধীনে ১৫০০ প্রজাতির প্রায় ৪০,০০০ উদ্ভিদ নমুনা বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষিত আছে। তাছাড়া নৃ-তাত্ত্বিক জন গোষ্ঠীর ব্যবহৃত ৪৫০ প্রজাতির ২,৫০০ উদ্ভিদ নমুনাও সংরক্ষিত আছে।



বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনা



সংরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনা পর্যবেক্ষণ

উক্ত হারবেরিয়ামের উপাত্ত হতে দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলের উদ্ভিদ নমুনার বিস্তৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় যা পুনরায় বন সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। এছাড়াও বিলুপ্ত প্রাপ্ত উদ্ভিদ প্রজাতি নিরূপণের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সর্বোপরি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই হারবেরিয়ামে রক্ষিত উদ্ভিদ নমুনার সাহায্যে এম.ফিল, পি.এইচ.ডি সহ বিভিন্ন গবেষণা কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে, ফার্মেসী বিভাগের ছাত্ররা হারবেরিয়ামের উদ্ভিদ শ্রেণীবিন্যাসতত্ত্ববিদ (Plant Taxonomist) কর্তৃক ভেষজ গাছপালা সঠিকভাবে শনাক্তকরণ করে তাদের একাডেমিক কোর্স সম্পন্ন করছে।

এই মৃত বাগানের বেশিরভাগ উদ্ভিদ নমুনা চিরসবুজ (Tropical evergreen) প্রকৃতির। হারবেরিয়ামটির সব উদ্ভিদের স্বভাব দেখতে অনেকটা প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের মতো। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মৃত বাগানের সংরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনা দেশীয় (indigenous) প্রজাতির গাছপালায় বিরাজমান। তাছাড়া প্রতি বছর এই উদ্ভিদ সংগ্রহশালায় বিলুপ্ত প্রায় ও দুর্লভ প্রজাতির গাছের নমুনা সংগ্রহের ফলে এখানে উদ্ভিদ বৈচিত্র্যে ভরপুর (Plant diversity)। এখানে বীৰু (herb) জাতীয় উদ্ভিদ নমুনা থেকে শুরু করে উঁচু বৃক্ষের (tall tree) নমুনার আধিক্য অনেক বেশী। তাই এই মৃত বাগানটি উদ্ভিদবিদ্যা, বনবিদ্যা ও পরিবেশবিদ্যার গবেষক ও ছাত্র এবং সাধারণ মানুষের মাঝে অনেক কৌতুহল হয়ে উঠেছে। তাছাড়া এখানে কয়েকটি বিদেশী প্রজাতির বৃক্ষের নমুনার উপস্থিতি হারবেরিয়ামকে আরো বেশি সৌন্দর্য করে তুলেছে। বন্য প্রাণীদের (Wildlife) আবাস ও খাদ্য উৎপাদনকারী অনেক গাছপালার নমুনাও সংরক্ষিত আছে। এই মৃত বাগানে যেমন অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষের নমুনা আছে; তেমনি ঔষধি গুণাগুণ সম্পন্ন অনেক বৃক্ষের নমুনাও রয়েছে। অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর অরণ্যে পাওয়া যায় এমন অনেক গাছপালার নমুনা (পাতা, ফুল, ফল, বীজ) এই মৃত বাগানে বিদ্যমান। তাছাড়া ৮ প্রজাতির বেত (Cane) ও ৩৩ প্রজাতির বাঁশ (Bambusetum) এর নমুনা সংরক্ষিত আছে। এখানে সাইকাস (Cycas pectinata)

\*গবেষক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম

নামে একটি নগ্নবীজী বৃক্ষের নমুনা রয়েছে, যেটি বাংলাদেশের আর কোথাও পাওয়া যায় না। এটি শুধুমাত্র সীতাকুন্ড পাহাড়ে দেখা যায়। তাছাড়া পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম লম্বা ফল গিলা (Entada rheedii) লতার নমুনা এই মৃত বাগানে সংরক্ষিত আছে। তাই এই মৃত বাগানটি পরিদর্শনের জন্য প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল থেকে হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী আসে। এমনকি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও মৃত বাগানটি দেখার জন্য প্রায় সময় পরিদর্শনে আসে।

এই মৃত বাগানে সংরক্ষিত বৃক্ষের নমুনার মধ্যে কয়েকটি ইউনিক গাছের স্থানীয় নাম ও বৈজ্ঞানিক নাম হল- তেলগুর (Hopea odorata), তেলিগর্জন (Dipterocarpus turbinatus), ঢাকিজাম (Syzygium firmum), BDK`vwjcUvm (Eucalyptus camaldulensis), মেহগনি (Swietenia macrophylla), শাল (Shorea robusta), চম্পা (Michelia champaca), লোহাকার্ট (Xylia xylocarpa), দেবদারু (Polyalthia longifolia), শ্রীলংকান ছাতিম (Alstonia macrophylla), জ্যাকেরাডা (Jacaranda mimosifolia), ক্ষণা (Oroxylum indicum), বার্মা শিমূল (Ceiba pentandra), ধূপ (Canarium resiniferum), গুটগুইট্রা (Protium serratum), সোনালু (Cassia fistula), কৃষ্ণচূড়া (Delonix regia), হলুদ কৃষ্ণচূড়া (Peltophorum pterocarpum), কাউ (Casuarina equisetifolia), নাগেশ্বর (Mesua ferrea), কাউগোলা (Garcinia cowa), বহেরা (Terminalia bellirica), কাঠ বাদাম (Terminalia catappa), বৈলাম (Anisoptera scaphula), কাইনজল ভাদী (Bischofia javanica), পলাশ (Butea monosperma), অর্মোসিয়া (Ormosia robusta), চালমুগড়া (Hydnocarpus kurzii), সিধাজারুল (Lagerstroemia parviflora), লম্বু (Khaya anthotheca), তুন (Toona ciliata), খয়ের (Acacia catechu), রাজ কড়ই (Albizia richardiana), রেইনট্রি (Samanea saman), বট গাছ (Ficus benghalensis), বটল ব্রাশ (Callistemon citrinus), সিলকী ওক (Grevillea robusta), কন্যারী (Gardenia coronaria), বাজনা (Zanthoxylum rhetsa), রক্তন (Lophopetalum wightianum), মছুরা (Madhuca longifolia), বকুল (Mimusops elengi), সুন্দরী (Heritiera fomes), বান্দর হোলা (Duabanga grandiflora), জংগলী বাদাম (Sterculia foetida), অয়েল পাম (Elaeis guineensis), চাইনা পাম (Livistona chinensis), বটল পাম (Roystonea regia), আরোকেরিয়া (Araucaria cunnighamii), পাইন (Pinus caribaea), বাঁশপাতা (Podocarpus nerifolius) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

তাছাড়া প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চল থেকে দেশী প্রজাতির বিলুপ্ত প্রায় ও ঔষধি গুল্মগুণ সম্পন্ন অনেক উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহের ফলে দিন দিন বিএফআরআই মৃত বাগানটি সমৃদ্ধ হচ্ছে।





# English Articles



## Linking Climate Change to Air Pollution

Dr. Saleemul Huq\*  
Rukhsar Sultana\*\*

### Introduction:

Air pollution has become a grave concern all over the world especially in Bangladesh, due to its association with multidirectional adverse effect on health, climate, ecosystem, lives and etc. (CASE,2018). The rapid urbanization and industrialization worldwide has only worsen the pollution scenario adding to the already changing climate. In past researches, the inextricable link between Climate Change and Air pollution didn't quite weave in Environmental policy and dialogues, but after 2018 conference on "Public Health, Environmental and Social Determinants of Health" held in Geneva, people had started to piece it all together (Calma,2018). It has now been evident that changes in climate plays a significant role in air quality patterns over multiple scales in time and space, as meteorological variables influence emissions, transport, dilution, chemical transformation, and eventual deposition of air pollutants. With climate change being the harsh reality of today, reducing air pollution would save lives and slow its adversities.

### Air Quality and Climate

Meteorology has substantial influence on air quality (Jacob 2005), which is why changes in climate alters patterns of air pollution. High temperatures increases the chemical reactions that leads to ground level-ozone and secondary particles formation. High temperature along with elevated carbon dioxide leads to increased emission of ozone-relevant Volatile Organic Carbon (VOC) precursors (Kinney, 2008). Pollutants with PM2.5 (particulate matter less than 2.5 micrometers) are the biggest culprit; they are heavily emitted by both diesel vehicles and combustion of biomass, coal and kerosene. Ozone is another pollutant that causes significant respiratory illness, including chronic asthma. Oxides of nitrogen heavily emitted by vehicles are contributor to ground level ozone and poses significant health risk.

Weather patterns influences movement and dispersion of all kinds of pollutants in atmosphere. For example Heat waves leads to increase in use of air conditioning which substantially increases emissions, especially of nitrogen oxides (NOx). According to assessment of California air quality conducted in 2004 it was identified that NOx emissions from power plants doubled on days when temperature increased from 75°F to 95°F in the months of July, August, and September (Kinney, 2008). Forest fires are also triggered by changes in temperature, precipitation and wind patterns. Distribution and production of airborne allergens (pollen and molds) are influenced by weather and levels of CO2 in air. Human Induced climate change is likely to alter the distribution of pollutants over time and space. It is therefore crucial to understand the intertwined relationship of air quality and climate change as these two have been emerging threats to human health.

### Air Pollution Affecting Human Health

A report on global burden of disease by the US-based Health Effect Institute had ranked air pollution as one of the top ten killers in the world, and sixth most dangerous killer in South Asia (CASE, 2018). Medical science has been discovering the relationships of pollution to serious health issues- exposure to concurrent air pollutants (e.g. carbon dioxide, black carbon, sulfur dioxide, and others GHG's) that impacts global climate change results in severe health damage. GHG pollutants can have either short term health impacts, or long term/ global health impacts. Carbon dioxide gas the main culprit to climate change induces long term health impact, whereas other carbon, nitrous oxide, Particulate Matter (PM) and ozone induce short term health impacts.

World Health Organization (WHO) has identified most organic particles as carcinogenic. Another European research has identified that exposure to air pollutants during pregnancy affects the brain development of infants (CASE, 2018). Moreover worldwide air pollution is responsible for 7 million premature deaths. These include stroke and heart disease, respiratory illness and cancers, induced by long term exposure to air borne particles.

Every day around 93% of the world's children under the age of 15 are exposed to toxic air, breathing this polluted air is putting their health in jeopardy often leading to death. The Director General of WHO Dr. Tedros Adhanom

\*Director, International Centre for Climate Change and Development (ICCCAD)

\*\*Research Intern, International Centre for Climate Change and Development (ICCCAD)



Ghebreyesus in a press release in 2018 said “This is inexcusable. Every child should be able to breathe clean air so they can grow and fulfil their full potential”. Air pollution is poisoning our health and jeopardizing the future of our youth; hence the importance to identify the way forward.

### **Air Pollution in Bangladesh Context**

Globally, Bangladesh ranks high amongst the countries most affected by pollution and other environmental health risks (World Bank, 2018). 28 percent death in Bangladesh is due to pollution. This is the highest average death rates caused by pollution amongst other South Asian countries (World Bank, 2018). Air pollution in South Asian countries is the highest in the world with fine PM<sub>2.5</sub> being present in both outdoor and indoor air. According to the World Bank report titled “Enhancing Opportunities for Clean and Resilient Growth in Urban Bangladesh” – polluted air is by far the most leading environmental risk in Bangladesh, causing about 21 percent of all deaths in the country (CASE, 2018).

Bangladesh being highly vulnerable to climate change the health impacts of air pollution is further exaggerated. Urban areas of Bangladesh has been suffering from heightened level of particulate matter in air, especially in dry season (November – April) when this region experiences scarce rainfall, northwesterly wind and low relative humidity.

The Department of Environment (DoE) had established 11 continuous air monitoring station in 8 major cities of Bangladesh, these station monitored the five criteria pollutant (PM, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, Ozone and CO) as per the country’s meteorology parameters for the years 2013-2018. According to data the annual amount of PM<sub>2.5</sub> was estimated at 80 µg/m<sup>3</sup>. This was about eight times higher than WHO threshold and about five times higher than the standard set by Bangladesh (CASE, 2018). DoE (Department of Environment) identified that vehicles and brick kilns are the key contributors to PM<sub>2.5</sub> pollution. More data from the analysis showed Narayanganj as the most polluted city in the country, while concentration of PM in dry season was high in both Dhaka and Gazipur. Sylhet was found as the least polluted city monitored.

### **Measures Taken**

Following up on the limits set forth by Government of Bangladesh in 2005 on criteria air pollutants several interventions were taken up to maintain the threshold air quality standards some of which have been (a) removal of lead from gasoline in 1999, (b) phase-out of 2-stroke 3-wheeled baby taxis from Dhaka, (c) introduction and popularization of CNG to transport sector in early 90’s, (d) enlargement of the chimney height of the fixed chimney kiln (FCK) used in brick production, and (e) adoption of new brick burning and control law (revised in 2013) which prohibits energy-extensive FCKs in brick manufacturing sector.

These interventions had improved the air quality during the time of implementation; however, the massive influx of population in urban centers in the recent years, and consequently the requirement and use of excessive fuel to meet the growing population needs has been declining the air quality in the city again because operation of other contaminating vehicles continues (Arefin, Mallik & Islam, 2017).

The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has been implementing Clean Air and Sustainable Environment (CASE) project since 2010. Under this project funded by WHO, ending in June 2019, the three agencies, Department of Environment (DoE), Dhaka City Corporation (DCC) and Dhaka Transport Coordination Authority (DTCA) have been collaborating to monitor air quality, track the source of pollutants and find solutions to reduce vehicular emission and others. Data analyzed in the CASE project had identified that air pollutants are more concentrated at the urban area. Going forward to address climate change and air pollution integrated urban planning and policy can be applied to mitigate and adapt the predicaments of climate change and air pollution simultaneously (Salaha Uddin, 2013)

### **Conclusion**

Urban planning could play a key role in minimizing climate related risks in the human environment. Efficient and resilient urban planning process can be an integrated way of developing and practicing air quality standards in Bangladesh. Better land use management to control indirect and direct emissions, along with urban population growth management are tools that can be used to develop a policy framework (Salaha Uddin, 2013).

With Bangladesh being one of the most vulnerable countries to climate change and Dhaka city’s air pollution being the second worst in the world it makes sense to address the two issues together so that the citizens of Dhaka can be

protected from both air pollution as well as adverse effects of climate change. This would require a comprehensive plan for Dhaka city to address both climate change and air pollution going forward. International Centre for Climate Change and Development (ICCCAD) being a research institute works on various climate change related programs. The Urban Resilience Program of ICCCAD has been working on this line to promote climate resilient migrant friendly city. To address the degrading air quality of Bangladesh, especially Dhaka, ICCCAD would be prepared to join forces with the Department of Environment to develop a comprehensive plan for Dhaka city and its citizen.

#### Reference:

Arefin, M., Mallik, A., & Islam, M. (2017). AIR POLLUTION AND EFFECT OF POLLUTION HEIGHTENS IN DHAKA CITY. International Journal Of Advanced Engineering And Science, 6(2), 19-24. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/320166468\\_AIR\\_POLLUTION\\_AND\\_EFFECT\\_OF\\_POLLUTION\\_HEIGHTENS\\_IN\\_DHAKA\\_CITY](https://www.researchgate.net/publication/320166468_AIR_POLLUTION_AND_EFFECT_OF_POLLUTION_HEIGHTENS_IN_DHAKA_CITY)

Salaha Uddin, M. (2013). Integrated Urban Policy Framework: A Mechanism To Adapt With The Problem Of Climate Change And Air Pollution. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/309575056\\_THE\\_PROBLEM\\_OF\\_CLIMATE\\_CHANGE\\_AND\\_AIR\\_POLLUTION](https://www.researchgate.net/publication/309575056_THE_PROBLEM_OF_CLIMATE_CHANGE_AND_AIR_POLLUTION)

Kinney, P. (2008). Climate Change, Air Quality and Human Health, (2003), vol. 25, no. 3. American Journal Of Preventive Medicine, 35,(5), 459–467. doi: 10.1016/s0749-3797(04)00039-x

Jacob DJ. (2005) Interactions of climate change and air quality: research priorities and new direction,[Report from a workshop], April 26–27, Washington DC: Electric Power Research Institute.

WORLD BANK. (2018). , Enhancing Opportunities for Clean and Resilient Growth in Urban Bangladesh: Country Environmental Analysis [Ebook] (pp. 8-17). Retrieved from <http://documents.worldbank.org/curated/en/585301536851966118/pdf/129915-CEA-P161076-PUBLIC-Disclosed-9-16-2018.pdf>

Calma, J. (2018). Want clean air in 2019? Let's talk climate change. Retrieved from <https://grist.org/article/want-clean-air-in-2019-lets-talk-climate-change/>

CASE (Clean Air and Sustainable Environment Project)- AMBIENT AIR QUALITY IN BANGLADESH. (2018). [Ebook] (pp. 1-6). Retrieved from [http://case.doe.gov.bd/index.php?option=com\\_content&view=article&id=5&Itemid=9](http://case.doe.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=9)

Climate and Clean Air Coalition, WHO. Air Pollution, Climate and Health [Ebook]. Retrieved from [https://www.who.int/sustainable-development/AirPollution\\_Climate\\_Health\\_Factsheet.pdf](https://www.who.int/sustainable-development/AirPollution_Climate_Health_Factsheet.pdf)

WHO. How air pollution is destroying our health. (2018). Retrieved from <https://www.who.int/air-pollution/news-and-events/how-air-pollution-is-destroying-our-health>

More than 90% of the world's children breathe toxic air every day. (2018). Retrieved from <https://www.who.int/news-room/detail/29-10-2018-more-than-90-of-the-world%E2%80%99s-children-breathe-toxic-air-every-day>

## Green Climate Fund: The Only Dedicated Climate Fund How it works

Dr. Fazle Rabbi Sadeque Ahmed\*

**Introduction:** The world's climate has always been changing between hotter and cooler periods due to various factors. However, it has now been firmly established that its human inhabitants are altering the climate through global warming as a result of greenhouse gas emissions. Although the basic science is now clear, the full range of effects due to human influenced climate change is still not fully understood. However, it is known that climate change in the next hundred years will be significant and by the year 2100 best estimates predict between a 1.8° C and 4 °C rise in average global temperature, although it could possibly be as high as 6.4° C. Food production will be particularly sensitive to climate change, because crop yields depend directly on climatic conditions (temperature and rainfall patterns) and could lead to food yields being reduced by as much as a third in the tropics and subtropics. Meanwhile future tropical cyclones will become stronger, with faster wind speeds increasing the amount of damage they cause; floods will become more common due to changing rainfall patterns and glacier melt in the summer; sea-level rise could inundate large areas of low lying countries; and the changing climate may indirectly cause misery by increasing the incidence of disease and conflict. Furthermore biological diversity the source of enormous environmental, economic, and cultural value will be threatened by climate change.

**‘Climate change Mitigation’** which refers to efforts to reduce greenhouse gas emissions or to capture greenhouse gases through certain kinds of land use, such as tree plantation is the main response that must be made to prevent future impacts of climate change. Greenhouse gases have mainly been emitted by developed Western countries and it is these countries that must act to prevent climate change becoming more serious. However, there are many measures that may be taken in developing countries that include reducing domestic emissions and deforestation, as well as advocating for mitigation in the developed world. In terms of the impact of climate change few places in the world will experience the range of effects and the severity of changes that will occur in Bangladesh, which will include: Average weather temperatures rising; more extreme hot and cold spells; rainfall being less when it is most needed for agriculture, yet more in the monsoon when it already causes floods; melting of glaciers in the source areas of Bangladesh's rivers altering the hydrological cycle; more powerful tornados and cyclones; and sea level rise displacing communities, turning freshwater saline and facilitating more powerful storm surges.

**‘Climate Change Adaptation’** which is the process through which people reduce the negative effects of climate on their health and well-being and adjust their lifestyles to the new situation around them is an essential and often overlooked part of the response to climate change; although it is not intended as a substitute for mitigation actions as adaptation has limitations. There are a number of basic strategies that can be taken in response to climate change that categorise various ways to adapt to the altered situation but a process that starts in and with the local community and its adaptive capabilities is vital;

especially as climate change adaptation is context specific. Mainstreaming climate change adaptation into development thinking and practices has also been recommended as a priority and there are already many innovative projects in Bangladesh and around the world addressing the growing impacts of climate change on local communities. Many more adaptation techniques need to be either transferred from other parts of the world or developed in the country. Furthermore continued research is necessary to determine more accurately future and present effects of climate change on Bangladesh.

### Why Climate Finance?

Climate finance is important for adaptation, as significant financial resources are needed to adapt to the adverse effects and reduce the impacts of a changing climate. Climate finance is equally needed for mitigation, because large-scale investments are required to significantly reduce emissions.

Climate finance refers to local, national or transnational financing—drawn from public, private and alternative sources of financing—that seeks to support mitigation and adaptation actions that will address climate change. The Convention (UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change), the Kyoto Protocol and the Paris

\*Director (Environment and Climate Change), PKSf

Agreement call for financial assistance from developed countries with more financial resources to those that are less endowed and more vulnerable. This recognizes that the contribution of countries to climate change and their capacity to prevent it and cope with its consequences vary enormously.

In accordance with the principle of “common but differentiated responsibility and respective capabilities” set out in the Convention, developed country Parties are to provide financial resources to assist developing country Parties in implementing the objectives of the UNFCCC. Developed country Parties should also continue to take the lead in mobilizing climate finance from a wide variety of sources, instruments and channels, noting the significant role of public funds, through a variety of actions, including supporting country-driven strategies, and taking into account the needs and priorities of developing country Parties. Such mobilization of climate finance should represent a progression beyond previous efforts.

### **What is the financial mechanism?**

To facilitate the provision of climate finance, the Convention (UNFCCC) established a financial mechanism to provide financial resources to developing country Parties. The financial mechanism also serves the Kyoto Protocol and the Paris Agreement.

The Convention states that the operation of the financial mechanism can be entrusted to one or more existing international entities. The Global Environment Facility (GEF) has served as an operating entity of the financial mechanism since the Convention’s entry into force in 1994. Parties have established two special funds—the Special Climate Change Fund (SCCF) and the Least Developed Countries Fund (LDCF), both managed by the GEF—and the Adaptation Fund (AF) established under the Kyoto Protocol in 2001.

### **What is GCF?**

The Green Climate Fund (GCF) is a global dedicated climate fund set up within the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) to assist developing countries respond to the manifold challenges of climate change. The fund was formally established at the 16th Conference of Parties in 2010 (COP16) under the Cancun Agreement, as part of the Convention’s financial mechanism. The fund seeks to deliver equal amounts to mitigation and adaptation activities while being guided by the Convention’s principles and provisions.

### **Role of NDA the country entity**

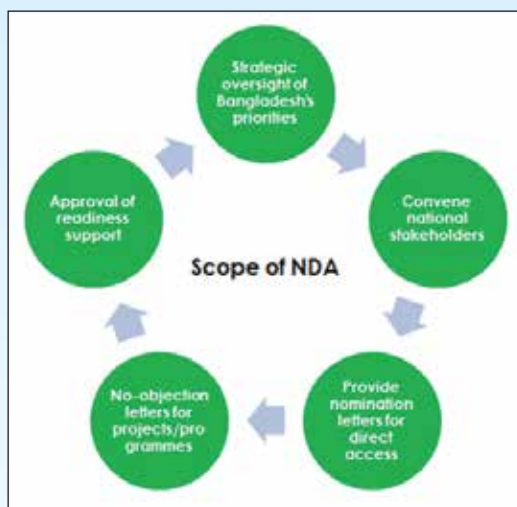
The National Designated Authority (NDA) serves as the core interface and focal point of communication between the country and the Green Climate Fund. The NDA seeks to ensure that activities supported by GCF align with strategic national objectives and priorities, and help advance ambitious action on adaptation and mitigation in line with national needs. In November 2014, the Economic Relations Division (ERD) under the Ministry of Finance was nominated by the Government of Bangladesh to be the National Designated Authority (NDA) to the Green Climate Fund (GCF).

Core mandates and responsibilities of the NDA are to:

- Provide broad strategic oversight of the Funds’ activities in Bangladesh – This includes ensuring alignment with national sustainable development objectives and frameworks including climate strategies and policies, e.g. National Adaptation Programmes of Action (NAPA), BCCSAP, National Adaptation Plans (NAPs), etc. The Fund’s readiness programme is able to provide support to develop or strengthen such strategic frameworks, and develop country programmes to identify strategic priorities for engagement with the Fund.
- Convene relevant public, private and civil society stakeholders to identify priority sectors to be financed by the Fund. Stakeholders include other relevant government entities at national and sub-national levels; civil society; project developers; private sector actors; financial institutions; and communities, including vulnerable groups, women and indigenous peoples, who will be affected by the Fund’s activities. NDAs and focal points are encouraged to consult such stakeholders in preparing their country programmes.
- Communicate nomination letters to entities (sub-national, national or regional, public and private) seeking accreditation to the fund under the ‘direct access’ – A key responsibility of the NDA is to engage with potential, public, private sector and non-governmental entities in the country and nominate such entities for accreditation to the Fund. Applications from these entities wishing to become accredited via the direct access track need to be accompanied by a nomination letter from the NDA.



- Implement the no-objection procedure on funding proposals submitted to the Fund, to ensure consistency of funding proposals with national climate change plans and priorities. – The no-objection letter is provided to GCF by the NDA, in conjunction with any submission of a funding proposal by an accredited entity of the Fund. In case a proposal is submitted without the no-objection letter, GCF will notify the NDA or focal point and will only submit the proposal to the GCF Board if the no-objection is received within 30 days of the notification.
- Provide leadership on the deployment of readiness and preparatory support funding in the country – The NDA may directly benefit from the funding or select international, regional, national and sub-national, public, private or non-governmental institutions as their delivery partners. The Fund may also deploy readiness and preparatory support to prospective sub-national or regional entities seeking accreditation with the Fund to prepare them to apply for accreditation, and to accredited entities to develop project and programme pipelines.



### GCF Accreditation Process

GCF works through a range of organizations to mobilize its funds. Organizations with specialized capacities can apply to become Accredited Entities. Accredited entities can be private, public, non-governmental, sub-national, national, regional or international bodies with clear, detailed and actionable climate change projects or programmes. They must also meet GCF standards based on financial standards, environmental and social safeguards, and gender.

There are two types of GCF Accredited Entities, based on access modalities: Direct Access Entities (DAE) and International Access Entities.

**Direct Access Entities (DAE) or National Implementing Entities (NIE)** are sub-national or national organizations that need to be nominated by National Designated Authorities (NDAs) or focal points in a developing country. Nominated organizations may be eligible to receive GCF readiness support - a funding designed to help interested organizations prepare to become Accredited Entities and also to strengthen the organizational capacities of those that have already been accredited.

Any subnational, national, regional, public or private organizations can apply to become accredited as DAE, provided it has:

- A legal status: it has to be legally established within Bangladesh
- An institutional system: with robust policies, procedures and guidelines
- A track record: it has to demonstrate that it implements above policies, procedures and guidelines

### Direct Access Entities (DAE)

Direct Access Entities (DAE) are accredited entities that are expected to mobilise and manage GCF finance in a country. The primary roles of DAEs are to:

- Develop and submit funding proposals for projects and programmes
- Oversee project and programme management and implementation
- Deploy a range of financial instruments (grants, concessional loans, equity and guarantees)
- Mobilise private sector capital

Till date, two institutions in Bangladesh have been accredited as DAEs. The NIEs are: Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) and Infrastructure Development Company Limited (IDCOL)

**International Access Entities or Multilateral Implementing Entities (MIE)** comprise of United Nations agencies, multilateral development banks, international financial institutions and regional institutions. GCF considers these organizations to have the wide reach and expertise to handle a range of climate change issues across borders and thematic areas. International Access Entities do not need to be nominated by developing country NDAs / focal points. The Multilateral Implementing Entities (MIEs) presently operating in Bangladesh are: United Nations Development Programme (UNDP), Asian Development Bank (ADB), Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Agence Française de Développement (AFD), HSBC Holdings plc, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), European Investment Bank (EIB), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and International Development Association (IDA) - World Bank (WB), International Finance Corporation (IFC), International Fund for Agricultural Development (IFAD), International Union for Conservation of Nature (IUCN), Japan International Cooperation Agency (JICA), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), United Nations Environment Programme (UNEP) and World Food Programme (WFP).

**Organizations that are not Accredited Entities can engage with the fund in the following ways:**

- Partnering with an Accredited Entity or implementing its approved GCF project
- Co-financing projects with an already Accredited Entity
- Acting as a readiness delivery partner, provided that the organization can demonstrate relevant expertise, experience and ability to implement projects

**So far GCF approved 102 projects out of them three projects supposed to be implemented in Bangladesh. The brief outline of the projects are given below:**

1. Enhancing adaptive capacities of coastal communities, especially women, to cope with climate change induced salinity: The objective of the project is strengthening the adaptive capacity of coastal communities, especially women, to cope with the impacts of climate-induced salinity on their livelihoods and water security.

The coastal belt of Bangladesh is vulnerable to cyclones, storm surges, and sea-level rise, which have recently been observed to be becoming more intense. Increased occurrence of these hazards is accelerating saltwater intrusion into the fresh water resources along Bangladesh's coastline.

The strengthening of adaptive capacities in this project is projected to reduce the adverse impacts to agricultural livelihoods that are freshwater dependent, and to address the availability and quality of drinking water in vulnerable coastal communities. This community-based approach in planning and managing climate-resilient water supply targets the highly vulnerable, specifically women and girls. The project has an estimated lifespan of 6 years.

2. Global clean cooking program – Bangladesh. The objective of the project is removing barriers in the development of a sustainable market for the adoption of improved cook stoves in Bangladesh.

About 66 percent of Bangladesh' population live in rural areas, where women predominantly do the cooking using traditional, wood fueled stoves. Burning wood for cooking releases carbon dioxide, methane and black carbon. It also leads to deforestation and negative health impacts, causing an estimated 46,000 casualties every year in Bangladesh. Currently only 3 to 5 percent of households in the country use improved cook stoves.

The scaling up of investment in improved cook stoves will increase demand and help extend the existing supply chain. The project will provide technical assistance to support partner organizations and local entrepreneurs to produce improved cook stoves, raise awareness, and carry out research and development of the stoves. The project has an estimated lifespan of 3.5 years.

## PROJECT FUNDING

GCF implements its projects through partnerships with Accredited Entities. The Fund does so utilizing a variety of financial instruments including grants, loan, equity and guarantees. GCF private sector support includes assisting entities to tap into financial markets.

Accredited Entities are the key agents in GCF's funding proposal cycle. They are responsible for presenting funding applications to GCF as well as overseeing, supervising, managing and monitoring the overall GCF-approved projects and programmes.

Accredited Entities need not act as the direct implementer of funding proposals. Executing Entities can also implement projects on behalf of Accredited Entities by channelling funds and carrying out the funded activities. Accredited Entities however have an important role to play in the supervision of Executive Entities' GCF-related activities.

Approval of GCF projects is contingent on whether a proposed project supports the country's strategic priorities. Every project the GCF Board agrees to fund must be endorsed, expressed via a no objection letter by the country's NDA or focal point.

In order to address the capacity constraints faced by developing countries in developing robust project proposals, GCF has established the Project Preparation Facility to provide financial support to help Accredited Entities to prepare projects and programmes. The facility is specifically targeted to support Direct Access Entities, and micro-to-small size category projects.

### Generation of Funding Proposals

Funding proposals are developed by Accredited Entities, in close consultation with the NDA or focal point of a country. Project proposals are based on differing climate finance needs and strategic priorities of a country.

Accredited Entities can also respond to Requests for Proposals issued by GCF from time to time. In some cases, GCF may accept proposals from entities that have not yet been accredited. However, non-accredited entities are required to partner up with Accredited Entities when formally submitting funding proposals to GCF.

### Requests for Proposals

Several supporting programmes have been established by the GCF Board to issue Requests for Proposals.

1. Micro- Small-, and Medium-Sized Enterprises Pilot Programme: The micro-, small-, and medium-sized enterprises pilot programme was established in 2016 as part of GCF's Private Sector Facility. The programme aims to support micro-, small-, and medium-sized enterprises with mitigation and adaptation activities.
2. Enhancing Direct Access: An initial allocation of USD 200 million has been approved by the GCF for 10 pilots funding proposal adopting Enhance Direct Access implementation modalities. This kind of proposal only allowed from the direct access entities.
3. Simplified Approval Process: Concept notes for some small-scale projects may also be submitted for consideration under the Simplified Approval Process (SAP). Under the SAP, the documentation and review processes for bringing projects or programmes from conception to implementation are reduced and simplified. Accredited Entities, National Designated Authorities (NDAs) or Focal Points and their partners may choose to submit concept notes under the SAP if the project or programme meet three main eligibility criteria:
  - Ready for scaling up and having the potential for transformation, promoting a paradigm shift to low-emission and climate-resilient development
  - A request for financing to the GCF of up to USD 10 million of the total project budget
  - The environmental and social risks and impacts are classified as minimal to none

### Project Preparation Facility (PPF)

The Project Preparation Facility (PPF) under GCF has been set up to support Accredited Entities (AEs) in project and programme preparation. It is especially targeted to support direct access entities or NIEs, and micro-to-small size category projects.

For the initial phase of the PPF, a total of USD 40 million has been allocated by GCF, with each request subject to a cap of USD 1.5 million.

Once approved, support is provided in the form of grants and repayable grants, while equity may be considered for private sector projects. Funding proposals developed with the PPF should be submitted to the GCF Board within two years of the approval of a PPF request.

There are a number of different phases in project preparation. Early stages include project identification, concept development and establishing the enabling environment while to mid- and late-stage processes include project due diligence

and project structuring. Each phase has different needs and therefore it is important to review the main outstanding requirements of project development as well as to assess the type of support the project/programme will require.

**PPF support generally covers the following activities:**

- Pre-feasibility and feasibility studies, as well as project design
- Environmental, social and gender studies
- Risk assessments
- Identification of programme/project-level indicators
- Pre-contract services, including the revision of tender documents
- Advisory services and/or other services to financially structure proposed activity
- Other project preparation activities, where necessary; provided that sufficient justification is available

The PPF application must clearly state how the underlying project aligns with the country's national priorities and ensures full country ownership. It is therefore highly recommended that the accredited entities consult with the respective national designated authority (NDA) or focal point on the project or programme concept at an early stage.

**Readiness Support**

The Readiness and Preparatory Support Programme is a funding programme of GCF aimed at enhancing country ownership and access to the Fund, particularly targeted at the most vulnerable countries. The Programme provides financial resources for strengthening the institutional capacities of NDAs or focal points and Direct Access Entities in a country, to efficiently engage with the Fund. Resources may be provided in the form of grants or technical assistance. The Readiness Programme can be accessed by all developing countries. GCF aims for a floor of 50 percent of the readiness support allocation to particularly vulnerable countries.

Up to USD 1 million per country per year may be provided under the Readiness Programme. Of this amount, NDAs or focal points may request up to USD 300,000 per year to help establish or strengthen a NDA or focal point to deliver on the Fund's requirements.

**The major types of activities supported by the programme include:**

- Formulation of national adaptation plans and/or other adaptation planning process by NDAs or focal points
- Capacity building for potential NIEs that have been nominated by their respective NDAs, to enhance their ability to seek accreditation with GCF
- Capacity building support for already GCF accredited entities (post-accreditation support)

**Step-by-step guide: submitting a funding proposal:**

There are a number of steps associated with the submission and appraisal of funding proposals. Note that these steps may change over time as GCF refines its approval processes.

**1. Submitting a concept note (optional)**

Accredited Entities can choose to submit a concept note outlining basic information about a project or programme using the Concept Note template. The objective is to receive preliminary feedback from the GCF Secretariat on whether their proposal aligns with the Fund's objectives and mandate. The Concept Note User's Guide provides guidance on how to develop a concept note. Concept notes for some small-scale projects that meet eligibility criteria may also be considered for the Simplified Approval Process (SAP) and can be submitted using the SAP Concept Note template.

The Accredited Entity must inform the NDA or focal point about its submission of a concept note to GCF. GCF Secretariat feedback about submitted concept notes does not warrant provision of financial resources to support the project.

**2. Submitting a proposal to the GCF Secretariat**

Generally, Accredited Entities submit funding proposals to GCF in consultation with the NDA or focal point of a country. The Funding Proposal Template provides details on what information is required as well as guidance on how to develop the proposal. Funding proposals that are submitted to GCF undergo a rigorous review process and a decision is made by the GCF board whether or not to support the project. Funding proposals must include an Impact Assessment to ensure the project meets the Environmental and Social Standards (ESS), including gender, of the GCF. This requires extensive consultation with those who would be affected by the project, and must be published 120 days before the Board decision for category A (high risk) projects and 30 days for category B (medium risk) projects.



To ensure country ownership, the Accredited Entity is required to submit a no objection letter issued and signed by the NDA of the relevant country associated with the funding proposal. The no objection letter should be submitted within 30 days of the proposal itself, but can be separate from the proposal. Upon submission, the GCF Secretariat carries out a receipt and completeness check by assessing the submitted funding proposal and the technical specifications alongside the documents that need to accompany it. At this stage, the GCF Secretariat may reach out to the Accredited Entity for additional information and provide guidance on how to strengthen the application for a more detailed review.

### 3. Assessment of the funding proposal by GCF

Following the initial completeness check, the GCF Secretariat undertakes a more detailed assessment of the project proposal, including assessing how the project aligns with the six GCF Investment Criteria. The Secretariat also assesses compliance with GCF policies, including, but not limited to:

- Fiduciary standards
- Risk management
- Environment and Social Standards (ESS)
- Monitoring and Evaluation criteria
- Gender policy
- Legal standards

Once the proposal has passed the initial review stage, the GCF Secretariat forwards its assessment, along with the submitted proposal and supporting documents, to the Independent Technical Advisory Panel (ITAP). The Independent Technical Advisory Panel (ITAP), composed of six international experts: three from developing countries and three from developed countries, assesses the funding proposals against the six GCF investment criteria. ITAP may provide conditions and recommendations to the funding proposal at its discretion. At this point, Accredited Entities may be requested by the ITAP to provide clarifications, while liaising with the GCF Secretariat.

### 4. GCF Board Decision

Following review and assessment by the GCF Secretariat and the ITAP, the funding proposal package is submitted to the GCF Board. The package consists of the funding proposal, supporting documents, a no objection letter signed by the NDA, and summary of assessments made by the GCF Secretariat and ITAP.

Based on the GCF Secretariat and ITAP assessments, Accredited Entities may be requested to provide additional clarification about their funding proposal. The GCF Board – generally meeting three times a year - considers the proposal, with a unanimous decision required.

#### The GCF Board can choose one of three possible decisions:

- Approve funding
- Approve funding with the conditions and recommendations that modifications are made to the funding proposal
- Reject the funding proposal

### 5. Legal arrangements

Once a funding proposal is approved by the GCF Board the GCF Secretariat negotiates with the Accredited Entity in order to sign a Funded Activity Agreement (FAA) which lays the groundwork for the implementation phase of the project or programme.

#### Conclusion:

Bangladesh is one of the most vulnerable country due to climate change impacts. On an average Bangladesh spent 10% of its development budget to the climate change adaptation activities and 1 to 2% of its GDP (roughly it is 2-4 billion USD). Bangladesh already established a dedicated climate fund called climate change trust fund and government allocated altogether around 415 million USD. According to NDC up to 2030 Bangladesh needs around 27 billion USD for mitigation and 42 billion USD for adaptation to implement the National determined contribution under the Paris agreement. Bangladesh does not have that financial capacity to implement all the adaptation and mitigation activities. Green climate fund is the opportunity for Bangladesh to access to international climate fund. However, there is fund constraint in the GCF as well as the complex and delaying procedure of GCF is the challenge for Bangladesh. Bangladesh should capacitate itself to get access of this fund. Government should give enough emphasis to get access to the GCF through its two direct access entities as well as international entities.

## Beat Air Pollution and Enjoy Better Life

Mohammad Asadul Hoque\*  
Syed Ahmmad Kabir\*\*

### Introduction:

The earth is as we know lonely planet in our solar system where living matters exist. The existence of living matters on the earth is due to the conducive environment. Life being has been propagated its progeny by using natural resources from environment. The essential natural resources are air, water and soil. Plants and Animals have been taken these natural resources for living. No living matter in the earth lives without air. Animals including Human have been taking oxygen from air. Animal cannot live few seconds without oxygen.

Air is a complex mixture of gaseous substances which exists surrounding us. Nitrogen and Oxygen are the major natural components of air which are about 99% by volume (Nitrogen 78% and Oxygen 21%). In fresh air Carbon Dioxide is also present about 0.0316%. Natural proportion of gaseous substances is an essential for breathing of Animal including Human. When gases, particles biological materials and liquid droplets are not generally components of air but they are present in air and cause harm or discomfort for Human or are unhealthy for human, living organisms and other animal or damage natural environment they are called air pollutants. The introduction of pollutants into the air is called Air Pollution. Man cannot avoid inhaling polluted air. An adult person on an average inhales about 11000 Liter of air per day. Treatment of polluted air is still not feasible and cost also much higher than water treatment. So health and economic cost of Air pollution is much higher than other pollutions. Air pollution is present both inside homes and outside and is responsible for the premature death of seven million people each year, including 600,000 children, according to the UN environmental annual report. Every hour, 800 people are dying, many after years of suffering, from cancer, respiratory illnesses or heart disease directly caused by breathing polluted air.

### Air Pollution Sources:

Air Pollution Sources: Air pollutants are emitted from two major sources. One is Man made source and another is Natural source.

Table-1: Shows possible natural Sources of Air Pollution

| Source            | Pollutants                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Volcanic Eruption | Sulfur Dioxide, Particulate Matter                                           |
| Forest Fire       | Carbon Mono oxide, Carbon dioxide, Oxides of Nitrogen and Particulate matter |
| Dust Storm        | Dust or particulate Matter                                                   |
| Living plant      | Pollen, Fungal Spore, Hair, Feather                                          |
| Dead plant        | Methane, Hydrogen sulfide                                                    |
| Soil              | Virus and Dust                                                               |
| Sea               | Salt Particle, Methyl chloride, Methyl Bromide, Methyl Iodide                |

Table-2: Shows possible Man made Sources of Air Pollution

| Source                                                                                      | Pollutant                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thermal power plant                                                                         | Gas: SO <sub>x</sub> , NO <sub>x</sub> , CO, CO <sub>2</sub> Aerosol: Coal particle, Smoke, and Fly Ash                                             |
| Nuclear power plant                                                                         | Radioactive gas: Sr-90, Cs-137, C-14, Fluoride, Iodine-131, Argon-31, Radon                                                                         |
| Industry                                                                                    | Gas: CO, SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , Hydrocarbon, H <sub>2</sub> S, NH <sub>3</sub> Aerosol: Dust, Smoke                                    |
| Industrial Processing                                                                       | Gas: CO, SO <sub>x</sub> , NO <sub>x</sub> , NH <sub>3</sub> , Organic phosphate, Steam, fog, asbestos                                              |
| Agriculture Processing                                                                      | Gas: SO <sub>x</sub> , Chlorinated hydrocarbons Aerosol: Dust, fog, Smoke, Fly-ash                                                                  |
| Refrigerator industry                                                                       | Gas: Freon gas (Chlorofluorocarbon), Chlorine, Bromine                                                                                              |
| Municipal institution                                                                       | Gas: CO, CO <sub>2</sub> , SO <sub>x</sub> , NO <sub>x</sub> , NH <sub>3</sub> Aerosol: Dust, Smoke, Organic phosphate, Fly-ash                     |
| Residence Fuel (Coal, Gas, Kerosene)                                                        | Gas: CO <sub>2</sub> , CO, H <sub>2</sub> S Aerosol: Particle (Lead & Mercury), Smoke, Fog                                                          |
| Active source                                                                               |                                                                                                                                                     |
| Transportation: Road, Water and Air (Car, Truck, Rail, Ship, Air Plane, Concorde fuel burn) | Gas: CO <sub>2</sub> , CO, H <sub>2</sub> S, NO <sub>x</sub> , SO <sub>2</sub> Hydrocarbon<br>Aerosol: Smoke, Particle (Lead & Mercury), Smoke, Fog |

\*Director (Dhaka Laboratory), Department of Environment

\*\*Senior Chemist (Dhaka Laboratory), Department of Environment

### Pollutant specific sources

Globally, the major sources of the individual air pollutants are briefly listed in Table Not all of these sources are relevant for Bangladesh

Table-3: Major sources of criteria air pollutants (source: USEPA, with minor modifications)

| Pollutant                           | Sources                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon Monoxide (CO)                | Motor vehicle exhaust, kerosene or wood burning stoves.                                                                           |
| Sulfur Dioxide (SO <sub>2</sub> )   | Coal-fired power plants, brick kilns, petroleum refineries, sulfuric acid manufacture, and smelting sulfur containing ores.       |
| Nitrogen Dioxide (NO <sub>2</sub> ) | Motor vehicles, power plants, and other industrial, commercial, and residential sources that burn fuels (e.g. diesel generators). |
| Ozone (O <sub>3</sub> )             | Vehicle exhaust and certain other fumes. Formed from other air pollutants in the presence of sunlight.                            |
| Lead (Pb)                           | Metal refineries, lead smelters, battery manufacturers, iron and steel producers.                                                 |
| Particulate Matter (PM)             | Diesel engines, power plants, brick kilns, industries, windblown and road dust, wood stoves and Construction works                |

### Sources of Air Pollution in Bangladesh

- **Motor Vehicles**  
Combustion of fuels in motor vehicles is, undoubtedly, the most important source of air pollution in the largest of the urban centres, i.e. in Dhaka and Chittagong. Fuel combustion not only produces fine particulates directly but also emits CO, NO<sub>x</sub> and SO<sub>x</sub>. This sector is non point sources of Air pollution.
- **Brick Kilns**  
Brick kilns are a major source of air pollution throughout Bangladesh. Air Pollutants i.e. CO, SO<sub>x</sub>, PM and VOC emit from Brick kiln. Brick making is also one of the largest GHG emissions source in Bangladesh.
- **Industries**  
The Industrial units which emit air pollutants are the cement factories, steel smelters, Lead recycling factory and glass factories. These industrial units emit Particulate Matter and Lead as major pollutants. But the contribution of Air pollution of Industrial sector is very small compare to transportation and Brick Manufacturing sector.
- **Biomass Burning**  
Biomass is extensively used in rural areas of Bangladesh, primarily for cooking. Biomass contributes to more than half of the total primary energy needs in Bangladesh. Biomass burning, especially in traditional cooking stoves, results in significant air pollution, which is harmful to the women and young children who often spend most of their time in the kitchen with a high level of particulates concentration. In rural Bangladesh, majority of people rely on solid biomass fuel and firewood, crop residue dung, and tree leaves accounts for about 97% of total household energy use (Asaduzzaman et al., 2007).
- **Construction Activities**  
Dust is one of the major problems in most urban areas and some rural areas in Bangladesh, especially during the winter. Construction activities without any protection measures produce large volume of dust in urban areas.
- **Power Sector**  
Power sector is one of major air pollution contributing sector. Most of the power plants of our country have been run by Gas and some of power plant has been operated furnace oil.  
NO<sub>x</sub> emits from gas based power plant and Particulate Matter, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, CO emit from Furnace Oil based Power Plant.

### Air Pollution Status of Bangladesh

Like other south Asian countries, Bangladesh has been facing air pollution challenges. All monitoring data which have been collect by Dept. of Environment and CASE project indicates that level of gaseous air pollutants such as SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO and O<sub>3</sub> is not exceeded national standard. The conc. of these gaseous pollutants is significantly lower than national standard. But PM conc. (both PM<sub>10</sub> and PM<sub>2.5</sub>) is above the national standard in Dhaka and Chittagong city especially in dry season from Oct to May. Bangladesh is one of the dense populated countries in the world and Dhaka is ranked number one densely populated megacity. A large number of people are moving from one place to another.

This movement is done by different mode of transportation and the most common mode is ride on motor vehicles. Our road infrastructures is not sufficient for taking growing load of Motor vehicles so traffic jam is general phenomena in major cities and over crowded motor vehicles emit large volume of air pollutants. The movement of Motor vehicle also suspends road side dust.

A lot of Brick Kilns have been operated in dry season (Oct-may) every year suburban area of Dhaka city. Norwegian Institute for Air Research (NILU) has been done source apportionment of four major cities (Dhaka, Chittagong, Khulna and Rajshahi) under BAPS project of DOE. The source apportionment study has been indicated that in Dhaka city Brick Kiln is major contributor of PM conc. followed transport sector, roadside dust, Biomass burning.

Recent data has been revealed that the contribution of Brick kiln is decreased; but still this sector is major contributor for PM conc. in Bangladesh.

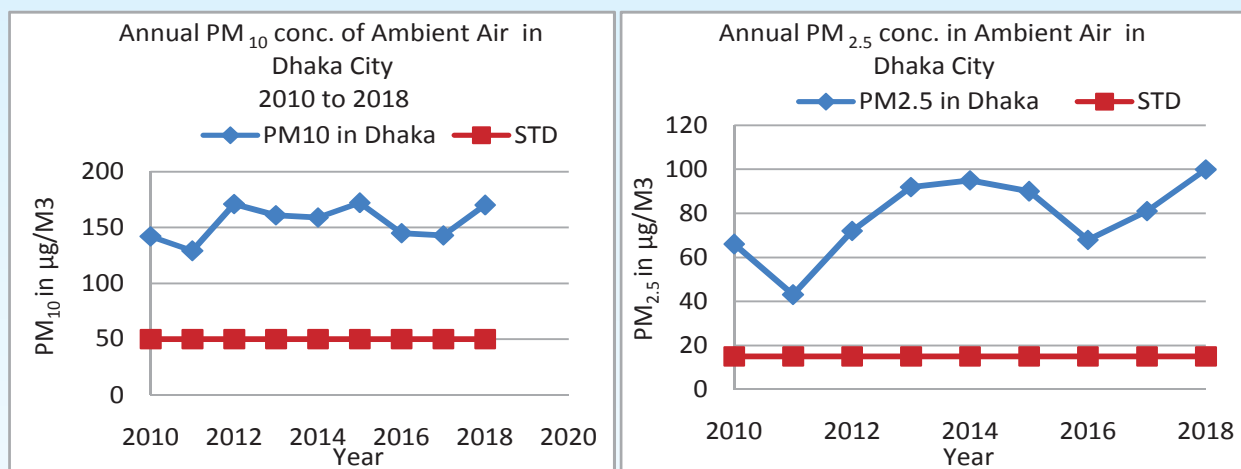


Fig-1 and Fig-2 show the Annual PM<sub>10</sub> and PM<sub>2.5</sub> conc. of Ambient Air in Dhaka City during 2010 to 2018 period monitoring by CAMS

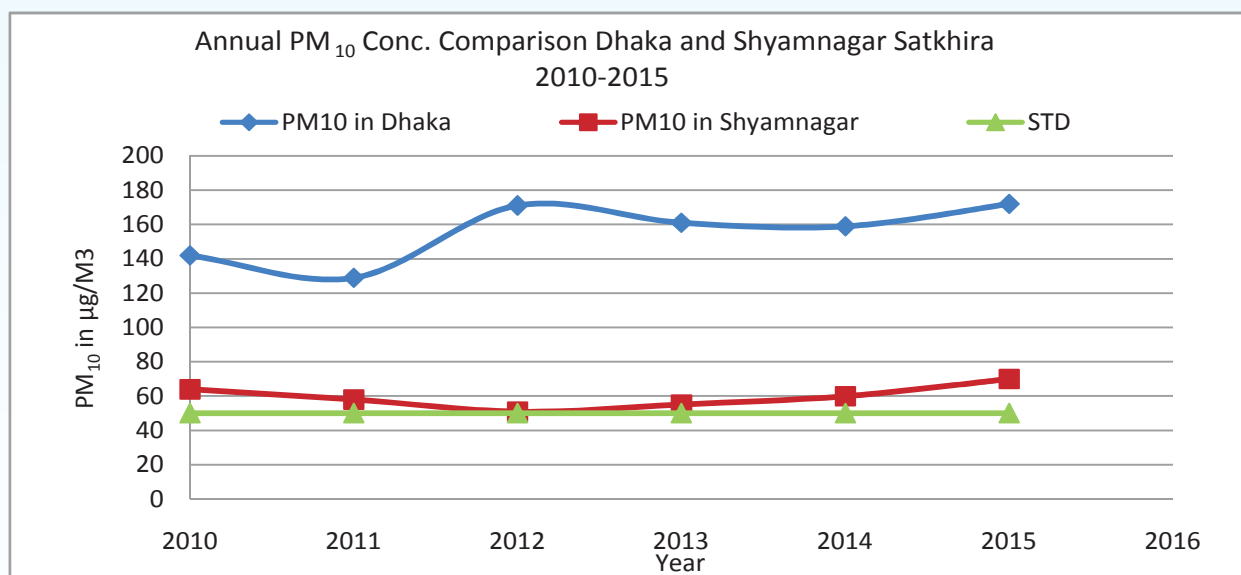


Fig-3: shows Annual PM<sub>10</sub> Conc. Comparison Dhaka and Noornagar, Shyamnagar Satkhira 2010-2015

Fig-1, Fig-2 show annual conc. of PM<sub>10</sub> and PM<sub>2.5</sub> from 2010 to 2018 which indicates higher PM<sub>10</sub> and PM<sub>2.5</sub> Value in Dhaka city during this period. This data is collected from two CAMS of Dhaka city under CASE project of DOE. Fig-3 is shown the comparison of PM<sub>10</sub> conc. during 2010 to 2015 periods Dhaka and remote rural area and Fig-3 shows PM<sub>10</sub> conc. in Dhaka city is 2 times higher than Noornagar, Shyamnagar, Satkhira which is one of the remotest rural areas of Bangladesh. In 10 KM radius, there is source of air pollution. The place is adjacent to rural road. Only motor cycles ply through road. It is transboundary Air pollution monitoring station of DOE which has been



established under Male decoration project. This monitoring station has been run by DOE. Baseline dust conc. of Bangladesh is higher than national Standard.



Fig-4 Noornagar, Shyamnagar Monitoring Station



Fig-5: Darussalam CAMS in Dhaka City

### Health, Economic and social Impact of Air Pollution

Ambient (outdoor air pollution) air pollution is a major cause of death and disease globally. The health effects range from increased hospital admissions and emergency room visits, to increased risk of premature death. An estimated 4.2 million premature deaths globally are linked to ambient air pollution, mainly from heart disease, stroke, chronic obstructive pulmonary disease, lung cancer, and acute respiratory infections in children.

Worldwide ambient air pollution accounts for:

- 29% of all deaths and disease from lung cancer
- 17% of all deaths and disease from acute lower respiratory infection
- 24% of all deaths from stroke
- 25% of all deaths and disease from ischaemic heart disease
- 43% of all deaths and disease from chronic obstructive pulmonary disease

\*\*\*Source is the research finding of WHO

Pollutants with the strongest evidence for public health concern include particulate matter (PM), ozone (O<sub>3</sub>), nitrogen dioxide (NO<sub>2</sub>) and sulphur dioxide (SO<sub>2</sub>).

The health risks associated with particulate matter of less than 10 and 2.5 microns in diameter (PM<sub>10</sub> and PM<sub>2.5</sub>) are especially well documented. PM is capable of penetrating deep into lung passageways and entering the bloodstream causing cardiovascular, cerebrovascular and respiratory impacts. In 2013, it was classified as a cause of lung cancer by WHO's International Agency for Research on Cancer (IARC). It is also the most widely used indicator to assess the health effects from exposure to ambient air pollution.

In children and adults, both short- and long-term exposure to ambient air pollution can lead to reduced lung function, respiratory infections and aggravated asthma. Maternal exposure to ambient air pollution is associated with adverse birth outcomes, such as low birth weight, pre-term birth and small gestational age births. Emerging evidence also suggests ambient air pollution may affect diabetes and neurological development in children. Considering the precise death and disability toll from many of the conditions mentioned are not currently quantified in current estimates, with growing evidence, the burden of disease from ambient air pollution is expected to greatly increase.

According to World Bank report named 'Enhancing Opportunities for Clean and Resilient Growth in Urban Bangladesh: Country Environmental Analysis 2018' in Bangladesh, of the total economic losses, the ambient air t

pollution cost is \$2.42 billion while household air pollution cost is \$1.27 billion. This report also state that Bangladesh has been losing 1% of its GDP every year due to air pollution. This implies the living standard of general people especially low income group will decline.

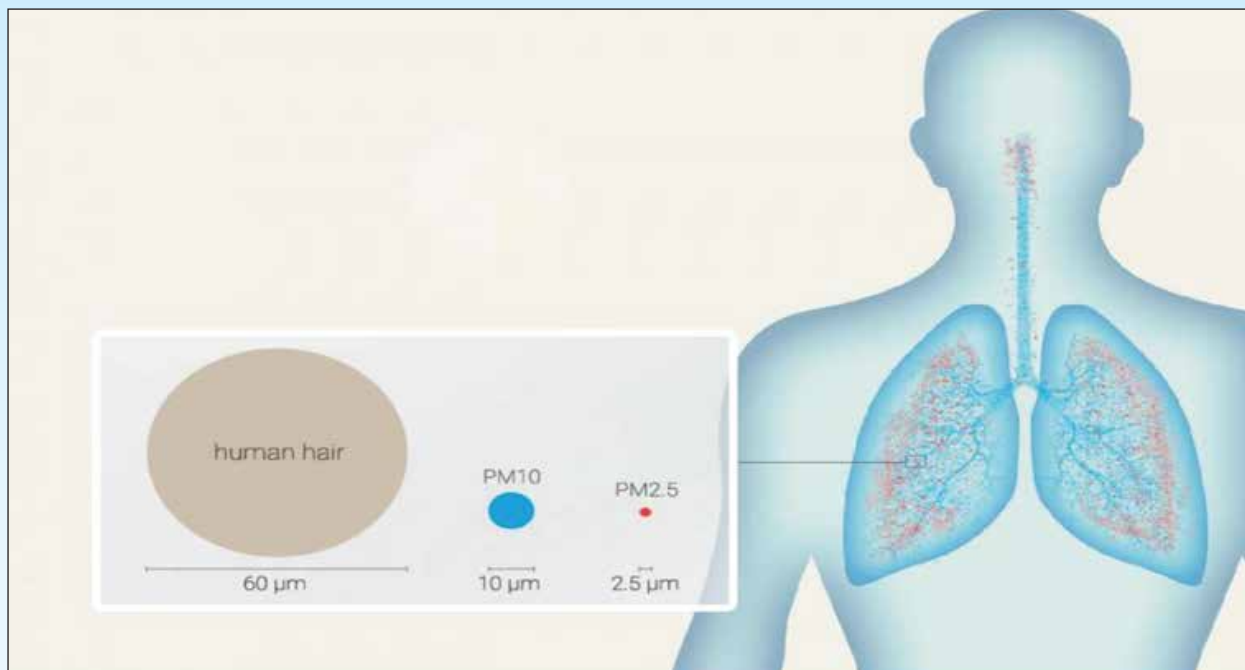


Fig-6 shows the effects of PM on human health

The projected increase in concentrations of PM2.5 and ozone will in turn lead to substantial effects on the economy. According to the calculations in this report, global air pollution-related healthcare costs are projected to increase from USD 21 billion (using constant 2010 USD and PPP exchange rates) in 2015 to USD 176 billion in 2060. By 2060, the annual number of lost working days, which affect labour productivity, are projected to reach 3.7 billion (currently around 1.2 billion) at the global level.

The market impacts of outdoor air pollution, which include impacts on labour productivity, health expenditures and agricultural crop yields, are projected to lead to global economic costs that gradually increase to 1% of global GDP by 2060.

The most dangerous consequences from outdoor air pollution are related to the number of premature deaths. This report projects an increase in the number of premature deaths due to outdoor air pollution from approximately 3 million people in 2010, in line with the latest Global Burden of Disease estimates, to 6-9 million annually in 2060. A large number of deaths occur in densely populated regions with high concentrations of PM2.5 and ozone, especially China and India, and in regions with aging populations, such as China and Eastern Europe.

The annual global welfare costs associated with the premature deaths from outdoor air pollution, calculated using estimates of the individual willingness-to pay to reduce the risk of premature death, are projected to rise from USD 3 trillion in 2015 to USD 18-25 trillion in 2060. In addition, the annual global welfare costs associated with pain and suffering from illness are projected to be around USD 2.2 trillion by 2060, up from around USD 300 billion in 2015, based on results from studies valuating the willingness-to-pay to reduce health risks.

Source: Study of Economic Consequence of Outdoor Air Pollution by OECD

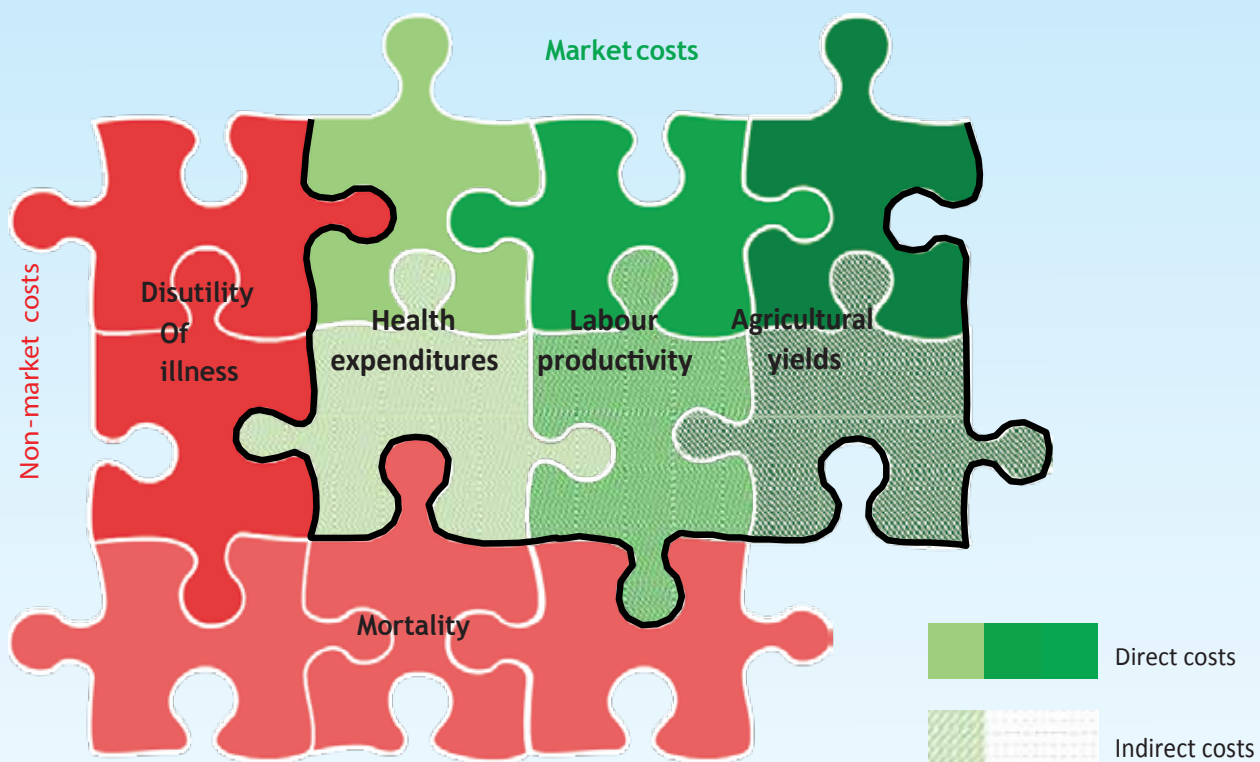


Figure -7: Cost categories considered

Table-4: Projected health impacts at global level

|                                                          | 2010  | 2060   |
|----------------------------------------------------------|-------|--------|
| <b>Respiratory diseases (million number of cases)</b>    |       |        |
| Bronchitis in children aged 6 to 12                      | 12    | 36     |
| Chronic bronchitis (adults, cases)                       | 4     | 10     |
| <b>Asthma symptom days (million number of days)</b>      |       |        |
| Asthma symptom days (children aged 5 to 19)              | 118   | 360    |
| <b>Healthcare costs (million number of admissions)</b>   |       |        |
| Hospital admissions                                      | 4     | 11     |
| <b>Restricted activity days (million number of days)</b> |       |        |
| Lost working days                                        | 1 240 | 3 750  |
| Restricted activity days                                 | 4 930 | 14 900 |
| Minor restricted activity days (asthma symptom days)     | 630   | 2 580  |

Table-5: Welfare costs from premature deaths due to air pollution, central projection Billions of USD, 2010 PPP exchange rates

|                            | 2015  | 2060           |
|----------------------------|-------|----------------|
| OECD America               | 440   | 1100 - 1140    |
| OECD Europe                | 730   | 1660 - 1690    |
| OECD Pacific               | 250   | 680 - 710      |
| Rest of Europe & Asia      | 1 130 | 7 730 - 9850   |
| Latin America              | 80    | 470            |
| Middle East & North Africa | 110   | 1 030 - 1180   |
| South and South-East Asia  | 380   | 5300 - 9950    |
| Sub-Saharan Africa         | 40    | 330 - 340      |
| World                      | 3 160 | 18300 - 25330  |
| OECD                       | 1 420 | 3440 - 3540    |
| Non-OECD                   | 1 740 | 14 860 - 21790 |

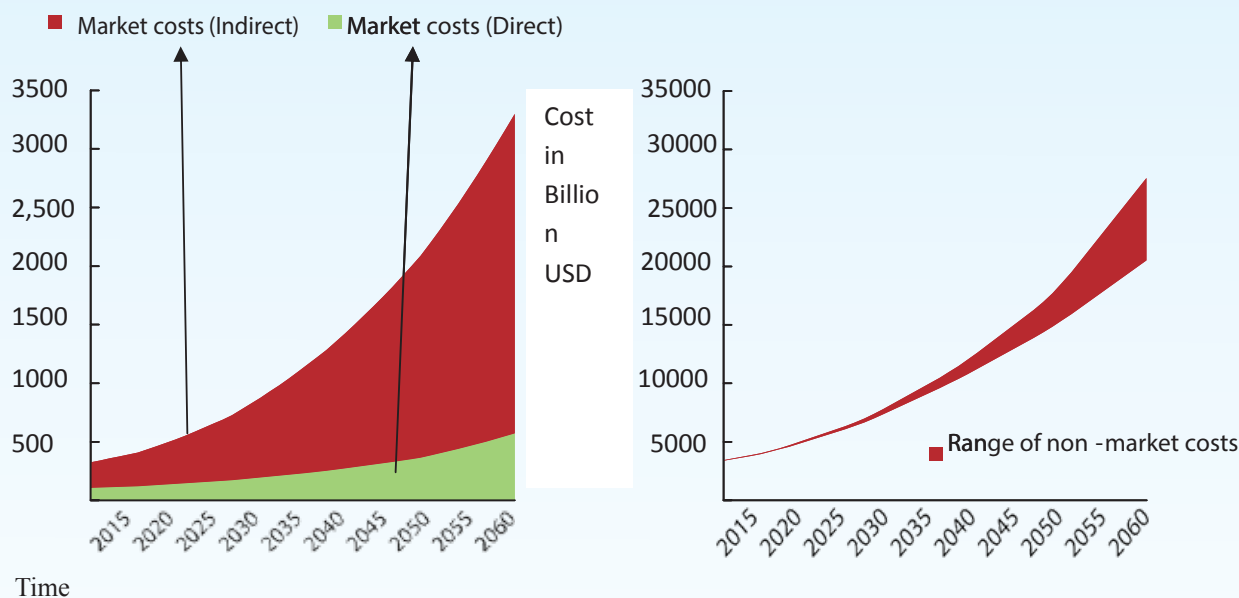


Fig-8: Evolution of the welfare costs of air pollution over time, central projection Billions of USD, 2010 PPP exchange rates

Table-6: Total welfare costs of air pollution, central projection

|                                         | 2015  | World           |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|
|                                         | 2015  | 2060            |
| TOTAL market impacts (billions USD)     | 330   | 3 300           |
| Share of income (percentage)            | 0.6%  | 1.5%            |
| Per capita (USD per capita)             | 50    | 330             |
| TOTAL non-market impacts (billions USD) | 3 440 | 20 540 - 27 570 |
| Share of income                         | 6%    | 9 - 12%         |
| Per capita                              | 470   | 2 060 - 2 770   |



#### **Air Pollution Management in Bangladesh:**

Dept. of Environment is responsible for taking all types of action to control environment pollution including air pollution. Environmental Conservation Act 1995 has been empowered DG, DOE to take legal action against polluters. A number of policy initiatives have been taken to control sector specific air pollution control such as Lead Phase out from Petrol, Ban on Two-Stroke Three-Wheelers in Dhaka, Promoting CNG Conversion of Vehicles, , Ban on Older Vehicles, Policies to Reduce Emissions from Brick Kilns by introducing improved brick burning technology and formulating new Brick burning acts 2013, revise New Vehicle Emissions Standards, Policies on Import of Personal Vehicles, Supply of Improved Cooking Stoves (ICS) within subsidized prices , Ban on High Sulfur Coal. Some policy measures were effectively reduced air pollution and some were not as effective as expectation.

Dept. of Environment has been taking different types of actions which are described in Rio declaration.

Precautionary Principle: Rio article 15 state “In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation”.

Before setting new industrial unit, the proponent has to take Site/environment Clearance Certificate from DOE. DOE has right to give SC/ECC or reject application of ECC or SC apprehending environmental Degradation.

Polluters pay principle : Rio article 15 state “National authorities should endeavor to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment”.

One of the important activities of DOE is monitoring and enforcement. If any industrial unit or project violates ECA’1995 and ECR’1997 or emit pollutants exceeding tolerable limit or damage ecosystem. The industrial unit has to pay for violation. In 2017-18 fiscal year DOE has collect about TK. 11.47 crores as compensation for damaging environment and ecosystem from 571 industries or projects including air polluting industries.

Preventive Principle: Rio article 15 state “Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority”.

All red category industries have to conduct EIA study after Site clearance and before ECC. DOE has been reviewing EIA. DOE has empowered by ECR’1997 to modify or reject the report with valid reason.

A lot of policy decisions and corrective measures has been taken to tackle air pollution; but still we far behind from our goal. We need coordinative approach from all govt. and non govt. agencies to do this gigantic task above mass awareness among common people. We shall have to success for better future and better life.

#### **Sources of Write up**

- 1) UN Environmental Annual Report-2018
- 2) Source Apportionment Report by NILU Under BAPS Project of DOE
- 3) Trans-boundary Air Pollution Monitoring Report of DOE under Male’ Declaration Project
- 4) WHO Study Report on Impacts of Air Pollution On Human Health

## Implementation of Climate Change Adaptation Funds by sectoral agencies in Bangladesh

Dr. Md. Saifur Rahman\*

### Aims and overview

The international organizations like the United Nations and the World Bank recognize the climate change as the hindrances to achieve sustainable development goals, as well as identify development opportunities offered by climate action. In the context of development trajectory and budgetary tension, national and international actors, as potential policy options, have launched a number of funding programs in Bangladesh that aim to adapt the visible climate challenges. However, the climate policy making often times considers fail to generate the desired outcomes or impacts due to implementation problems. The success of policy implementation largely depends on a country's administrative capabilities and settings, since; they do much policy work of the government. In this context, having clearer understanding of the country's administrative context with hands-on climate adaptation funding data (Annual Development Program [ADP] based project funds and Bangladesh Climate Change Trust Funds [BCCTF]) from 2009 to 2017, the study aims to examine the state administrative set-up and implementation status of climate adaptation funds in sectoral agencies in Bangladesh. The study indicates that climate activities mean the engagement of different actors/agencies. The findings suggest management of water resources is vital and being placed as the key policy priority in the country. The policy actors, now, may have a clear picture regarding who are doing what and how much, in the adaptation policy arena, which they might duly consider formulating future policies and plan of action.

### Country context: Climate adaptation funding policy in Bangladesh

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) identified that Bangladesh is one of the worst victims of climate induced insecurities and disasters, includes earthquakes, cyclones, tsunamis, floods, sea level rise, droughts, land degradation and deforestation, loss of biodiversity, soil degradation, and so on. During last 40 years, the economic losses in Bangladesh were about \$12 billion due to the climate change impacts (World Bank, 2016). Consequently, climate change adaptation is a national priority in this country. Since, the government is a signatory to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the country developed appropriate climate adaptation policy framework in course of time complying the regime's guiding principle, in close cooperation and coalition with international development actors. The Bangladesh Climate Public Expenditure and Institutional Review in 2012 mentioned that the government spent approx 6–7% of its annual budget during 2009–2011 on climate sensitive activity (CPEIR, 2012). Importantly, Bangladesh is recognized internationally for its cutting-edge achievements in addressing climate change (World Bank, 2016). With the concerns of climate vulnerability, the nation adopted the National Adaptation Program of Action (NAPA) in 2005 and subsequently, the Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) in 2009 (MoEF 2005, 2009). The BCCSAP is the principle national strategic climate policy framework to set/direct all climate development activities in Bangladesh. This policy framework included both adaptation and mitigation action programs, consisting of six thematic areas: food security, social protection and health; comprehensive disaster management; infrastructure; research and knowledge management; mitigation and low carbon development; and capacity building and institutional strengthening (MoEF, 2009). The country uses its own limited resources purposefully within the framework of BCCSAP. Hence, in 2010, the Government established two funding mechanisms include Climate Change Trust Fund (BCCTF) as well as Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) (MoEF, 2012). The former one is completely based on domestic budgetary allocations source (current amount is US\$300 million) (ibid) and other one, multi-donor trust fund i.e. relied on Development Partners funding assistances (US\$188 million) (BCCRF, 2016). Besides these two, government implements climate development activities, through so-called Annual Development Program (ADP) both from domestic and donor funds. State administrative setup of the climate change adaptation regime in Bangladesh Climate activities mean the engagement of different actors/agencies. The state administrative framework related to climate adaptation consists of functional line bureaucracies and cross-cutting bureaucracies (fig. 2). The functional line bureaucracies consisting of various sectoral ministries (e.g. ministries related to agriculture, water resources, local government and rural development etc.) including the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), and their climate related Units, Wings, Focal Points, and subordinate departments (e.g. Department of Environment (DoE)). The MoEFCC and its own subordinate agency (DoE) are the core leading institutions for making policy decision, coordination and management of climate related policies and plan of actions.

\*Senior Assistant Chief, Ministry of Environment, Forest and Climate Change

The Bangladesh Forest Department (BFD) administers the implementation of forest-related climate change policies and projects (Rahman and Giessen, 2014; Rahman and Giessen, 2017). The sectoral line ministries with the help of its subordinate departments/agencies (which are the technical arms of the ministry) implement climate adaptation activities at the grassroots. The specialized agency (Climate Change Trust) belongs to the MoEFCC, coordinates and manages only Bangladesh Climate Change Trust Fund.

This climate regime importantly consists of supreme decision making body of the state in a form of National Environment Committee headed by the Hon'ble Prime Minister and National Steering Committee on Climate Change chaired by the Minister, MoEFCC, which are largely responsible for strategic policy guidance and oversight, as well as coordination and monitoring of management and implementation of climate change adaptation action plan in Bangladesh. The MoEFCC provides necessary secretarial and other technical services to make it operational.

In addition, the cross-cutting bureaucracies are consisted of public administration, planning, finance and foreign affairs-related bureaucracies. These are mostly responsible for supplying inputs through personnel management, short to long term planning, allocation and mobilization of resources, and negotiations to implement climate policy successfully. The apex body - Cabinet consisting of policy makers provides strategic guidance, and approves (climate) policies.

The outspreading cooperation and support from these cross-cutting bureaucracies in terms of various policy instruments, is expected to have incremental effects on the function of existing line bureaucracies, ultimately to development and implementation of climate adaptation policy and plan of action. For example, the line ministries, its units and focal points including the MoEFCC has been served by the officials of the General BCS Administration Cadre (Huque, 2010; Zafarullah, 2003). The career management (i.e. positioning, promotion) of these officials is controlled by the Ministry of Public Administration (MoPA) and the ministry by positioning the officials in various hierarchies of the functional climate related ministries and agencies, has been playing a pivotal role in guiding climate adaptation policy. The effective implementation outcome related to climate change adaptation policy is largely be determined by the positive interaction of both the functional line ministries and cross-cutting bureaucracies. Moreover, a number of NGOs, individuals, media and civil society actors are expected to extend their expert support in the very process of climate change adaptation in Bangladesh, but they probably have a fragmented decision making power over this issue at government level (Zafarullah, 2007; Ayers et al. 2014).

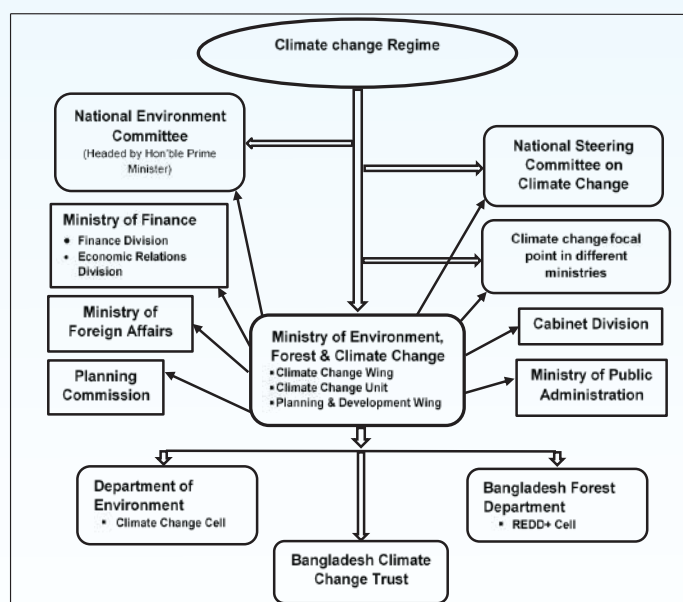


Fig. 1: Functional administrative set up of climate change regime at the center in Bangladesh

*The Annual Development Program (ADP) is the government planning document prepared for a single fiscal year which lists an array of development projects for different sectors together with brief funding arrangement (Rahman et al. 2016).*

*It's a specialized fund (established in 2010) are providing by the government's domestic sources to implement climate sensitive activities, particularly adaptation activities in Bangladesh.*

### Implementation of climate adaptation funds by sectoral agencies in Bangladesh

Implementation of climate adaptation funds means involvement of a lot of agencies has simultaneously been executing both the ADP-based as well as BCCTF-based funding programs in Bangladesh.

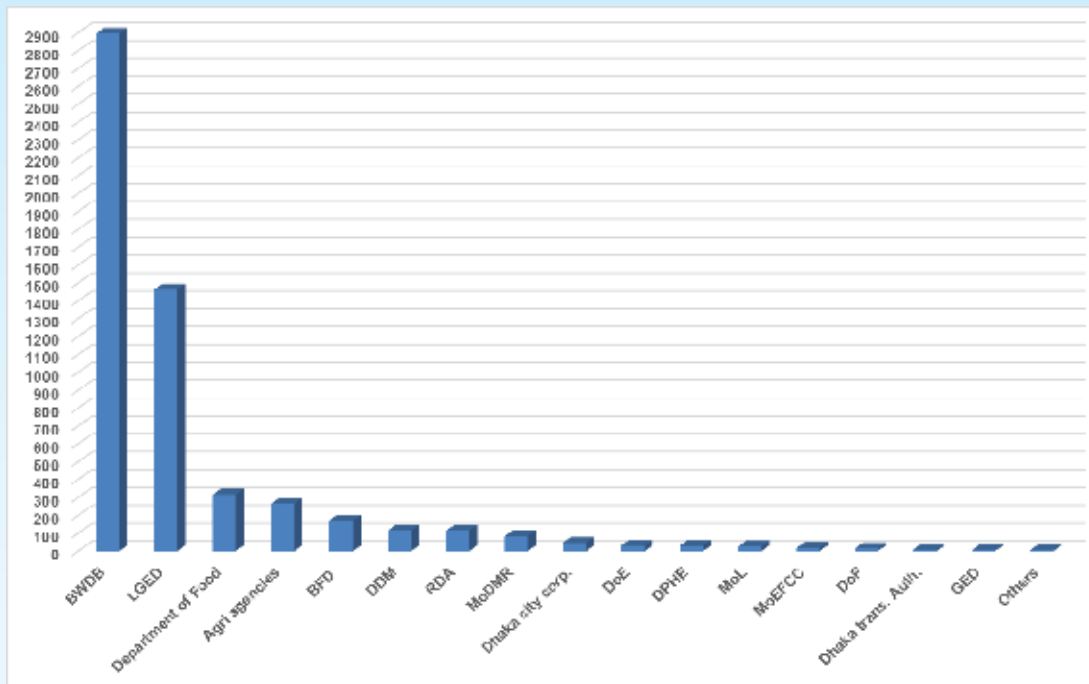


Fig. 2 Implementation of climate adaptation funds by sectoral lead agencies based on Annual development Program (ADP) projects from 2009 to 2017

*Note: Data collected and adapted from Rahman and Tosun, 2018 and Bangladesh Planning Division website (<https://plandiv.gov.bd/>). Here, X-axis represents leading agencies which are responsible for implementing the climate adaptation funds, Y-axis refers amount of funds in Million US\$. In X-axis, BWDB=Bangladesh Water Development Board, LGED=Local Government Engineering Department, Agri agencies=Agriculture ministry and agencies, like, Department of Agriculture Extension (DAE), BMDA=Barind Multipurpose Development Authority (BMDA), Bangladesh Agricultural Development Corporation, Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) and Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI), BFD=Bangladesh Forest Department, DDM=Department of Disaster Management, RDA=Rural Development Academy, MoDMR=Ministry of Disaster Management and Relief, Dhaka City Corp.=Dhaka City Corporation, DoE=Department of Environment, DPHE=Department of Public Health Engineering, MoL=Ministry of Land, MoEFCC=Ministry of Environment Forest and Climate Change, DoF=Department of Fisheries, Dhaka trans. Auth.=Dhaka Transport Authority, GED=General Economics Division, Others= Finance Division (FD), River Research Institute (RRI), Planning Commission (PC) and Local Government Division (LGD).*

ADP-based funds: Bangladesh Water Development Board, a leading agency responsible for management of water resources in the country, leads implementation of this fund and possessed almost half of the total funds in this category (fig. 2). Local Government Engineering Department, a central department mandated for management of infrastructure at local level, had funds almost half of the water board to implement its climate adaptation tasks (fig. 2). A number of lead agencies related to food, agriculture, forestry, rural development and disaster, in addition, contributed considerably by implementing concerned sectoral adaptation tasks in the country (fig. 2). Department related to public health, environment and especially local government body had negligible involvement in executing this big ADP-based project funds (Rahman and Tosun, 2018).

BCCT funds: It is remarkable that almost two-thirds of the BCCTF scheme were implemented by the water board (fig. 3). Pourashava – a typical urban local government unit and local government engineering department took part considerably to execute the adaptation funds (fig. 3). In addition, a sizable amount was spent by the relevant forest, agriculture, environment and disaster management agencies (fig. 3).

It implies management of water resources is vital and being placed as the key policy priority in the country. The water related adaptation tasks necessarily includes management of watercourses (dredging and excavation of rivers, canals



etc.), construction of polders, embankments, protection of river banks, ameliorate water logging and so on – a lack of scientific management of the above accelerates the vulnerability emerging from water related disasters and extreme climatic events. Local engineering department and other local bodies construct and manage local hard and soft infrastructure with an aim to adapt the climate challenges as well as to ameliorate the environment. Agricultural agencies and research bodies intend to manage ground water for irrigation, particularly in the water scarcity areas (e.g. Barind Areas). The research agencies perform research to invent climate resilient rice/crop varieties in the country. The disaster management agency performs its function by constructing/maintaining disaster friendly shelter (e.g. cyclone shelter, flood shelter etc.) for the vulnerable communities. The forest department is active in implementing adaptation funds by creating/conserving/maintaining forest biodiversity, particularly in the coastal climate vulnerable regions.

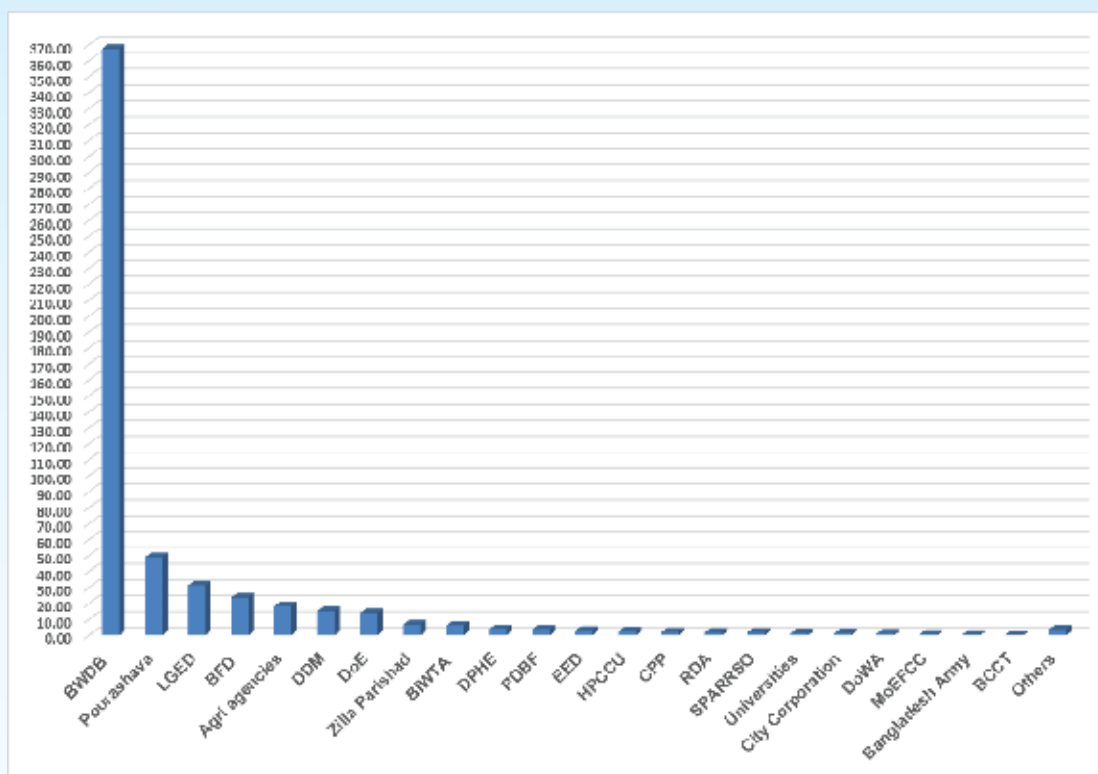


Fig. 3: Implementation of climate adaptation funds by sectoral lead agencies based on Bangladesh Climate Change Trust Fund (BCCTF) projects from 2009 to 2017

Note: Data collected and adapted from Rahman and Tosun, 2018 and archives of the Bangladesh Climate Change Trust Office. Here, X-axis represents leading agencies which are responsible for implementing the climate adaptation funds, Y-axis refers amount of funds in Million US\$. In X-axis, BWDB=Bangladesh Water Development Board, Pourashava=a typical urban local government body in Bangladesh, LGED=Local Government Engineering Department, BFD=Bangladesh Forest Department, Agri agencies=Agriculture agencies, like, Department of Agriculture Extension (DAE), BMDA=Barind Multipurpose Development Authority (BMDA), Bangladesh Agricultural Development Corporation, Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI), Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) and Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA), DDM=Department of Disaster Management, DoE=Department of Environment, ZillaParishad=a typical local government body at the district level of Bangladesh, BIWTA=Bangladesh Inland Water Transport Authority, DPHE=Department of Public Health Engineering, PDBF=PalliDaridroBimochon Foundation (a self-governed micro-finance institution, which aims to eradicate poverty in Bangladesh), EED=Education Engineering Department, HPCCU=Health Promotion and Climate Change Unit, CPP=Cyclone Preparedness Program, RDA=Rural Development Academy, SPARSO=Space Research and Remote Sensing Organization, City Corporation= an urban local body located in the big cities, DoWA=Department of Women Affairs, MoEFCC=Ministry of Environment Forest and Climate Change, BCCT=Bangladesh Climate Change Trust.

## Conclusion

Overall, the results depict the administrative settings and participating institutions in implementing climate adaptation funds in Bangladesh. It represents that climate adaptation tasks are quite cross-sectoral –touches a wide variety of sectors and institutes from central to local(cf. Galarraga et al. 2011, Hallegatte et al.2011, Bauer et al. 2012). The policy actors, now, may have a clear picture regarding who are doing what and how much, in the adaptation policy arena, which they might duly consider formulating future policies and plan of action. The findings should help the decision actors recognize precisely, which actors are proactive, less active and even excluded implementing the adaptation tasks. For example, the results indicate that health, fisheries, ICT, education, transport, commerce, industry and even environment sectors are less active or completely absent in the field of climate adaptation. The result, however, implies that community based funding schemes based on active community participation was not prominent in performing climate adaptation jobs. National and international development actors, now, could identify the active players in the field, and would make collaboration and partnerships to better manage and implement the climateadaptation policy issues in Bangladesh.

## References

1. Ayers, J. M., Huq, S., Faisal, A. M., & Hussain, S. T. (2014). Mainstreaming climate change adaptation into development: a case study of Bangladesh. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 5(1), 37-51.
2. Bauer, A., Feichtinger, J., and Steurer, R., 2012. The governance of climate change adaptation in 10 OECD countries: challenges and approaches. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 14 (3), 279–304. doi:10.1080/1523908X.2012.707406
3. BCCRF, 2016. Bangladesh Climate Change Resilience Fund. Retrieved from <https://bccrf-bd.org/> (Accessed 28 January 2016).
4. CPEIR (Bangladesh Climate Public Expenditure and Institutional Review) 2012.Public expenditure in climate change. General Economic Division, Planning Commission, Bangladesh Government. URRL: [https://www.unpeir.org/sites/default/files/e\\_library\\_documents/Bangladesh\\_Climate\\_Public\\_Expenditure\\_and\\_Institutional\\_Review\\_2012\\_0.pdf](https://www.unpeir.org/sites/default/files/e_library_documents/Bangladesh_Climate_Public_Expenditure_and_Institutional_Review_2012_0.pdf) Accessed 21 July 2018
5. Galarraga, I., Gonzalez-Eguino, M., and Markandya, A., 2011. The role of regional governments in climate change policy. *Environmental Policy and Governance*, 21 (3), 164–182. doi:10.1002/eet.572
6. Hallegatte, S., Lecocq, F., and de Perthuis, C., 2011. Designing climate change adaptation poli-cies. An economic framework. Policy Research Working Paper 5568. Washington, DC: World Bank.
7. Huque, A. S. (2010). Traditions and bureaucracy in Bangladesh. In M. Painter & G. Peters (Eds.), *Tradition and public administration* (pp. 57–66). London, UK: Palgrave Macmillan.
8. MoEF, 2005. National Adaptation Program of Action-2005. Ministry of Environment and Forests. Government of the People's Republic of Bangladesh and UNDP, Dhaka, Bangladesh.
9. MoEF, 2009. Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan-2009. Ministry of Environment and Forests. Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.
10. MoEF, 2012. Rio+20: Bangladesh national Report on Sustainable Development. Ministry of Environment and Forests, Peoples' Republic of Bangladesh.
11. Rahman, M.S., Tosun, J. (2018). State bureaucracy and the management of climate change adaptation in Bangladesh. *Review of Policy Research*, 35(6), 835-858.
12. Rahman, M.S., Giessen, L. (2017). The power of public bureaucracies: forest-related climate change policies in Bangladesh (1992–2014). *Climate Policy*, 17 (7): 915-935.
13. Rahman, M.S., Giessen, L. (2014). Mapping international forest related issues and main actors' positions in Bangladesh. *International Forestry Review*, 16 (6), 586-601.
14. World Bank 2016. Bangladesh: Building Resilience to Climate Change. <http://www.worldbank.org/en/results/2016/10/07/bangladesh-building-resilience-to-climate-change>. Accessed on 15 January 2018.
15. Zafarullah, H. (2003). Public administration in Bangladesh: Political and bureaucratic dimensions. In K. Tumma-la (ed.) *Comparative bureaucratic systems*. Lanham, MD: Lexington Books.
16. Zafarullah, H. (2007). Bureaucratic elitism in Bangladesh: The predominance of generalist administrators. *Asian journal of political science*, 15(2), 161-173.

## Bringing Worth to Waste

Khadem Mahmud Yusuf\*

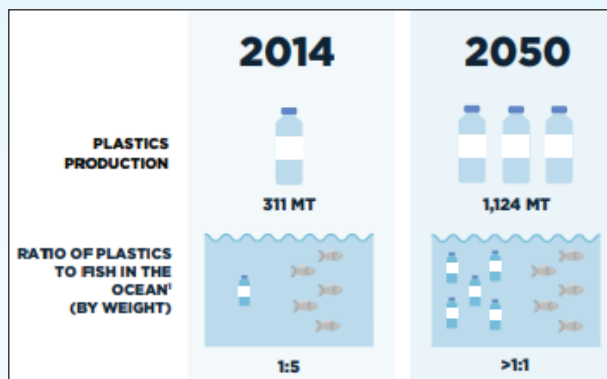
In 1907 the invention of Bakelite brought about a revolution in materials by introducing truly synthetic plastic resins into world commerce. By the end of the 20th century, however, plastics were found to be persistent pollutants of many environmental niches, from Mount Everest to the bottom of the sea as well as Plastics have become the ubiquitous workhorse material of the modern economy combining unrivalled functional properties with low cost. Their use has increased twenty-fold in the past half-century and is expected to double again in the next 20 years. Today nearly everyone, everywhere, every day comes into contact with plastics especially plastic packaging.

While delivering many benefits, the current plastics economy has drawbacks that are becoming more apparent by the day. Plastics can remain in the landfill and ocean for hundreds of years in their original form and even longer in small particles, which means that the amount of plastic in the landfill and ocean cumulates over time.

According to UN Environmental initiative every year 5,000 million plastic bags, 4,800 million plastic water bottle has been used, and 80,000,00 MT plastic has been thrown away in ocean. The best research currently available estimates that there are over 150 million tons of plastic wastes in the ocean today. Without significant action, there may be more plastic than fish in the ocean, by weight, by 2050. Even by 2025, the ratio of plastic to fish in the ocean is expected to be one to three, as plastic stocks in the ocean are forecast to grow to 250 million tons in 2025.

### Plastic Wastage Scenario in Bangladesh

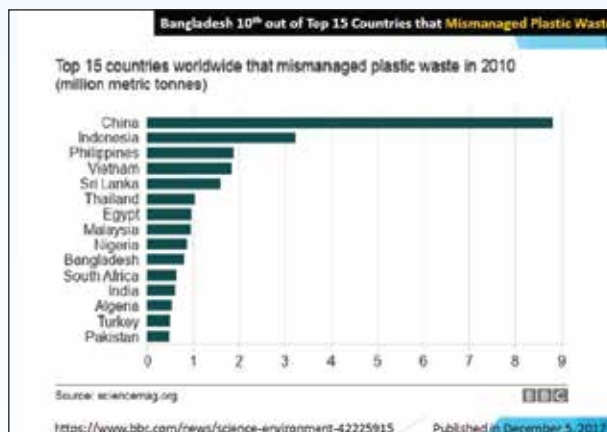
According to BBC Bangladesh is 10th out of top 15 countries that mismanaged plastic waste where India is 12th though their population is 7 times higher than us. The average plastic consumption in Bangladesh is about 2 kg per person. In contrast, in India it is 6 kg and 40 kg in Gulf countries and 10 kg in Southeast Asia. So the plastic consumption per capita in Bangladesh is very much high.



Research by the Ellen Mac Arthur Foundation

### Pioneering the concept of bottle to bottle recycling

Bangladesh Petrochemical Company Limited (BPCL) is pioneering the concept of creating worth out of waste in Bangladesh being the first post-consumer PET bottle recycling plant of the nation. Its operations epitomize the 'recover and recycle' business model in which post-consumer PET bottles that used to be considered waste is revived for new use. This green initiative has set up a plant that is capable of producing 10,500 metric tons (MT) of recycled PET resin per year using used PET bottles as raw materials.



PET bottle manufacturing industry of Bangladesh was fully dependent on imported PET resins until BPCL provided bottle makers the option to source PET resins locally. It is thus helping the country save valuable foreign currency as well. It will save Bangladesh foreign currency of USD 10 million for PET Resin per annum. Beverage producer, yarn manufacturers and food packaging companies can reduce BDT 150 million from their raw materials cost and at least 3 months lead time of procuring the raw materials.

\*Managing Director & CEO, Bangladesh Petrochemical Company Ltd.

Bangladesh spends \$225 million a year on import of more than 1.4 lakh tones of PET resins for producing PET products and synthetic yarn. On an average, 400 crore PET bottles are manufactured every year in Bangladesh and most of them are discarded after being used only once. Within four months of the launch of its commercial production, the BPCL got almost a ready market to sell the recycled PET resins, which are at least 20 percent cheaper than the imported ones. To name a few; AST Beverage, Meghna Group of Industries and Olympic Industries Limited are already on the BPCL's list of clientele that procure recycled PET resins for bottling and packaging.

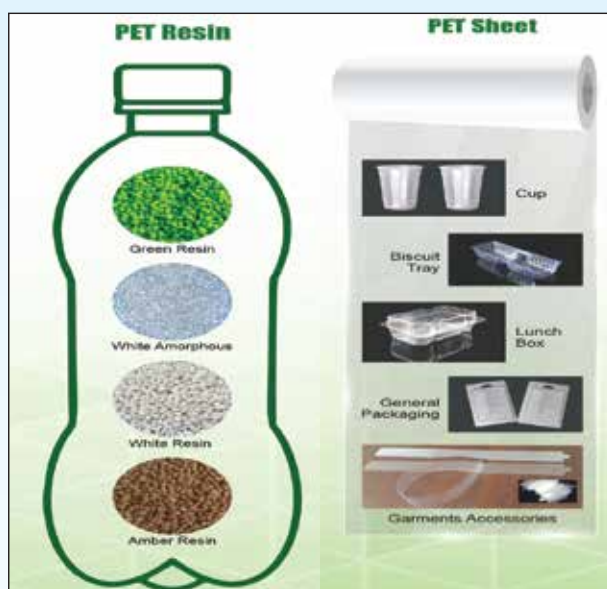


### Breaking Down the Trend in Plastic Waste Supply Chain

The waste pickers are unaware that after selling these bottles to the Bhangari shop, they undergo a series of exploitation made by the middlemen.

The sad truth is that, although it is they who are working hard to keep the society clean, keeping their life's at risk.

But in the end these middlemen are being benefited by exploiting.. Waste pickers – THE INVISIBLE ENVIRONMENTALISTS.



Circumventing the middlemen is a goal for many organized scavengers, but it is impossible if industry decides not to work with them. BPCL has intervened in the market to break this trend and is purchasing PET directly from scavengers, at a fixed price, in its hubs. By paying 2-3x higher than current rates and introducing no child-labor policies, It can help bring fairness to the supply chain that is contaminated by exploitation, especially that of children. This is unique approach taken by BPCL to increase the collection and also to bring fairness into the chain of recycling. It is socially responsible company who is working hard to make the environment better and to make positive impact on the life of 200,000 neglected waste pickers and their families. In the usual supply chains, middlemen obtain high profits by paying low prices to scavengers





### Commitment to the Environment

This green initiatives' commitment to the environment drives the firm to establish actions. Reducing carbon footprints and removing 15,000 MT per annum from being dumped into the soil/river/drain. It reduces 13,500 kg CO<sub>2</sub> emission every year and saves 93,000 m<sup>3</sup> landfill stage by removing 750,000,000 bottles from soil, water body and drain.



## Environmental Impact Study of Two Tannery Estates on the Buriganga and the Dhaleshwari Rivers

Farhana Mustari\*

From the very beginning of industrialization in Bangladesh, tanning industries have been playing a significant role in the country's economy. Due to its importance as a labor based export oriented industry, the full flourish of this industrial sector is essential. In accordance with this endeavour, Government of Bangladesh (GoB) has shifted Hazaribagh Tannery Industries from Hazaribagh, Dhaka to Savar Tannery Estate (STE) at Harindhara, Savar, Dhaka for organizing and managing these industries with a target of sustainable environmental management and ensuring regulatory requirements in regard to environmental and social standards. But, environmental pollution problems in Harindhara, Savar, have been aggravating day by day. Therefore, Department of Environment (DoE) has engaged Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) to conduct an environmental impact study of these tannery industries on both the Buriganga and Dhaleshwari River. The main purpose of this study is to assess the environmental impacts of Savar Tannery Estate on the adjacent environment especially on aquatic ecosystems. In this case, lessons those were learnt at Hazaribagh disaster, have been applied in assessing and identifying the sectors/issues to be managed more effectively in Savar Tannery Estate.

During the study, surface water availability and water quality were examined in the physical environment while fish community and all the floral and faunal composition were assessed for biological environment. To understand the socio-economic statuses properly, human health, employment opportunity and standard of living were studied. In addition, agricultural resources were studied to have a complete picture of the study areas. Water quality were tested following in-situ and ex-situ methods whilst all other baseline information were collected through field visits (checklists, observation, interviews etc.) supplemented by secondary information from related organizations (BSCIC, BTA, LRI and DoE) and published papers. This study also includes odor dispersion modeling for Savar Tannery Estate and capacity assessment to support ecosystem services to the communities. AERMOD was used to observe the odor dispersion in the study area while score based matrix was performed to evaluate the ecosystem service capacity.

Water quality has been chosen priority component in this study as tannery wastes impacted this resource rapidly. Numerous indicators were used to assess the current water quality status. Out of these, physical water quality parameters especially Dissolved Oxygen (DO) and Total Suspended Solids (TSS) indicated negative impacts of tannery wastes on water body. The DO level of Buriganga River was about less than 2.5 mg/L while it was found in the range of 4.0-6.0 mg/L in the Dhaleshwari River. DO status is still in good condition in Dhaleshwari River than the Buriganga River. TDS and salinity is not an issue at that moment in Buriganga and the Dhaleshwari River as these two parameters complied with the national standards for both the cases. Similarity was also found in terms of Cr and other heavy metals such as Pb, Al and Zn as present conditions are not harmful for both the river ecosystems. In the evaluation of water quality of Dhaleshwari River, there is an alarming issue of discharging high concentrations of organic, chemicals and metal pollutants directly into Dhaleshwari River which could have adverse impacts on this aquatic ecosystem.

Table 1: Physical Characteristics of the Water Quality of the Dhaleshwari River

| Site                                       | Color | Odor     | Temperature    | DO        | pH      | Turbidity | TSS  |
|--------------------------------------------|-------|----------|----------------|-----------|---------|-----------|------|
| Standards for Inland Surface Water Quality | 15    | Odorless | 20-30          | 5 or more | 6.5-8.5 | 15        | 150  |
| Unit of measurement                        | Hazen | -        | <sup>0</sup> C | mg/L      | Value   | NTU       | mg/L |
| Singair bridge                             | 13    | 0        | 32             | 4.0       | 8.0     | 15        | 15   |
| Milkyhata                                  | 15    | 0        | 33             | 6.0       | 8.1     | 10        | 14   |

Source: CEGIS Survey, June 2018

\*Assistant Director, Department of Environment

Polluted water affects fish community in many ways. Bio-accumulation of Cr was found high in the fish body in Buriganga River due to high Cr disposal for a longer period in the river which will ultimately affect the human who are consuming those fish. In the Dhaleshwari, no such issues were found yet regarding Cr in fish body. Breeding zone and fish eggs were damaged due to excessive pollutants and lack of light availability in the water column. The same reasons afflict the floral and faunal composition in both the rivers. Buriganga River lost its diversity since long while Dhaleshwari River started to face this problem since last year (2017, starting of Savar Tannery Estate). For instance, water loving snakes and Indian bullfrogs are already rare in Dhaleshwari River. Degrading of the riverine environment will ultimately destroy all the habitats of faunal biodiversity and lastly the ecosystem services.

Table 2: Presence of Chromium (Cr) in soil, sediment and plant in Hemayetpur Tannery Estate

| SL | Sampling point      | Site Characteristics                                                                                                                                                                                                  | Soil (ppm) | Plant (ppm) |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1  | Main Drainage       | This is the main disposal pond of solid and liquid tannery wastes. Soil and plant sample was collected to have chromium contamination in soil and plant.                                                              | 17,225     | N.D.        |
| 2  | River bed/ Sediment | River bed sample was collected from the downstream of tannery estate to analyze chromium concentration in sediment subsequent floating plant (water hyacinths) was also collected to find the presence of chromium. . | 131.5      | N.D.        |
| 3  | River levee         | River levee soil and plant sample was collected form in between main channel and river bed sample collecting point. This area is extensively used for vegetable cultivation during Rabi season.                       | 71.0       | N.D.        |
| 4  | Agricultural Field  | This site is situated in the opposite bank of the Dhalweswari River which is double cropped land. Soil and plant sample was collected to have chromium contamination in soil and plant.                               | 46.7       | N.D.        |

Note: N.D. - Not Detectable. Soil (MAC)-100 ppm. Plant (MAC) - 1-2 ppm

*\*\* Soil and plant samples were collected from 11th to 13th June, 2018 following standard sampling procedure (Soil survey manual, 2017). These samples were sent to SRDI, Dhaka laboratory for analysis. To determine total Cr, soil and plant analysis was done by digestion method followed by AAS analysis (Weil and Brady, 2016).*

Agriculture is facing the same Cr bioaccumulation issue through 'irrigation' and 'soil pollution'. There is a chance of Cr bioaccumulation in food crops in both the areas of Hazaribagh Tannery Estate (HTE) and STE. Beside the above stated scenarios, other frightening issues are the occupational health and safety (OHS) and human health impacts on the surrounding communities due to chemicas used in rawhide and skin processing in the tanneries and by hazardous by-products disposing into surrounding environment. Labors and staffs of tannery industries and the neighboring living communities are facing chronic Odor issue along with skin diseases and respiratory problems. In addition, unsafe working environment and lack of Personal Protective Equipment (PPEs) puts tannery workers life in great danger.

Lastly, lack of cooperation among Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC), Central Effluent Treatment Plant (CETP) Contractor, Tannery owners is a barrier to manage this tannery sectors more efficiently. Functional CETP, installation of salt recovery system and effective coordination with relevant stakeholder could be the best solution in managing Savar Tannery Estate efficiently and environment friendly way.

## Local Practices for Making Resilient Households in Flood and Riverbank Erosion Prone Char Lands

Jarin Tasneem Oyshi\*

Bangladesh is one of the most vulnerable countries in terms of natural disasters. The country is in the delta of three mighty rivers- the Ganga, the Brahmaputra and the Meghna which makes it more vulnerable to events like flood and riverbank erosion. Especially the riverine char lands or temporary islands are impacted with riverbank erosion frequently and lose their land and belongings. People living in flood and river erosion prone areas have developed some strategies and techniques based on local knowledge to cope up with the adverse impact; one of which is modification in the housing pattern. However, people living in different zones of Bangladesh have different housing patterns based on topography, social norms and cultural practices.

During a field study in Shariatpur, it was observed that, people living in the char lands of the Padma river have made modifications in their housing pattern to adapt with the natural disasters. These char dwellers have developed different options to make their houses resilient to disasters like flood and riverbank erosion among which raising platform and constructing easily movable structures are significant.

People living in char areas that are subjected to frequent monsoon flooding prefer to build raised platform houses. They raise the plinth of the houses using mud or posts made of concrete, bamboo or wood. Sometimes, they mix cement or lime with mud to give it more strength.



Figure 1: Raising plinth of house using bamboo and wood

Areas that have lower inundation level use either mud or posts up to 1-1.5 feet from ground level. But where the water level goes higher due to flood, people raise their plinth using both mud and posts. In that case, they first prepare a raised platform using mud and above that platform they use concrete or wooden posts to lift the house. Through this technique houses can be raised up to 3-3.5 feet from ground level. There is a free space below the houses that are raised using posts.

This free space is often utilized by the dwellers of the house during dry season. Most common practice seen was using the free space for keeping chickens, ducks or goats. Some people use this space as storage also.

Figure 2 Raising platform of houses using both mud and posts.

Another technique people use in this area is building houses that are easy to refurbish. The char dwellers construct houses using wood and CGI sheet. Wood is used to make the framed structure and CGI sheets are used as roof and wall. Walls of each side act as a single unit and are joined at the corners with wooden screws. The screws can be easily removed, and the walls can be separated within a very short time. Even the roofs are made using such method that they can be also dismantled easily. As the houses are easy to dismantle and reconstruct, people can move the houses to different places. Also, the special type of frame structure of the houses provides better resilience to lateral pressure (i.e., wind and water pressure).

\*Research Associate, Centre for Climate Change and Environmental Research, BRAC University





Figure 3: The houses can be dismantled easily and rejoined after moving to a safer place.



The construction cost of this type of houses ranges from 2.5 lac to 5 lac BDT depending on the quality of construction materials and craftsmanship. The usual practice of the local people in this area is to build their houses close to the river during dry season. This helps them to collect water from the river for their daily use and agricultural land. Also, land near the river possesses better quality soil compared to the land that is far away from the river. Flood and riverbank erosion mainly occur during the monsoon and at that time people move their houses far from the riverbank where the probability of erosion is lower. In this way, they are able to protect their house from destruction. This practice may not always be very effective in times of catastrophic disaster but it helps the local people to protect their house and belongings to some extent.

## Environmental Compliance and Climate Risk Management in Aquaculture

MHM Mostafa Rahman\*

### Environmental compliance in aquaculture:

There is hardly any human-intervention that has no effect on the environment, so it is with aquaculture. Through aquaculture we produce fish for food therefore, it is important to consider food-safety issues along with the environmental and bio-safety issues. This is why environmental compliance is important. If we look at potential environmental threats that might take place as a result of aquaculture they can be illustrated as below:

- a) Bio-safety might be disrupted if invasive alien fish species are introduced. Some exotic species (like silver carp, Thai pangas, carpio, etc.) have adapted well to our pond-ecosystems without leaving much impact on other local species. In contrast, African catfish and piranha became detrimental to other fish as well as entire aquatic ecosystems. It could become a serious bio-safety issue not only for our fish stocks but also for many other aquatic living organisms.

Sometimes we import fish-seed (i.e. shrimp and fish fry) from other countries. As part of environmental compliance, we have to follow the Fisheries Quarantine Act, 2018 regardless if it is an invasive species or not. For instance, many aquaculture practitioners believe that the infestation of white spot syndrome virus (WSSV) that ruined our prosperous shrimp industry was accelerated when we imported fry indiscriminately during the 1990s.

Hatcheries are very important in maintaining bio-safety issues. If same broodstock is being used year after year, and if “negative selection” and unplanned hybridization continues as is being practiced now, the genetic properties of our major fish species will be ruined in the near future. Although the Fish Hatchery Rules, 2011 specify bio-safety issues not much has changed. Perhaps this is partly because of the size of the hatcheries. In order to maintain healthy broodstock, hatcheries need to replace 20% of their broodstock each year by collecting new broodstock from authentic sources and rejecting a proportion of the old broodstock. A hatchery should have at least 150-200 active broodstock of each species, and maintain pedigree records.

- b) Food-safety might be disrupted if harmful inputs viz. chemicals, aqua-medicinal products (AMPs), additives, etc. are used by the fish feed millers, hatchery operators, fish growers, and/or food-fish processors. There are some inputs that can bio-accumulate; if such inputs are applied in any of the steps of the fish value chain, harmful substances could result in health problems. Hundreds of AMPs are being imported and there is little information about their effectiveness and standards. Appropriate government acts or regulations are not in place either. The use of formalin and other chemicals in fish marketing has been a serious issue. The quality of water that is used in making ice is equally important.
- c) Aquaculture might be practiced in an environmentally sensitive area. A remarkable proportion of the current shrimp and gher farms in greater Khulna, Chakaria, etc. were established by transforming mangrove ecosystems. Productive mangrove lands that are important for coastal and marine fish spawn rearing could have been protected if environmental impact studies were carried out prior to re-classify the land.

### Climate risk management in aquaculture:

The adverse impacts of climate change threaten to roll back decades of progress in reducing poverty and

\*Environment Specialist, WorldFish

improving economic growth. Therefore, climate risk management (CRM) has become a priority. Climatic and weather events have great impacts on aquaculture. They have shaped our aquaculture calendar. For instance, fish spawning takes place during pre- and early monsoon in Bangladesh. Almost all of our homestead ponds are rain-fed, and become ready for fish stocking. Fish grow well in warmer months and the growth rate slows down in winter months. Harvesting takes place in seasonal ponds in early winter months. This means we are familiar with using seasonal weather data in our decision making for the major steps of aquaculture: pond preparation, stocking, rearing, and harvesting.

However, we only rarely use daily or weekly weather data in making decisions while managing aquaculture tasks. For instance, (a) in order to maintain favorable water quality for fish, farmers need to apply lime and certain types of fertilizers, which works better if applied in sunny days. If it rains then the investment is wasted; (b) fish need dissolved oxygen in water to breathe. The level of dissolved oxygen is at its maximum at noon and minimum at night in any aquatic ecosystem. During cloudy weather for a couple of days, the dissolved oxygen level drops alarmingly low at night, which may cause fish-mortality significantly. These two scenarios imply that weather events may also become as “risk” which we do not recognize.

CRM is the science of decision making in order to avoid or minimize the impacts of climatic and weather calamities. Effective and successful CRM may consist the elements, as below:

- a) Farmers must be aware about the current context of their ponds, which would include total weight of fish stock, fish health, physical-chemical-biological state of water and soil of pond;
- b) Farmers must follow weekly weather forecasts;
- c) Farmers should get assistance from DoF personnel, extension agents, or “climate service” providers in decision making based on the context of the pond against the weather forecasts.
- d) A weather forecast with 7-day lead-time is good for getting prepared but a 1 to 3-day lead-time weather forecast is better to make decision;

CRM is a new way of making extension and promotion of aquaculture interventions sustainable. A couple of organizations in Bangladesh have started to formulate a platform to reach fish growers with ICT-based “climate services.” However, it should be noted that the “content”(advice) cannot be the same for all ponds even though if they are located in the same geographic location.

Incorporating the current context of a specific pond in developing “content” is a great challenge. It requires “climate service” providers to establish practical interactions with the fish growers. In order to facilitate the process, “climate service” providers should collect common data of the ponds during registration, and develop a database. If the data of a specific pond is updated in the database whenever the “climate service” provider establishes a contact with the fish grower then the current content of the pond would be on file. The success of a “climate service” will rely on its acceptance by the fish growers. If it is able to avoid and/or minimize the weather induced “risks” then the fish growers will be benefited. Once they will start getting benefit from it, “willingness to pay” for the service may become rational to them.

In implementing the Feed the Future Bangladesh Aquaculture and Nutrition Activity, a USAID funded project, WorldFish is focusing on introducing environmental compliance and CRM in aquaculture. As part of the process, an Environmental Mitigation and Monitoring Plan (EMMP), handbook, BMPs (Best Management Practices) have been developed, and project staff are trained so they can assist smallholder fish growers better in order to execute the environmental safeguards. Under the Activity, WorldFish is about to partner with a service provider to develop an ICT-based climate service platform. The service will assist smallholder fish growers to understand the risks of a weather event based on the current context of their individual ponds, and will assist in decision making to avoid or minimize the consequences.

## The Effects of Air Pollution on Plants and Ecosystem

Noor Hassan Sajib\*

Air pollution refers to the release of pollutants into the air that are detrimental to human health and the planet as a whole. The burning of fossil fuels, exhaust from factories and industries, mining operations, agricultural activities, household cleaning products and painting supplies emit toxic chemicals in the air are the major causes of air pollution. Air pollution not only contributes to respiratory diseases in humans and damages buildings, it can also affect plants. The effects of air pollution on plants develop over time and can't be undone. Some plants are more susceptible to pollution damage than others.



Photo-1&2: Plant growth is affected by air pollution.

### How does air pollution harm plants and vegetation?

Air pollution has a lot of influence on vegetation by attacking its growth sources, such as airborne molecules, soil minerals or directly its organisms. Depending on the particular pollutant or environmental pollution conditions, main effects can be:

- ❖ Smog, as well as particulate matter high concentrations, reduces the amount of sun rays arriving to plants, denying or slowing plant growth. This kind of air pollution damages forests and crops, especially vegetables such as soybeans, wheat, tomatoes, peanuts and cotton.
- ❖ Ozone layer depletion increases the amount of UVB arriving to plants, and despite being prepared and adaptable to increasing levels of UVB, it can cause problems and modifications like form changes, nutrients distribution, developmental phases timing and secondary metabolism.
- ❖ Forest and plants can also be harmed by acid rain since it damages tree's leaves, robs the soil of essential nutrients and makes it hard for trees to take up water. All these issues imply growth and photosynthesis difficulties and more vulnerability to insects, diseases or bad weather. High concentrations of SO<sub>x</sub> are also harmful for vegetation foliage and growth, and can contribute to format acid rain. Ozone also produces similar symptoms, especially during the plants growing season.
- ❖ Lead can accumulate on soils for a long long time (hundreds or even thousands of years) and by combination with other metals it can inhibit photosynthesis, what implies growth and survival issues for the surrounding vegetation.
- ❖ Nitrogen is essential for plants nutrition, but high levels of nitrogen dioxide or nitrogen monoxide pollution damage their lives.

### How changes in ecosystems affect the fauna and flora?

Last but not least, air pollution may lead to harm an ecosystem as a whole and not only a particular organism from it. Some clear examples are:

\*Inspector, Department of Environment



- ❖ Marine ecosystems may experience high temperatures and exposure to UVB, reducing survival rate of phytoplankton and damaging early developmental stages of fish, shrimp, crab, amphibians and other marine animals. These effects are the result from the ozone layer depletion.
- ❖ Global warming is changing some ecosystems faster than the capability of animals and plants to adapt, leading to possible extinction of a huge amount of species. For example, ice sheets inhabited by polar bears are disappearing, (as it was said) warming oceans, more extreme weather conditions, etc.
- ❖ Due to the rising amount of carbon dioxide emissions and acid rain generation, the surface of oceans and water bodies has increased its acidity. This phenomenon is called ocean acidification and can lead to harmful consequences, such as depressing metabolic rates in jumbo squid, depressing the immune responses of blue mussels, and coral bleaching. Furthermore, ocean and lakes acidification makes water toxic to crayfish, clam, fish, and other aquatic animals. However, it can be good for some species as a trade-off, such as sea star, which increases its growth rate with highest water acid levels.
- ❖ Eutrophication, formed by phosphorus and nitrogen concentrations in water bodies, can even change the entire ecosystem from water to land (in extreme cases). Toxicity of the water, reduced amount of oxygen in deeper layers and difficult adaptability to the new substances may cause several damages into indigenous fauna and flora, leading to their reduction or even extinction.
- ❖ In Bangladesh, emission of brick fields, railway engines, industrial plants, power plants, open burning incineration, solid waste disposal sites, dust particles, aircraft, all types of automobiles like car, jeep, bus, truck, minibus, microbus, two- stroke engine driven vehicles and motorcycles are mainly contributing to the air pollution. Dust pollution due to road diggings, constructions and other development activities are also responsible for polluting the air in urban and village area. Air pollution change the land, water and forest ecosystem of the country.

## ছড়া ও কবিতা



## শ্লিষ্ট সতেজ বায়ু

পাশা মোস্তফা কামাল\*

দাও আমাকে সবুজ শ্যামল ছায়া ঘেরা বন  
মুক্তবায়ুর শীতল পরশ জুড়িয়ে দেবে মন।

সৃষ্টি যখন হয়েছিল এই পৃথিবীর মাটি  
তখন ছিল শুদ্ধ বাতাস সোনার চেয়ে ঝাঁটি।

আমরা মানুষ ধীরে ধীরে এই পৃথিবীটাকে  
পরিবেশের দূষণ করে ফেলছি দুর্বিপাকে।

ধ্বংস করে এই পৃথিবীর শ্যামল পরিবেশ  
গাছপালাকে কেটে কুটে গড়ছি ইটের দেশ।

বাতাস জুড়ে ধূলিকণা উড়ছে সিলিকন  
মুক্তবায়ুর অভাববোধে বিষিয়ে ওঠে মন।

নিচ্ছে কারা আমার প্রাণের মুক্ত বায়ু কেড়ে  
ইচ্ছে করে পালিয়ে যেতে ইটের শহর ছেড়ে।

আমি তো চাই দূষণমুক্ত শ্লিষ্ট সতেজ বায়ু  
সবুজ শ্যামল ধরিত্রীতে দীর্ঘ পরমায়ু।

\*ছড়াকার, প্রধান সম্পাদক-ঝুমঝুমি ও সিনিয়র তথ্য অফিসার, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়



## মুক্ত বাতাস

শায়লা রহমান তিথি\*

‘দাও ফিরিয়ে সে অরণ্য লও এ নগর’  
ফুল চাই রাশি রাশি গোলাপ টগর।

বায়ু চাই নির্মল খোলা জানালায়  
ঝলমলে ভোর চাই দখিলা হাওয়ায়।

খুব ঘন বন চাই পাখি ভরপুর  
ফুরফুরে মজাদার উদাস দুপুর।

বুক ভরে নিতে চাই বিশুদ্ধ শ্বাস  
চাই আমি নির্মল মুক্ত বাতাস।

## অনুরোধ

বিধান চন্দ্র পাল\*

এ কথা হলফ করে বলতে পারি—  
 এই বাংলাদেশে একবার এলে আপনি প্রেমে পড়বেন;  
 প্রেমে পড়বেন মানুষের, প্রেমে পড়বেন প্রকৃতির।  
 মানুষের আন্তরিক মুখের হাসিতে  
 আপনার প্রাণ জুড়িয়ে যাবে;  
 মিষ্টি বাতাসের ঘ্রাণ,  
 আর সবুজে ঘেরা চারপাশ দেখে—  
 আপনার মন আনন্দে নেচে উঠবে!  
 অক্লান্ত পরিশ্রমী চোখে সুন্দর স্বপ্নের আভাস দেখে  
 আপনিও নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবেন;  
 স্বচ্ছ নদীর বহমান জলে কিংবা  
 গ্রামের পুকুরে গা ভাসিয়ে নির্ভেজাল শান্তি পাবেন;  
 পারিবারিক অটুট বন্ধন ও  
 পাড়া-প্রতিবেশীদের প্রতি সহমর্মিতা দেখে—  
 আপনার মন হয়তো আনন্দে কেঁদে উঠবে;  
 রাতের আকাশে জোনাকি ও চাঁদের আলো—  
 আপনার মনে নতুন প্রত্যাশার দীপ্তি ছড়াবে;  
 তাই বলছি—  
 অন্তত একবার এসে এই দেশে বেড়িয়ে যান,  
 এই দেশের যা কিছু তা এদেশেরই মতো—  
 মাটির ঘর থেকে শুরু করে, কাঠের গায়ে আলপনা আঁকা দরজা  
 প্রাচীন স্থাপত্য, পুরোনো পুকুর  
 বহু মানুষের সমৃদ্ধ কীর্তিসহ নানান কিছু;  
 এখানে এসে আঞ্চলিকতার টানে কখনো বা আপনি ছুটে যাবেন  
 উত্তর থেকে দক্ষিণ কিংবা পশ্চিম থেকে পূর্বে;  
 গানের সুরে, স্পষ্ট উচ্চারণে—  
 আর বছরব্যাপী নানান আনুষ্ঠানিকতায় আপনি  
 অদ্ভুতভাবে লক্ষ্য করবেন—  
 অন্য ও অনন্য রকম সংস্কৃতিকে;  
 তাই বলছি—  
 প্রথমবারের মতো ‘অনুরোধ’ করেই বলছি,  
 অন্তত একটি বারের জন্য হলেও আসুন—  
 আমার জন্মস্থান, এই প্রিয় স্বদেশ— বাংলাদেশে  
 একবার বেড়িয়ে যান!

## নির্মল সুবাতাস

রিফাত আরা শাহানা\*

বৃক্ষের ছায়া চাই  
মায়া চাই।  
ইট-পাথরের বুকে  
চাই প্রাণ।  
অরণ্যের ছোঁয়া চাই  
বিষাক্ত আবহাওয়ায় গড়ে উঠছে  
এ শহর।  
এর মাঝে হৃদয়ের নিভৃত কোণে  
আলোকোজ্জ্বল সুনির্মল বাতাস  
ধুয়ে দিক মলিনতা,  
আবর্জনা সব।  
সব পঙ্কিলতা ছাড়িয়ে  
অনন্য, অনিন্দ্য মোহনীয়  
বিষাক্ত সব ধোঁয়া যাক ছাড়িয়ে  
আমরা বুঝবো নিতে চাই  
নির্মল সুবাতাস।

\*চামেলীবাগ, শান্তিনগর, ঢাকা

## পরিবেশ বিষয়ক শ্লোগান প্রতিযোগিতা ২০১৯

রোধ হলে বায়ুদূষণ  
টেকসই উন্নয়ন, সুস্থ জীবন

মোহাম্মদ জাহিরুল ইসলাম

সবুজ গাছ, নির্মল বায়ু  
কমবে দূষণ, বাড়বে আয়ু

মেহেদী হাসান

বিশুদ্ধ বায়ু, সুপেয় পানি  
নির্মল পরিবেশের মন্ত্রবাণী

জাহিদ হাসান





Beat Air  
Pollution



WORLD  
ENVIRONMENT  
DAY

UN   
environment



পরিবেশ অধিদপ্তর  
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

পরিবেশ ভবন, ই/১৬ আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭  
টেলিফোন: +৮৮-০২-৮১৮১৮০০, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১৮১৭৭২  
ইমেইল: dg@doe.gov.bd, ওয়েবসাইট: www.doe.gov.bd